ক্ষুদিরাম দাস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক,
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

২২ কর্নওআলিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬০

মূল্য দশ টাকা

প্রচ্ছদপটশিল্প ও অধ্যায়নামাঙ্কন
শ্রীগৌরী বসু কৃত

ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং লিঃ, ২৮, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা হইতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত ও
২২ কর্নওআলিস্ স্ট্রীট কলিকাতা, পুথিঘরের পক্ষ
হইতে শ্রীসতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

৺'প্রতিভা'র উদ্দেশে

বিষয়-সূচী

ছয়

সাত

আট

প্রতিভার পরিণাম—জীবন ও অরূপের সমন্বয়ঃ গীতালি-বলাকা-ফাল্গুনী-পূরবী-মহুয়া-মুক্তধারা-রক্তকরবী,

নয়

গোধূলি-পর্যায়ঃ পরিশেষ থেকে শেষ-লেখা,

আমার পূর্বসূরিদের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠনে নিরত সুধী ও অনুরাগিবৃন্দের নমস্কার করি।

卐

বইটি লেখার সময় আমার শিক্ষাগুরুদের কথা বারবার স্মরণ করেছি। আর মনে পড়েছে ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা, যিনি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় সাদৃশ্যের দিকটি সম্পর্কে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

卐

শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় বইটির নামকরণে ও বহু উপদেশবাক্যে আমাকে উপকৃত করেছেন এবং মদীয় অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ও শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য মহোদয়েরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন নানাভাবে। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ চিত্তপ্রিয় ঘোষ মুদ্রণের উপযোগী পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করেছে।

卐

বইটির মধ্যে 'তুলনীয়' বোঝাতে তুং এবং 'দ্রষ্টব্য' বোঝাতে দ্রঃ এই সংকেত ব্যবহার করেছি। আমার অনবধানবশে দুএকটি ত্রুটি থেকে গেছে, সেজন্যে আমি লজ্জিত।

—গ্রন্থকার

প্রস্তাবনা

বিহায়াদিকবিং বাণী কালিদাসঞ্চ স্বৈরিণী।
যমুপাস্তেহ বঙ্গেষু তং রবীন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥

কবির সৃষ্টি অতি বিস্ময়কর ব্যাপারবিশেষ। কাব্যের বাইরে থাকে বাণীর অজস্রতা, অর্থের বৈচিত্র্য, অন্তরে থাকে কল্পনার নিগূঢ় ঐক্য। আবার স্বতন্ত্র কবির স্বভাব স্বতন্ত্র ব'লেই কাব্যের রূপে এত পার্থক্য, আবেদনে এত অভিনবত্ব। কাব্যের অন্তরে যে-কবি প্রচ্ছন্ন রয়েছেন, যাঁর অন্তর্নিহিত রহস্যময় শক্তিকে কবি-প্রতিভা বলে উল্লেখ করছি, তার স্বরূপ যথাসাধ্য নির্ণয় করবার জন্যে আমাদের এই প্রয়াস।

বিশাল রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে ওর অন্তর্নিহিত গতিশীলতা (dynamism) এবং ক্রম-পরিণামের পথে যাত্রা। একটি নির্দিষ্ট ধারায় বহমান রবীন্দ্র-কবিমানসের পরিণামের প্রকারই কাব্যামোদী পাঠককে সমধিক চমৎকৃত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নন। যদিও পরিণত কাব্যজীবনে তাঁর উপলব্ধি দার্শনিক বা ঋষির উপলব্ধির তুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি কৈশোরে বা যৌবনে স্বাভাবিকভাবেই ঐ পরিণামের অধিকারী হন নি। কবির উপলব্ধি স্বকীয় অনুভূতিময় পথে যাত্রার মধ্যেকার উপলব্ধি, কবির ধর্ম পথে চলার ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র, ঋষি অথবা দার্শনিক যে-রূপেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ পাঠকের নিকট প্রতিভাত হোন না কেন, তাঁর বিচিত্র বাণীর মধ্যে বেদ-বেদান্ত, আর্ষ বা লৌকিক ধর্ম ও দর্শনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের যেমন প্রতিফলনই ঘটুক না কেন, তাঁর কবি-স্বভাবের দিক থেকে বিবেচনা না করলে তাঁর কাব্যের সর্বসংস্কারমুক্ত যথার্থ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হতে হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখযোগ্য কবিদের প্রতিভায় দুটি বাহ্য উপাদান কাজ করে। একটি বহুকাল-আগত অতীত আর একটি তাৎকালিক বর্তমান। একটির ক্রিয়া নিগূঢ়, অন্যটির বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ। কিন্তু অতীত এবং বর্তমানের দ্বন্দ্বের মধ্যেই কবিমানসের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্র-কাব্যের পশ্চাতেও একদিকে বিপুল ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনের স্মৃতি রয়েছে। আধুনিক যুগে কোনো একটি সমগ্র দেশ তার অতীত, বর্তমান, এমন কি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিয়ে একজন কবির রচনায় রূপ পরিগ্রহ করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কালিদাস সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় *বলেছেন যে, তপোবনের যুগের ভারতবর্ষ গুপ্ত-যুগের এই কবির মধ্যে প্রকাশলাভ করেছে। এমন বিস্ময়কর ঘটনা কেমন ক'রে ঘটে তা সহজবুদ্ধিগম্য নয়। অতীতের এই যে বর্তমানে প্রতিফলন একে কি প্রভাব বলা সমীচীন হবে? লৌকিকভাবে আমরা হয়ত বলতে পারি যে কালিদাসে তপোবনের কি বাল্মীকির প্রভাব রয়েছে, অথবা, রবীন্দ্রনাথে বাউল-প্রভাব লক্ষণীয়, ইত্যাদি। কিন্তু অনুসন্ধানী মন এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। লক্ষ্য গভীরতর প্রদেশে নিবদ্ধ ক'রেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এরূপ ভাব-সাদৃশ্য একটি অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া। বস্তুতঃ কেবল অতীতের অনুসরণ

* The Message of the Forest প্রবন্ধ।

নয়, অতীত ও বর্তমানের সমঞ্জসীকরণই ঐ প্রাকৃতিক শক্তির কাজ। এই ভাবে মহামানব ও মহৎ কবি-প্রতিভা যুগের প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়।

ধরা যাক কালিদাসের কথা। কালিদাস ধর্মপ্রবর্তক নন, সাহিত্যাদর্শের প্রদর্শক, প্রসঙ্গতঃ জীবনাদর্শের পরিচায়ক। গুপ্তযুগের অভ্যুদয়-কালে ভারতবর্ষ পার্থিব সমৃদ্ধির দিকে বেগে অগ্রসর হচ্ছিল। এই পার্থিব সমৃদ্ধির চিত্র কালিদাস নানা স্থানে প্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর কাব্যে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, রাজ্যজয়ের মহিমা নয়, তপোবনের শান্তি ও মাধুর্য ; রাজধানীর কৃত্রিমতা নয়, প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য। তৎকালীন জীবনকোলাহলের মধ্যে কবি কেবল ধর্মানুভূতির আশ্রয়ে পরিত্রাণ চাইলেন না, জীবনকে প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। একটু অগ্রসর হয়ে একথা বললেও অসঙ্গত হবে না যে নির্বাণ-আশ্রিত বৌদ্ধধর্ম ও আস্তিক্যবাদী বেদধর্মের মধ্যে শিবভাগবত অদ্বৈতদৃষ্টি এনে তিনি একটা সমন্বয় সাধন করেছিলেন। সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে বলা যেতে পারে, কালিদাস, নবজাগরিত আলংকারিক বাগ্‌ভঙ্গি এবং প্রাচীন বাল্মীকীয় সরলতা এই দুয়ের সামঞ্জস্যবিধান করেছিলেন।

এইভাবে যুগোচিত মহৎ প্রতিভার মধ্যে পুরাতন ও প্রত্যক্ষের যাবতীয় বিচ্ছিন্ন, অনৈক্যযুক্ত, পরস্পরবিরুদ্ধ অথচ সমন্বয়ের জন্যে আগ্রহশীল জীবনাদর্শের ঐক্য সাধিত হয় এবং নূতনের জন্ম হয়। এই নূতন যদিও অতীতের আশ্রয়ে এবং তৎকালের প্রতিক্রিয়ায় জন্মলাভ করে, তথাপি সুদূর ভবিষ্যতের দিকেই এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। কবি-প্রতিভা এই কারণে কালবাহিত হ'লেও কালাতিক্রমী। এই কারণে তদানীন্তনতার সঙ্গে এর প্রকট বিরোধ দেখা যায়। প্রতিভাশালী মহাপুরুষেরা এজন্য বিদ্রোহীও বটে। যুগ ও জীবনের

দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাৎকালিক জীবনের প্রতিক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়ে নূতন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রয়েছে।

কবি কালিদাসের আবির্ভাবের দেড় হাজার বৎসর পরে উনিশ শতকে ভারতীয় জনমানসের বিপুল পরিবর্তন উৎসুক পাঠককে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। গুপ্তসাম্রাজ্যের অবনতির পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের দীপ হর্ষবর্ধনের হাতে ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে নানা বিন্দুতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নূতন অবয়ব গ্রহণ ক'রে পূর্বভারতে একাধিপত্য করতে লাগল বটে, কিন্তু নবম শতকে শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জীবনাদর্শে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করলে, এবং অব্যবহিত পরেই রামানুজাচার্যের বিশিষ্টা-দ্বৈত ভাব-প্রবাহে অদ্বৈত ও নির্বাণশূন্যতা ভেসে গেল। অতঃপর রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিচূর্ণ হ'লেও একটি সর্বভারতীয় ভাবৈক্য প্রতিষ্ঠার বিলম্ব হ'ল না।

ভাবগুরু রামানুজাচার্যের নূতন মতবাদ পরবর্তী ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে অভিনব শক্তিরূপে কাজ ক'রে আজও ভারতবাসীর মনের একটি মৌলিক প্রবণতারূপে বিদ্যমান রয়েছে। এই মতবাদে বিশ্ব ও জীবনকে অনিত্য ব'লে অস্বীকার করা হয়নি। দ্বাদশ শতক থেকে ভারতীয় সাহিত্যে মূলতঃ এই ভাবধর্মই বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যভারতে কবীর, দাদূ, সুরদাস, মীরাবাঈ, তুলসীদাস এবং বাংলায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদি ঐ ভাবধর্মেরই সাহিত্যিক প্রতিমা। এই সময় সংস্কৃত মহাকাব্য ও মানবীয় প্রেম-কাব্যের মহিমা প্রায় লুপ্ত হয়েছে। সংস্কৃতে কাব্যরচনার প্রতিভার যেমন অবসান ঘটেছে তেমনি সংস্কৃত ভাষাভঙ্গির সরল উদার সৌন্দর্য তিরোহিত হয়ে শব্দচাতুর্যমাত্র ক্ষণদীপ্তি কবিদের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। এই

সাহিত্যিক পরিবর্তনের যুগে অমরু, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রকীর্ণ রচনার মধ্য দিয়ে রোম্যান্টিক প্রেম-কবিতার উজ্জীবনের প্রয়াস করছেন। এই শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সংস্কৃত ও ভাষাসাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন কবি-জয়দেব এই পরিবর্তন-প্রবাহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপূর্ব প্রজ্ঞা সহকারে লৌকিক প্রণয় থেকে ঈশ্বর-ভাবুকতার দিকে এবং সংস্কৃত থেকে ভাষাসাহিত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ প্রচারের ফলে যে ভাবপ্লাবন স্থরু হয়েছিল তা অতি দ্রুত পরিবর্তনের পথে চালিত হয়েছিল আর একটি গুরুতর ঘটনায়। তা হ'ল তুর্কি অভিযান। কর্মকাণ্ডময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর তীব্র আঘাত দিয়ে লৌকিক ভাবধর্মের পথ মুক্ত করতে পাঠান-মোগল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম ধর্ম প্রবলভাবে সাহায্য করেছিল। দ্বাদশ শতকের পূর্ব থেকেই স্থফীধর্মের ভারতে প্রবেশ ও ভারতীয় ভাবধর্মের সঙ্গে তার অনিবার্য মিশ্রণে মরমিয়া সাধকদের অনুস্থত সহজ লৌকিক ধর্মই সর্বপ্রধান আসন গ্রহণ করলে। একদিকে যেমন কবীর বোঝালেন যে, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনা এবং যাবতীয় বৈধ কর্মের কোনো প্রয়োজন নেই, আপনার মধ্যেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর, এবং চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সাধকেরা জানালেন যে "দেহহি বুদ্ধ বসন্ত" অর্থাৎ দেহের মধ্যেই প্রার্থিত সম্পদ রয়েছে, বা "অনুভব সহজ মা ভোলোরে জোঈ" অর্থাৎ সহজ অনুভূতিই একমাত্র পন্থা, অপরদিকে তেমনি বৈষ্ণব পদকর্তারা অহেতুকী অনুরাগেই ঈশ্বর-সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে ঐশ্বর্যবুদ্ধি ও যাবতীয় আচারনিষ্ঠা, "লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম" সমস্ত পরিত্যাজ্য ব'লে ঘোষণা করলেন। আঠারো-উনিশ শতকের শ্যামা-সংগীত এবং বাউল-সংগীতেও

শাস্ত্রনির্দেশ ত্যাগ ও আপনার মধ্যেই ঈশ্বর-অনুসন্ধানের তত্ত্ব প্রকটতর হয়ে চলেছে দেখা যায়।

'আপনাতে আপনি থেক মন যেয়োনাক কারু ঘরে।
যা চা'বি তা কাছেই পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥'

অথবা,

'আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা?'

প্রভৃতি বহু লোক-সংগীতে বিধি-বহির্ভূত মুক্ত জীবনের মধ্যেই জীবনাতীতের অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যাবে।

মোগল-শাসনেব সময়কার ভারতীয় ভাবজীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীচৈতন্য। তিনি অহেতুকী প্রেমের শ্রেষ্ঠ সাধক, ভাবজীবনের চূড়ান্ত প্রকাশ এবং ভক্তদের কাছে অবতারপুরুষ। স্বয়ং সাহিত্যিক না হ'লেও এবং পার্থিব জীবন বহন না করলেও ভাবোন্মাদকতাময় বিপুল পদ-সাহিত্যের প্রেরণাদাতা এবং যাবতীয় সামাজিক অসাম্যের ঘোর প্রতিবাদী। দ্বাদশ শতক থেকে যে-ভাবধর্ম ভারতের এখানে ওখানে দীপ্তি পাচ্ছিল, ইতস্ততঃ সাধকদের সংগীতে আত্মপ্রকাশ করছিল, তা এখন মূর্তি পরিগ্রহ করলে, এবং অতঃপর লৌকিক ধর্ম অনুসরণ ক'রে এবং বর্ণাশ্রম ও বৈধমার্গ পরিত্যাগ ক'রে যে কাম্যবস্তু লাভ করা সম্ভব সে সম্বন্ধে কারো সন্দেহ রইল না। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে কবিদের বাণী এই অতিনিশ্চিত ভাববিবর্তনেরই জীবন্ত পরিচয় বহন করছে।

শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভাবধর্ম কিন্তু গতিহীন অবস্থায় বেঁচে রইল না। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ যদ্যপি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য সহকারে বৈষ্ণবধর্মের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকলনে নিরত থেকে অহেতুক ঈশ্বর-প্রেমের প্রারম্ভ ও পরিণামের একটা নিয়মানুগ চিত্র লোকচক্ষে উপস্থাপিত

করছিলেন, তথাপি নিয়ম-লঙ্ঘন-রূপ গতিশীলতা থেকে এই ভাবধর্মকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। এই বাংলা দেশেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাব-সাধনার পাশাপাশি অবস্থিত, এর থেকেই বিশেষভাবে প্রেরণাপ্রাপ্ত সহজ ভজনের ধারা বাউল জাতীয় বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়ল। যদ্যপি এক মূল ভাবকেন্দ্র থেকে বৈষ্ণব ও সহজিয়া মতের উৎপত্তি তথাপি পরিণামে স্বরূপতঃ উভয়ে বিলক্ষণ হয়ে পড়ল। বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসধর্ম। প্রকৃত বৈষ্ণব যথার্থ সন্ন্যাসী। তাঁদের শান্ত দাস্যাদি পঞ্চরস দিব্যরস। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যে তাঁদের যে আর্তি, মানবীয় প্রেমের আর্তি থেকে তা অত্যন্ত ভিন্ন। "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়।" জগতে স্বার্থবাসনাহীন শুদ্ধ প্রেমের অত্যন্ত অভাব দেখিয়ে তাঁরা ঈশ্বরীয় প্রেমকে সর্ববিধ লৌকিকতা থেকে মুক্ত করতেই চেয়েছিলেন। অথচ সহজ-সাধন-পথে মানুষই একমাত্র অবলম্বন। মানুষী প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষের মর্মে প্রবেশ ক'রে অন্তর-দেবতাকে প্রত্যক্ষ করাই এই সম্প্রদায়ের সাধনা। কাজেই এই শাখার সাধকেরা প্রেমস্নেহাদি মানুষী বৃত্তিকে গ্রহণ ক'রেই অরূপপথাবলম্বী হলেন। আমরা পরে গ্রন্থের মধ্যে দেখব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সাধন-পন্থা কিরূপ নূতনভাবে আশ্রয়লাভ করেছে। কেবল মর্ত-প্রীতি নয়, মর্ত-জীবনানুরাগের সঙ্গে অনিবার্যভাবে অরূপানুরাগ এবং পরিশেষে জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণতা। কিন্তু বাউল হোক, বৈষ্ণব হোক, সবই ভাব-সাধনার অঙ্গ, এবং দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ভাবসাধনারই বিচিত্র সুর নানারূপে অব্যাহতভাবে ঝংকৃত হয়ে এসেছে। অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের নিয়মনিষ্ঠাকে অতিক্রম ক'রে রামপ্রসাদ মুক্ত ভাবধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটালেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাবিপাকে 'ঈশ্বরে

পরানুরক্তি'কে পশ্চাতে রেখে পার্থিবজীবনাসক্তিই প্রবলভাবে জাতীয় জীবনকে আক্রমণ ক'রে বসল। এবং অতঃপর আমাদের ব্যবহারিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিপদ এসে দেখা দিলে আমাদের ইতিহাসে কোনো সালে ইতিপূর্বে তা ঘটেনি।

আমরা ইংরেজ বণিকদের আগমন ও তার পরের অবস্থা সম্বন্ধে বলছি। মোগল সাম্রাজ্যের প্রভাবের কালে সাধারণ মানুষের জীবনে যে স্বাচ্ছন্দ্য, যে অবকাশ, প্রীতি ও আদর্শ-অনুরাগ বিদ্যমান ছিল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিত হতে লাগল। ভূম্যধিকারিদের উৎপাতে সাধারণ মানুষ ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত হ'ল, আদর্শ রসলোক থেকে স্থূল জীবনে তাদের বিচ্যুতি ঘটল। কামী ও বিলাসী জমিদারেরাই হলেন ধর্মের কাব্যের তথা আদর্শের রক্ষক ও ভক্ষক। ফলে ধর্মসম্পর্কিত আখ্যানকে মাধ্যম রেখে ঐহিক ও কুরুচিপুর্ণ মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে লাগল এবং কাব্যের চেয়ে মূল্যবান দুপয়সাই কবিদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। ঐ সকল জমিদারের আশ্রয়-পুষ্ট কবিওয়ালারাই তৎকালীন বাঙালির জাতীয় ভাবাদর্শের প্রতিনিধি। ঈস্‌ট্‌ ইন্‌ডিয়া কোম্‌পানি বাংলায় পদার্পণ ক'রেই ক'লকাতা এবং পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো অঞ্চল নিজেদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করলে এবং কী ভাবে সফল-কাম হ'ল তা আজ কারো অবিদিত নেই। বাণিজ্য বিষয়ে এদের সংস্পর্শে এসে তখন ক'লকাতা অঞ্চলের অনেকেই বিত্তবান হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের বংশধর বা আত্মীয়-গোষ্ঠীর লোকেরা বিদেশী বণিকদের স্থূল জীবনের অনুসরণে প্রমত্ত হয়ে পড়ল। তখনও শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন ইংরেজ গুণী লোকেরা আসেন নি এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বিবিধ উন্নতি বিধায়ক নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন হয়নি, শিক্ষা-ব্যবস্থায় নূতন ধারার আরম্ভ হয়েছিল আরো পরে। এই

বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ক'লকাতার সমাজজীবন ধীরে ধীরে দুর্নীতি-গ্রস্ত ও ঐহিকতাময় হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেও তা কতিপয় নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি বা পরিবারেই আবদ্ধ রইল। সাধারণভাবে রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবন ছিল কামনালিপ্ত, গ্লানিময়, ভোগসর্বস্ব ও অশুচি। তা ইংরেজজীবনের ভোগময় দিকের অনুকরণে যতটা পটু ছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসরণে তেমন আগ্রহ-শীল ছিল না। রাজধানীর এই অবনত জীবনের পরিচয় তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে বেশ ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়, আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস, দীনবন্ধুর নাট্য ও কবিতা, মধুসূদনের প্রহসন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লোক-রহস্য ও প্রবন্ধাবলীতে এই জীবনের বিশেষ প্রকাশ চিহ্নিত হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাঙালির জীবনের সঙ্গে কী গভীর পার্থক্য! পতিতাসংসর্গ ও মদ্যপান তখন ক'লকাতার ধনীদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং দরিদ্রদের আকাঙ্ক্ষিত। পশ্চিমের সভ্যতা তার সাহিত্য-সম্পদ নিয়ে সেই আমাদের দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে বটে, কিন্তু জীবনে তার কোনো কম্পন তখনো আমরা অনুভব করিনি। যুক্তিবাদী রামমোহনের সাহসিক সংস্কারগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব তখনো অনুভূত হয়নি। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রে জীবনগঠন ও সংস্কারের দিকটি ধীরে ধীরে উপস্থাপিত হচ্ছিল মাত্র।

এহেন জীবন-বিপর্যয়ের কালে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপেই ভাব-জীবনের রক্ষক এবং জীবনাতীত রহস্যের দ্রষ্টা, বিভিন্ন সাধনমার্গের পথিক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন এবং স্থূল জৈব জীবনের অসারতা প্রতিপন্ন ক'রে ভোগবাসনা পরিত্যাগ ও

ভাব-জীবনের উপর আস্থা স্থাপনের উপদেশ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্মুক্তির বাণী শোনালেন, যা ভারতবাসীর এবং বিশেষভাবে বাঙালির বিস্মৃত অথচ বহুকালাগত সাধনার অন্তরতম বাণী। অথচ যুগোচিত জীবন-দর্শনের মধ্যেই তাঁর উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা করলেন— জীবনকে ত্যাগ ক'রে নয়, জীবনের কামনা ও বৈষয়িকতা ত্যাগ ক'রে মুক্তির আনন্দ লাভ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বিবেকানন্দের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হ'ল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রও একালের জীবন-অধ্যাত্মের সমন্বয়-মূর্তি। এঁরা সকলে ধর্মাদর্শের মধ্যে যা সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তা ভিন্নভাবে সাহিত্যের মধ্যে সিদ্ধ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলার পূর্বকালের বিস্মৃত ভাবপ্লাবনের যুগের অধ্যাত্মের সঙ্গে বর্তমান জীবনের, রহস্যের সঙ্গে সাহিত্যের অপূর্ব মিলন নূতন দেহে আত্মপ্রকাশ লাভ করলে। সাধক ও সম্যগ্‌দর্শী যথার্থ কবি উভয়ের ধ্যানের সাদৃশ্য দেখা গেল।

ঐ প্রাচীনই রবীন্দ্রনাথে নূতন—ভঙ্গিতে, আকারে, রূপে। এবং তা সাহিত্যের দিক থেকে এ যুগের আকাঙ্ক্ষিতও বটে, কারণ, একদিকে পাশ্চাত্য কাব্যসুধাপানে অতৃপ্ত আধুনিক বাঙালি বাংলা সাহিত্যে অধিকতর চমৎকার অশ্রুত রোম্যান্‌টিক সংগীত শ্রবণে তৃপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিল; অপরদিকে কর্মবিমুখ, ভাববিমুখ, ইহ-সর্বস্ব, দুর্বল অসাড় বাঙালির চিত্ত যেন নবচৈতন্যের জন্যে আগ্রহান্বিতও ছিল। এর ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ কাব্যেই জীবন্মুক্তির আনন্দ পরিবেশন করলেন। সে-কাব্যের ভাষারূপে পদাবলী ও সংস্কৃতের অপূর্ব মিশ্রণ, জীবনাদর্শে কালিদাসের তপোবন, এবং ভাবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে দৃষ্ট অথচ অধিকতর সম্পূর্ণ রোম্যান্‌টিক আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙালির ভাব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—জীবনের মধ্যেই অরূপের অনুসন্ধান।

জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্য বিশিষ্ট, কেবল জীবন-বিশ্লেষণে বা ব্যক্তিমানসের পার্থিব অভিলাষাদির বর্ণনাতে নয়, কামনাময় স্বার্থময় জীবনের পূর্তির বাণীতে তো নয়ই। পার্থিবতাকে আশ্রয় ক'রে অপার্থিব রসের অনুসন্ধান, বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্বোপলব্ধি, গৃহগত সংকীর্ণ সংসার-জীবনের মধ্যে নয়,—মুক্ত প্রকৃতিতে পলাতকের স্বার্থবিলীনাবস্থায় রস-সমাহিতচিত্তে প্রকৃতি-মাধুর্যের মধ্যে যে অনির্বচনীয় ভাবাবেশ—তারই চরম মুহূর্তগুলি কবির আকাঙ্ক্ষায় বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুতঃ রোম্যান্টিক অনুভূতি ও কল্পনা এমন একটি জিনিস যা মনকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রেই জীবনাতীতের জন্য উৎসুক করে, বন্ধনের মধ্যেই অবন্ধনের ব্যাকুলতা জানায়। রবীন্দ্রনাথ একটি অতি প্রবল ও সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক কল্পনার অধিকারী ছিলেন। তাই কেবল (বাস্তব) মর্তপ্রীতি নয়, অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যাকুলতাময় মর্তপ্রীতিই কবির অভীপ্সিত। যে মর্তপ্রীতি সহজেই অরূপানুভূতিতে রূপান্তরিত হতে পারে এমন রসপ্রধান কাল্পনিক মর্তপ্রীতিই কবির কাম্য। আবার নির্গুণব্রহ্মাস্বাদতুল্য ঈশ্বরভাবুকতাও কবির অভিপ্রেত নয়, নানাবর্ণময় জীবনের আধারে প্রতিষ্ঠিত অনির্বচনীয় রসস্বরূপ অরূপই কবির অর্চনীয়। মর্তপ্রীতির সঙ্গে অধ্যাত্ম-প্রীতির, জীবনের সঙ্গে অরূপের মিলনেই তাঁর প্রতিভা সার্থক হয়েছে। একদিকে পুরাতন ভারতবর্ষ তার বহুবিচিত্র রসসম্পদ নিয়ে আর একদিকে আধুনিক মানুষ তার জীবনের প্রতি অনুরাগ (তৎকালে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে সঞ্চারিত) নিয়ে যেন এই কবির দৃষ্টির সম্মুখে এসে প্রকাশের জন্যে দাঁড়িয়েছে। কবি অপূর্ব শক্তিবলে উভয়কেই পরিতুষ্ট করলেন। পশ্চিমের জীবন-রস-ধারা ও ভারতীয় ভাব-সাধনা যেন

সম্মিলিত প্রকাশের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল,—রবীন্দ্র-মানসে এসে উভয়ের পরিতৃপ্তি ঘটেছে।

কবির প্রতিভায় এই দুই আপাত-বিরুদ্ধ ধারার সম্মিলন এত অনায়াসে ঘটেছে যে এদের মধ্যে পার্থক্যের কোনো রেখা টানা সম্ভব নয়। কবির প্রবল রোম্যান্‌টিক অনুভূতি ধীরে ধীরে অরূপ-চেতনায় যে কী ভাবে প্রবেশ করেছে এবং পরে অরূপ থেকে সমাহিত দৃষ্টি কী ভাবে জীবনে নিপতিত হয়েছে তার বিচার যেন সম্ভব নয়, শুধু বিমূঢ় মন নিয়ে যা অনিবার্য তার অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। রবীন্দ্র-কাব্যপাঠে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে তাঁর রচনায় প্রারম্ভ থেকে একটি ক্রম-পরিণাম ঘটেছে এবং তা তাঁর কবি-স্বভাবেরই পরিণাম। পরিণামমুখী গতিশীল কবিস্বভাব অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যাত্রা ক'রে চলেছে যতক্ষণ না তার দৈবনির্দিষ্ট পুর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উগ্র কবি-স্বভাবের বশবর্তী ব'লেই এই কবির চিত্তে কোনো লৌকিক ভাবনা, বেদনা স্থায়ী ও গভীর ভাবে দাগ কাটতে পারেনি। কবিমানস আসক্তি-বিহীন, নির্মম, উদাসীন। ঠিক এই জন্যেই কোনো শাস্ত্র, তত্ত্ব, বা পূর্বনির্দিষ্ট মতবাদও কবির চিত্তকে প্রভাবিত করতে পারে নি। উপনিষদের বাণী বা ব্রাহ্মধর্মের নির্দেশও এঁর সংস্কারমুক্ত প্রতিভার কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়েছে এবং যতক্ষণ না স্ব-ভাবের অনুকূলতায় স্বতই ঐ সকল ভাবধারা কবিচিত্তে আশ্রয় লাভ করেছে ততক্ষণ কবি তাদের স্বীকারই করেন নি। এইজন্যে রবীন্দ্র-কবিমানসে উপনিষদ অথবা ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব সম্পর্কে চিন্তাসহকারে বচন-বিন্যাস কর্তব্য। এমন কি কালিদাসের রোম্যান্‌টিক ভাববিলাস বা প্রকৃতিপ্রীতিমূলক তপোবনাদর্শও কবির স্বধর্মের অনুকূলভাবেই গৃহীত হয়েছে একথা স্বীকার না করলে তাঁর কবি-প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে,

এহেন প্রতিভা যে একটি বিশেষ যুগের প্রয়োজনে আবির্ভূত এই সত্যেও বিশ্বাস হারাতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথ যে স্রষ্টা, কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট ভাবধারার অনুবাদক মাত্র নন, তাও ভুলতে হবে।

উপরিউক্ত কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত মিলিয়ে তাঁর সৃষ্টির রহস্য সম্যক অনুধাবন করা সম্ভব নয় ব'লেই আমরা মনে করেছি এবং তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির কোনোটিকেই অতি সাময়িক রঙে অনুরঞ্জিত ক'রে গ্রহণ করতে পারিনি। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র জীবনচরিতের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ ক'রে কাব্যবিচারের বিরুদ্ধে কবিও বার বার আপত্তি জানিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কবি ক্ষীণভাবে কোনো ঘটনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সত্য, কিন্তু এর আশ্রয়ে যে সুদূর কল্পলোকে ধাবিত হয়েছেন তাতে ঘটনার স্মৃতি কোনো রেখাপাত করতে পারেনি এবং সাময়িকতা শাশ্বতভাবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। মোটকথা, কবিজীবন ও তাৎকালিক ঘটনা কবিমানসকে জানার দিক দিয়ে কোথাও সহায়তা করলেও তাদের সীমা সম্পর্কে যেন অবহিত হ'তে পারি এবং এ কথা না ভুলে যাই যে রবীন্দ্ররহস্যলোকের দীপবর্তিকা সেই গোপনচারী কবি স্বয়ং।

কবি-স্বভাবের ঐ স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী বিকাশের দিক লক্ষ্য ক'রে 'প্রভাব' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায়, ঐ শব্দটির প্রয়োগকালে, ঠিক সে অর্থে আমরা গ্রহণ করিনি। কারণ প্রতিভা তার স্বকীয় প্রকাশধর্মবশে যা গ্রহণ করে তাকে ঐ প্রতিভার বাহ্য উপাদান মনে করলে কবির প্রতি সুবিচার করা হয় না। বিশেষতঃ যে গীতি-কবির প্রতিভা একটি স্বকীয় গতিপথ অনুসারে চলেছে তাকে কেবল-মাত্র উক্তির খাতিরে ছাড়া 'প্রভাবান্বিত' একথাও বলা চলে না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বধর্মের প্রতিকূল তাঁর কাব্যে কিছু আছে একথা আমাদের মনে হয়নি। এই কবির কাব্যজীবনের বাল্যাবস্থায় যেখানে দেশীয় এবং য়ুরোপীয় বিভিন্ন কবির অনুকরণের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে, এবং কবির স্বকীয়তা প্রকাশ পায়নি সেখানে প্রভাব শব্দটি বরং সুপ্রযোজ্য হতে পারে। এই প্রতিভার বিকাশের কালে, যেখানে সংস্কৃত কাব্যের ভাব ও ভঙ্গি সহায়তা করেছে, যেখানে কবি অনুকরণ করছেন না, স্বধর্মবশে অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে কোথাও কোথাও ভাষার খাতিরে আমরা 'প্রভাব' শব্দটি ব্যবহার করেছি মাত্র।

স্ব-রূপে ভাস্বর এই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচারে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো অভিমতকে কাব্যের পূর্বে স্থাপন করা যেমন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিনি তেমনি গতানুগতিক কোনো শব্দ বা বুলির আশ্রয় গ্রহণ করতেও সংকুচিত হয়েছি। কিন্তু ভাবসাদৃশ্য ও উক্তিসংক্ষেপের প্রয়োজনবশে কখনো কখনো 'রোম্যান্‌টিক' বা 'রস' এরকম দুএকটি অতিপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেছি। রবীন্দ্রনাথের অভিনব প্রকৃতি-ভাব-বিহ্বলতা বা রহস্যময় সৌন্দর্য-ধ্যান-স্পৃহার প্রকার যদিও তাঁর স্বকীয় তথাপি ঐগুলির পশ্চাতে যে মনোভাব বিদ্যমান তা উনিশ শতকের ইংরেজি রোম্যান্‌টিক শ্রেণীর কবিদের অভিনব মনোভাবের সদৃশ ব'লে ওগুলিকে সাধারণভাবে ঐ নামেই অভিহিত করেছি। বলা বাহুল্য, কবি কালিদাসও বহুল পরিমাণে এই মনোভাবের অধিকারী ছিলেন।

কবির ঈশ্বর-ভাবুকতা বা অধ্যাত্ম-অনুরাগ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা 'অরূপ' শব্দটির ব্যবহারই সমীচীন ব'লে মনে করেছি। যেহেতু কবির ঈশ্বর কবির স্বকীয় একটি উপলব্ধিবিশেষ, তা না-দ্বৈত, না-অদ্বৈত, না-বৈষ্ণব, না-ব্রাহ্ম, সেইহেতু, কবির অধ্যাত্ম-অনুভূতির যথাসম্ভব প্রকাশক ঐ শব্দটিই আমরা বেছে নিয়েছি, যদিও বর্ণনার

খাতিরে 'ঈশ্বর' শব্দও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'অরূপ' শব্দটি স্বয়ং কবিরও নির্বাচিত।

রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুমুখী হ'লেও যেহেতু কবিত্বেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়, সেইহেতু রবীন্দ্র-প্রতিভা বলতে রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভাকেই আমরা লক্ষ্য করেছি। এই কবি-প্রতিভার অনুসরণে আমরা তাঁর উপন্যাস ও গল্পকে বর্জন করেছি। তার কারণ এই নয় যে, উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্র-কবি-স্বভাবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, তার কারণ এই যে, কবির লেখা হ'লেও উপন্যাস স্পষ্টতঃ জীবন-অনুসারী। রবীন্দ্র-কথা-সাহিত্যে যে কাব্যাদর্শের প্রভাব পড়েছে তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়। কিন্তু ভাবসংকেতময় নাটকগুলি তাঁর কবিতার সমধর্মী রচনা ব'লে আলোচনায় তাদের অবশ্যই গ্রহণ করা হয়েছে। আবার এমনও ঘটেছে যে আমাদের উপপাদ্য বিষয়ের প্রয়োজনবশে কবির কাব্যগ্রন্থগুলির সব ক'টিরই বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হয়নি, —কোথাও মাত্র দিগ্‌দর্শন করতে হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত লঘু রচনা দুএকটি অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, কবির উপলব্ধি একটি ঐক্যের সূত্র ধ'রে অগ্রসর হ'লেও বিভিন্ন কালের বিশেষ প্রবণতা ও বিকাশের পর্যায় অনুসারে তাঁর কাব্যকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত ক'রে দেখেছি। এইভাবে, প্রারম্ভ থেকে কড়ি ও কোমল পর্যন্ত— অপ্রকাশের কাল; মানসী ও সোনার তরীতে প্রতিভার উন্মেষ; চিত্রায় বিকাশের প্রথম পর্যায়; চৈতালি থেকে নৈবেদ্য পর্যন্ত বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়—সংস্কৃত সাহিত্যের ও প্রাচীন জীবনাদর্শের অনুসরণের কাল; নৈবেদ্য কাব্যটিকে ভারতীয় জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শের পূর্ণতম অভিব্যক্তির অথচ অরূপানুভূতিতে পদক্ষেপের সন্ধিক্ষণের

রচনা ধ'রে নৈবেদ্য, উৎসর্গ, খেয়া ও শারদোৎসবে অরূপানুভূতির প্রারম্ভকাল—তৃতীয় পর্যায় ; গীতাঞ্জলি, ডাকঘর, গীতিমাল্য প্রভৃতি রচনার কালে অরূপানুভূতির পূর্ণতা—বিকাশের চতুর্থ পর্যায় ; এবং গীতালি-বলাকা থেকে ঋতুনাট্যগুলি, রক্তকরবী, মহুয়া পর্যন্ত বিকাশের শেষ পর্যায়—অরূপের সঙ্গে জীবনের সমন্বয়, এবং এই সমন্বয়েই রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতা, তার যাত্রার পরিণাম। পরিণামের পরবর্তী পরিশেষ, পুনশ্চ কাব্য থেকে আরম্ভ ক'রে শেষজীবনের বিস্তৃত অধ্যায়টি আমরা গোধূলি-পর্যায় নামে অভিহিত করেছি।

গোধূলি নামে অভিহিত হ'লেও এবং আন্তরধর্মের দিক থেকে রবির প্রতিভা-রশ্মির সংবরণ লক্ষিত হ'লেও একালটি উত্তম কাব্যসৃষ্টি থেকে বঞ্চিত নয়। বিষয়বৈচিত্র্যে, নিজমানসের নিপুণ বিশ্লেষণে এবং প্রকাশরীতির অভিনবত্বে সায়াহ্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির ঐক্যমূলক সমগ্র পরিচয়ের জন্যেও এই পর্যায়ের অধ্যয়ন অপরিহার্য।

অপ্রকাশের কাল

'বনফুল' থেকে 'কড়ি ও কোমল'

বাণীর সাধনা সহজ নয়, কাব্য-সাধনা আরও কঠিন। সুকবির সৃষ্টি যে নিরলস-সাধন-সাপেক্ষ তাতে সন্দেহ কি? কবি রবীন্দ্রের সুবিশাল সৃষ্টির পশ্চাতে একটি বিস্তৃত সাধনার ইতিহাস বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ অলৌকিক শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা যদি উপযুক্ত প্রয়াসের দ্বারা অভ্যর্থিত না হ'ত তাহ'লে বাণীর অধীশ্বর, বাঙালির বহুসঞ্চিত পুণ্যফলের মূর্তবিগ্রহ এই কবিকে আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রাচীনেরা কবির এই সাধনার দিকটিকে অভ্যাস, অভিযোগ, রচনাবিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি প্রভৃতি নানা ভাবে অভিহিত করেছেন। সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সতত বিজড়িত নিজের কঠিন অভিনিবেশকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ চিত্রা-কাব্যের 'সাধনা' নামক কবিতায় বলেছেন—

> তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
> পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
> শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
> শতেক বার।

এবিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের কথা এই যে কৈশোরে পদার্পণের সঙ্গেই তিনি দুরূহ অভিনিবেশে ব্রতী হয়েছিলেন। শক্তি যখন প্রকাশের আনুকূল্য লাভ করে নি, বাণী যখন প্রতিপদে স্খলিত, ব্যুৎপত্তি যখন পরানুকরণেই প্রবৃত্তি দেয় তখন বিরামহীন

লেখনী-চালনা যে কী অপরিসীম অনুরাগের পরিচায়ক তা সহজেই অনুমেয়।

কবি রবীন্দ্রের স্বরূপে আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর অপ্রকাশের একটি কাল রয়েছে। তখন কবির প্রতিভার উন্মেষ হয়নি। কাব্যজীবনের দিক থেকে দেখলে এটি নেহাৎ বাল্যকাল। ভিন্ন ধরণের উপমা দিয়ে এটিকে প্রত্যুষের পূর্বাবস্থা বা নীহারিকার অবস্থা বলা যেতে পারে। বনফুল থেকে আরম্ভ ক'রে ছবি ও গান, এমন কি কড়ি ও কোমল পর্যন্ত তেরো চোদ্দটি কাব্য ও নাট্য নিয়ে এই দীর্ঘ অপ্রকাশকালের রচনা। প্রথমে কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে এবং পরে নির্বিষয়ভাবে, কিশোর-কবির সেকালের হৃদয়-বেগ এগুলিতে যথাসম্ভব আকার লাভ করেছে। আধুনিক গীতিকাব্য বলতে যা বোঝায় এই সময় বাংলা সাহিত্যে সেই শ্রেণীর কবিতা-রচনা সবে আরম্ভ হয়েছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কয়েকটি খণ্ডকবিতায় এর আভাস দেখা গেছে, এবং নির্বিষয় হৃদয়ভাব-বিলাসের পথ বিহারীলাল উন্মুক্ত করেছেন। এছাড়া যে নূতন ধরণের কাব্যরচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাল্যে পরিচিত হয়েছিলেন তা হ'ল দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য। এই নিয়েই যে-সাহিত্যে গীতিকাব্য-রচনার ব্যাপ্তি সে-সাহিত্যে এতগুলি রচনার কাল বিচারে আপেক্ষিক মূল্য আছে নিশ্চয়ই। এই কারণে তিনি বঙ্কিম-প্রমুখ অনেকের কাছে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। কিন্তু যখন থেকে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে তখন থেকে ঐ রচনাগুলির মূল্য সাধারণের কাছে ও তাঁর কাছে নগণ্য হয়ে পড়েছে। তার কারণ কেবলমাত্র এই নয় যে সেগুলির ভাষা ও ভঙ্গি দুর্বল, হৃদয়ভাব বালকোচিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্ব, তার কারণ এই যে, নিসর্গ এবং মানুষ সম্বন্ধে যে একান্ত অভিনব

কল্পনাভঙ্গি মানসী থেকে আরম্ভ ক'রে একটি নির্দিষ্ট পথে বিবর্তনের মুখে অগ্রসর হয়েছে তার পরিচয় ঐ রচনাগুলিতে পাওয়া যায় না। ভাষাশিল্পের দিক থেকে বা একটি অতি সাধারণ অস্পষ্ট রোম্যান্টিক মনোভাবের দিক থেকে কড়ি ও কোমল কাব্যে তাঁর সাহিত্যিক নৈপুণ্য প্রকটিত হ'লেও যেহেতু এর মধ্যেও একমাত্র রবীন্দ্রেরই কবি-স্বভাবের অন্তর্নিহিত বস্তু—ঐ বিশিষ্ট কল্পনা (সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকর্ষণ ও বিশ্বের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক) অলভ্য, সেইহেতু ঐ কাব্যটিকেও যথার্থভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করা যায় না; যদিও এটুকু বোঝা যায় যে 'কড়ি ও কোমল' তার পুর্বেকার ছবি ও গান, প্রভাত-সংগীত ও সন্ধ্যা-সংগীত থেকে ভিন্ন ও উন্নততর সাহিত্যিক রচনা, এবং সন্ধ্যা-সংগীত বা প্রভাত-সংগীত আরও পুর্বেকার শৈশব-সংগীত, কবি-কাহিনী প্রভৃতি থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত রচনা।

বনফুল, কবিকাহিনী, শৈশব-সংগীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রভৃতি পড়তে পড়তে আমরা কখনো স্কট, কখনো ওআর্ডস্‌ওআর্থ, ব্রাউনিং শেলি প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের, এমন কি, কবি কালিদাসেরও সম্মুখীন হয়েছি এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছি কবির কৈশোরের আদর্শ—কবি বিহারীলালের। ভাবে ও ভাষায় বিহারী-কবির সজ্ঞান অনুসরণের মধ্যেই কবি-কিশোর সার্থকতার পথ খুঁজছিল এবং তা-ই ছিল তার তখনকার উচ্চতম অভিলাষ। একালের রচনার স্বরূপ নির্ণয় করতে কবি 'গদ্‌গদভাষণ', 'প্রলাপ', 'কাঁচা হাতের রচনা' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করেছেন। ছবি ও গান পর্যন্ত রচনায় ছন্দের স্খলন, অনুপযুক্ত শব্দের ব্যবহার, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি নানা ভাষার দোষ লক্ষিত হ'লেও ক্বচিৎ উচ্চভাবের বাহন হওয়াতে দোষগুলি তেমন চোখে

পড়ে না। যেমন ধরা যাক নিম্নলিখিত দুটি দৃষ্টান্ত :

অতীত সুখের স্মৃতি বর্তমানে দুখজ্বালা
ভবিষ্যতে এ কী রে কুয়াশা!
যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র-মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছি জীর্ণ তরী,
এসেছি যেথান হতে অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি!

* * *

সম্মুখে আসন্ন ঝড় সম্মুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুত-শিখায়! (শৈশব-সংগীত)

চাও তুমি দুখহীন প্রেম ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী, বহে যেথা বসন্ত-বাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম, আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল, উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস
(সন্ধ্যা-সংগীত)

সন্ধ্যা-সংগীত থেকে প্রভাত-সংগীতে যে ভাবান্তরই ঘটুক না কেন এখানেও অন্তরের অসম্বদ্ধ প্রলাপ, এলোমেলো উচ্ছ্বাস। একমাত্র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় উচ্ছ্বাসের মধ্যেও একটা মনোভাবের সূত্র পাওয়া যায় মাত্র। ছবি ও গানে ইতস্ততঃ প্রকৃতির যে চিত্র-পরিচয় দেওয়া হয়েছে কল্পনার অপরিণত অবস্থায় তা উল্লেখযোগ্য হতে পারে। একালের রচনাগুলিকে সমগ্রভাবে দেখলে কৃত্রিমতার মধ্যেও নীহারিকার আলোর আভাসের মত যা দৃষ্টিগোচর হয় তা হ'ল প্রকৃতি-প্রীতি এবং মানবীয় স্নেহ-প্রেমের আকর্ষণ। এই অপরিণত মানবীয়তার

দিকটি কড়িও কোমল (তু০—মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই) বা মানসীর কোনো কোনো কবিতা পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। মোটের উপর মানসী-পূর্ব এই কাব্যরচনার যুগটি আমরা অনুকৃতির যুগ ব'লে মনে করেছি। স্বদেশী বহু কবির রচনার মধ্যে এই সময় কবিকে বিচরণ করতে দেখেছি এবং কবির নিম্নলিখিত উক্তিরই যাথার্থ্য অনুভব করেছি :

তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা দিবস-নিশি।

এই অনুকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 'ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী'। বাংলা সাহিত্যে এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অনুকরণের চিহ্ন আর নেই। অনুরাগের বলিষ্ঠতার সঙ্গে রূপ ও মর্ম উভয়েরই প্রবল অনুকরণ-প্রচেষ্টা কবির কৈশোরের যোগ্যই হয়েছে। আর সেই কারণে আধুনিক কবির এই প্রাচীন রচনা কৃত্রিম, স্বতঃস্ফূর্তিহীন এবং নানা ত্রুটিতে পূর্ণও হয়েছে। কবি ঠিকই বলেছেন—'একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।' আত্ম-সমালোচনায় কবি মর্মগত মেকিত্বের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ পদাবলীর রাধার আর্তি এখানে অবিদ্যমান, কিন্তু তার পরিবর্তে কিশোর আধুনিক কবির প্রকৃতি-সৌহার্দের ভূমিকায় কোনো কাল্পনিক কিশোরীর মুগ্ধ ভাববিকাশের যে নিজস্ব অস্ফুট চিত্রাঙ্কন লক্ষ্য করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি সমালোচনায় কিছু বলেন নি। উদাহরণ সহকারে বোঝালে এইটুকু বলা যায় যে—'বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন, বিফল রে এ মঝু দেহা' অথবা 'না যমুনা, সো এক শ্যাম মম, শ্যামক শত শত নারী ; হাম যব যাওব শত শত রাধা চরণে রহব তারি।' ইত্যাদি স্থলে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসাদির অনুকরণ যদিও লক্ষ্য করা যায়, 'চকিত

গহন নিশি, দূর দূর দিশি' অথবা 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনী রে' কিম্বা 'তৃষিত নয়ানে বনপথ পানে নিরখে ব্যাকুলা বালা' অথবা 'আজু সখি মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু' প্রভৃতির মধ্যে কবি-বর্ণিত পূর্বেকার নলিনী-মুরজার চিত্র এবং পরবর্তী কড়ি ও কোমলের যৌবনোচ্ছ্বাসের স্বকীয় সুরই অনুভবগম্য। বস্তুতঃ ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী কবিমানসের সেই প্রবণতাই নির্দেশ করে যা কবি-প্রতিভার অপরিণতির কালে আত্মতৃপ্তির জন্যে পূর্বতন কবিদের সৃষ্টির রাজ্যে পরিভ্রমণ করায়, সৌহার্দবশতঃ তাদের অল্পবিস্তর অনুকরণে ও অনুসরণে প্রবৃত্ত করে। পরিণত কবিমানসে অবশ্য কোনো অনুসরণ স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয় না, তখন প্রাকৃতন মহাকবিদের সৃষ্টির মধ্যে পরিভ্রমণের পর তাঁদের ভঙ্গি ও ভাব এমন আত্মস্থ হয়ে পড়ে যে প্রকাশের মধ্যে তাদের চেনা যায় না। এইভাবে প্রাচীনের অভিব্যক্তি নবীনের মধ্যে জীবন্ত ও সার্থক হয়ে পড়ে। পরবর্তী কল্পনা কাব্যের আলোচনার সময় আমরা এ বিষয় বিস্তৃতি সহকারে উল্লেখ করব। আপাততঃ ভানুসিংহে সচেতন অনুকরণ-প্রচেষ্টার মধ্যে কবি-সৌহার্দের প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। পরবর্তী কড়ি ও কোমল ও মানসীর কয়েকটি কবিতায় ও গানে প্রত্যক্ষভাবে পদাবলীর সুর আমরা শুনতে পাই। কবির অনির্দেশ্য বেদনা ও আকাশবিহারী কল্পনাতেও পদাবলী তার ভাষা ও ভঙ্গি দান করেছে। বস্তুতঃ কবির আত্মলীনতা পদাবলীর সগোত্র ব'লেই এবং এ যাবৎ পদাবলীর ভাষা উত্তম গীতি-কাব্যের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সন্ধ্যাসংগীতের 'চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া' ও ছবি ও গানের 'কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া' থেকে আরম্ভ ক'রে মানসীর 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' পর্যন্ত সবই গোপনে পদাবলীর ভাষা।

সন্ধ্যাসংগীতের অস্পষ্টতা, প্রভাতসংগীতের স্বচ্ছতা প্রভৃতি কোনো কোনো পূর্বস্থরির আলোচনার বিষয় হ'লেও আমরা মনে করি, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের সূত্রে এদের আণবিক মূল্য মাত্র স্বীকার্য—তাও যেমন কাব্যোপযোগী সাবলীল ভাষা গঠনের দিক থেকে তেমন আন্তর ধর্মের দিক থেকে নয়। সুতরাং এদের সম্পর্কে আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পর থেকে ধৈর্যশীল বুদ্ধিজীবী গবেষক ছাড়া, রসিক থেকে সাধারণ স্তর পর্যন্ত সকলের কাছে এদের মূল্য অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ মানসী থেকেই যথার্থ রবীন্দ্র-কাব্যের আরম্ভ, মানসী থেকেই এই অসামান্য কবির অসামান্যতার লক্ষণগুলি সুপ্রকাশ। এমন কি মানসীতে যা অনায়াসেই লভ্য, মানসী-পূর্ব কড়ি ও কোমলে অনুসন্ধান করলেও তা অবিদ্যমান দেখা যায়। এই কারণেই স্বয়ং কবিও মানসী থেকেই তাঁর কাব্য-পর্যায়ের আরম্ভ ব'লে মনে করেন। তথাপি কড়ি ও কোমল আমরা একটু বিস্তৃতির সঙ্গেই আলোচনা করব, কারণ, এই রচনাটি রবীন্দ্র কাব্য-নন্দনলোকের প্রবেশদ্বারের সমীপে বিদ্যমান।

কড়ি ও কোমল যৌবনারম্ভের কাব্য। যদিও প্রথম যৌবনের কাব্য ব'লে রচনার কোনো সাধারণ লক্ষণ নেই, কারণ, কীট্‌স্ ঐ বয়সেই প্রৌঢ় কাব্য রচনা ক'রে গেছেন এবং শ্রীমৎশংকরাচার্য যৌবনেই জরাহীন বার্ধক্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তথাপি ঐ কাব্যের অন্তর্গত লঘু উচ্ছ্বাসময়তা ও স্বপ্নাবেশকে লক্ষ্য ক'রে যৌবনধর্মের সঙ্গে কবির অনুভূতির সহজ সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে। কড়ি ও কোমলের

আলোচনায় এতে কী আছে শুধু তা দেখলেই এর মর্ম সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না, এতে কী নেই তা-ও বুঝতে হবে, কারণ এই কাব্যটিকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে অনেকেই সম্মানিত করেছেন।

একদিক থেকে কড়ি ও কোমল অব্যবহিতপুর্ব রচনা প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান থেকে শুধু অগ্রসরই নয়, স্বতন্ত্র। এখানে মানব-হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ আছে, বিরহের দীর্ঘশ্বাস ও মিলনের মোহ আছে, যৌবনের স্বপ্ন-বিহ্বলতা ও আবেশ আছে, অর্থহীন প্রলাপ নেই, অনুভূতির অস্পষ্টতা নেই। সর্বোপরি ভাষা ও ভঙ্গির অ-পুর্বদৃষ্ট পূর্ণতা আছে। কড়ি ও কোমলের পুর্বেকার রচনায় এমন কয়েকটিও পঙ্‌ক্তি নেই যা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। মোটের উপর, কড়ি ও কোমল রূপ-রসাদিময় কাব্য হয়েছে, পূর্বের রচনা তা হয়নি। আর এমনও বলা যেতে পারে যে কবির অন্য সব রচনা বিলুপ্ত হয়ে যদি এই কাব্যখানি থেকে যায় তা'হলেও তিনি একজন ভালো আত্মনিষ্ঠ কবি ব'লেই জীবিত থাকবেন। এই কাব্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হ'লে যে সমালোচনার সূচনা হয়েছিল কবি তার যথার্থ কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন,—'এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না' (রচনাবলী, কবির মন্তব্য)। রীতি বলতে এখানে কবি-সমালোচক কেবলমাত্র আখ্যান-কাব্যের বিপরীতমুখী গীতিধর্ম-প্রবণতাকেই বোঝাচ্ছেন না, সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত দেহ ও মনের বিচিত্র সুখদুঃখাদি বিষয়ক অনুভূতির প্রকাশেরও ইঙ্গিত দিচ্ছেন। খাঁটি লিরিক-কবিতার ক্ষেত্রে বিহারীলালের প্রকাশ ইতিপুর্বেই সিদ্ধ হ'লেও (সারদামঙ্গল, ১২৮১) তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু সাধারণের আয়ত্তের অতীত ও তুরীয় লোকের ছিল। অথচ এই যুবক কবির স্বপ্নময়তা পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করেনি ব'লে সহজেই তা সমালোচনার যোগ্য হয়েছিল; দেহ

ও মনের বিচিত্র বাসনা নিয়ে 'বেআইনী প্রমত্ততা' স্বাভাবিকভাবেই কটাক্ষভাজন হয়ে ছিল।

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত ক'রে দেখলে অসংগত হবে না। প্রথম, বাইরের মানুষের সুখদুঃখাদি হৃদয়ভাব সম্পর্কে; এই শ্রেণীতে পড়ে মোটামুটি —পুরাতন, নূতন, যোগিয়া, কাঙালিনী, ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, মথুরায়, বনের ছায়া, কোথায়, শাস্তি, পাষাণী মা, বিরহীর পত্র, মঙ্গলগীত প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় কবির বস্তুহীন নিরাকার যৌবনস্বপ্নাবেশের পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সারাবেলা, আকাঙ্ক্ষা, তুমি, যৌবনস্বপ্ন এবং এরই বিস্তাররূপে আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাসনাশ্রিত চুম্বন, বাহু, চরণ, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি প্রভৃতি সনেটগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। তৃতীয় পর্যায়ে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি এবং প্রকৃতির বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে স্বানুভূতির প্রকাশের চেষ্টা রূপায়িত হয়েছে। এই শ্রেণীর সনেটগুলিতে বন্ধনের মধ্যে অবন্ধনরূপে গীতিকবি-হৃদয় সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। রূপ এবং রসের অনুভূতি ও তার প্রকাশের, আলংকারিক অভিমতে, শব্দার্থের একান্ত মিলন সর্বপ্রথম এই স্তরের কবিতাগুলিতেই পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বেকার কোনো রচনাতেই এহেন কবিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না। তাই কড়ি ও কোমল যথার্থ কাব্য, পূর্বেকার রচনা চিত্রকাব্যের সগোত্র।

কড়ি ও কোমলে ভাষাকে আধুনিক গীতিকাব্যের অনুভূতিশীলতার যোগ্য বাহকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে কবিকে অজ্ঞাতসারে কখনো বৈষ্ণব কবিদের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে, কখনো ক্ষীণভাবে কোনো সংস্কৃত কবির, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহস অবলম্বন ক'রে অর্থ ও অলংকারের প্রচলিত যুক্তিমত্তাকে অগ্রাহ্য ক'রে ভাষা কবিকে স্বয়ং গঠন করতে

হয়েছে। 'নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে' এবং 'এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা কেমনে আছে সে পাসরি। সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী সেথা কি বাজে না বাঁশরি' এবং 'শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে' প্রভৃতি কবিতার ভাষায় পদাবলীর ছায়াপাত অবশুই লক্ষণীয়। আবার 'সন্ধ্যার বিদায়' কবিতার—'যেতে যেতে কনক-অঁাচল বেধে যায় বকুল-কাননে' 'গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে' 'নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে' প্রভৃতি স্থলে ভাষার সঙ্গে আলংকারিক চিত্রের অনুসরণও অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু নিম্ন-লিখিতরূপ উদাহরণে কবির ভাষাগঠনের সাহসিক প্রচেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়—

ঝরে আলোকের কণা, রবি শশী তারা,
ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা (সিন্ধুগর্ভ)

গভীর তিমির-স্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া (অস্তমান রবি)

দেখো ঐ দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ-শিখা
দহিবে আঁধার-নিদ্রা বিমল অনলে। (মরীচিকা)

কেবল বিষয়বস্তু নয়, লিরিক কবির ভাষার বেআইনীও তৎকালীন দিঙ্‌নাগদের অসহনীয় ছিল; তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে, ভাষাকে যিনি বহু বিচিত্র 'অনর্পিতচরী' ভাবনা ও অতীন্দ্রিয়-কল্পনার বাহন ক'রে গৌরবান্বিত করতে চান, তিনি ভাষার অনুবর্তী হবেন না, ভাষাকেই

তাঁর বশ্যা হতে হবে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও ভঙ্গির প্রয়োজনানুরূপ যথেচ্ছ পরিবর্তন মানসীতে আরো প্রকট এবং এর পর কিছুকাল যাবৎ কাব্যরাজ্যের এই 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' ভাষাকে স্ববশে আনবার প্রত্যক্ষ চেষ্টা থেকে বিরত হ'লেও 'কল্পনা' রচনার সময়ে নূতনভাবে ভাষার শক্তির যে-পরীক্ষা করেছেন, তার আলোচনা যথাস্থানে করেছি।

কড়ি ও কোমলের কয়েকটি কবিতায় আধুনিক কবিহৃদয়ের অসম্যগ্‌জ্ঞাত, আলো-অন্ধকারের মধ্যবর্তী সুদূর কল্পলোকের প্রতি অনুরাগ ও সেই সঙ্গে বেদনাময়তার প্রতিফলন ঘটেছে। একদিকে মদির স্বপ্নবিহ্বলতা, আবেগময় উচ্ছ্বাস এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমা বিলুপ্ত ক'রে কল্পলোকে ধাবমান হওয়া, কখনো বা মানবলোকে বিচরণের অভিলাষ, আর একদিকে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে শৃঙ্খল-মোচনের আগ্রহ, সকলে মিলে এই কাব্যটিকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রোম্যান্টিক কাব্য ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। এই কল্পনাময়তার সহজ ও বিশুদ্ধ উদাহরণ 'উপকথা' কবিতাটি। এর সঙ্গে কল্পনার 'প্রকাশ' কবিতা তুলনার যোগ্য এবং 'মেঘরাজ্যে'র পটভূমিকার সঙ্গে পরবর্তী 'মেঘদূত' 'সোনার-তরী' প্রভৃতির সুদূর সঞ্চরণ একত্র আলোচ্য।

কড়ি ও কোমল এই রকম উচ্চস্তরের কাব্যলক্ষণযুক্ত হ'লেও রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে পাওয়া যায় না। যে প্রকৃতিপ্রীতি সুগভীর বিশ্বাত্মবোধে পরিণতি লাভ করেছে তা এখানে নেই। প্রকৃতি সম্পর্কে এখানে কবির স্বতন্ত্র কোনো মনোভাবই যেন নেই, প্রকৃতি অবিশুদ্ধভাবে কবির বিভিন্ন অনুভূতির জাগরণের সহায়ক-মাত্র হয়েছে। 'বনের ছায়া' কবিতাটিতে নাগরিক জীবনের প্রতি আস্থাহীন গ্রাম্যজীবনযাত্রালোভী বিহারীলালের সদৃশ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। অন্যত্র ('খেলা' কবিতায়)—

মাঠের থেকে বাছুর আসে, দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে ড্যাবা ড্যাবা চোখ।
কাঠবিড়ালী উস্কখুস্ক আশেপাশে ছোটে * * *

প্রভৃতির মধ্যে বিহারীলালের অনুকরণ স্পষ্টতর। আবার,

আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়

প্রভৃতিতে প্রকৃতি শুধু কবিহৃদয়ের রোম্যান্টিক অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা ও উদাসীনতার উৎসমাত্র হয়েছে। ঐ ব্যাকুলতা জাগানোর জন্যেই যেন প্রকৃতির বর্ণিত পরিবেশগুলির প্রয়োজন, নতুবা প্রকৃতি স্বকীয় গৌরবের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল নয়। অথচ মানসীর প্রকৃতির প্রতি, কুহুতান প্রভৃতি কবিতার বিশুদ্ধ প্রকৃতি-প্রীতি কেমন প্রত্যক্ষ ও গভীর। যে অনির্দেশ্য সৌন্দর্যব্যাকুলতা মানসীর 'মেঘদূত' ও 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতার জন্ম দিয়েছে এবং যা কবির কাব্যজীবনের বিকাশের মধ্যে একটি স্থির সৌন্দর্য-সাধনার রূপ পরিগ্রহ করেছে, কড়ি ও কোমলে তার স্পর্শও অলভ্য। 'যৌবনস্বপ্ন' ও 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় প্রত্যক্ষের অতীত ছায়ালোকবাসিনী অচেনা বিদেশিনীর পদধ্বনি শোনা গেলেও তা কবির বিশিষ্ট সৌন্দর্যরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। এই অনির্দেশ্য রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা মানসীতেও আছে (বিরহানন্দ, ভুলে, ভুলভাঙা প্রভৃতি দ্রঃ), কিন্তু তা ধীরে ধীরে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতায় রূপান্তরিত হয়েছে। ঐ সৌন্দর্যে রূপান্তরের পূর্বাবস্থাই মানসীর উল্লিখিত কবিতা-গুলির মতো এখানেও নিম্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে সূচিত হয়েছে—

প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।

যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।

* * * *

যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

অথবা,—

কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।

এর পর থেকে যে-সৌন্দর্যকল্পনার বস্তুকে কবি 'তুমি' অথবা 'কে' অথবা 'বিদেশিনী' ব'লে আহ্বান করতে আরম্ভ করলেন, সে-নারী যে কবির অনতিপরিস্ফুট রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা থেকেই মূর্তি পরিগ্রহ করেছে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

সোনার তরী এবং চিত্রার আলোচনাকালে দেখতে পাব কবির মানবপ্রীতি কত ব্যাপক এবং গভীর, এবং তার কারণ হ'ল এর বিশিষ্ট-কল্পনাশ্রয়ী বিশ্বাত্মবোধের ভিত্তি। কবি বিশ্বকে যে মুহূর্তে একটি অন্য-নিরপেক্ষ পৃথক সত্তা বলে উপলব্ধি করলেন সেই মুহূর্তেই এই মানবপ্রীতির আরম্ভ হ'ল। এর পূর্বে অর্থাৎ মানসী এবং কড়ি ও কোমলে মানুষের সুখদুঃখ সম্বন্ধে কবিতা আছে এবং জীবনের প্রতি কবির সাধারণ অনুরাগ আছে মাত্র এইটুকু জানা যায়। অর্থাৎ মানসীর 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'গুপ্তপ্রেম', কড়ি ও কোমলের 'কাঙালিনী' প্রভৃতি কবিতায় বাহিরের মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখের প্রতি কবির সমবেদনা মাত্র দ্রষ্টব্য, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। যে গভীর আত্মীয়তাসূত্রে কবি প্রকৃতির তথা মানবের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ('বসুন্ধরা' দ্রঃ) তার প্রকাশ মানসী এবং কড়ি ও কোমলে নেই। যদিও মানসীর 'অহল্যা' কবিতাটিতেই কবির বিশ্বাত্মবোধের ব্যাকুলতার আবির্ভাব,

তথাপি তার সঙ্গে সুগভীর মর্তপ্রীতি ও মানবপ্রীতি যুক্ত হয়েছে আরও পরে। প্রশ্ন হতে পারে—তাহ'লে কড়ি ও কোমলের মুদ্রিত প্রথম সুবিখ্যাত কবিতাটি—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। ইত্যাদি—

কবির যে প্রাণের কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে উচ্চারণ করছে তা কি মানবপ্রীতি নয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে এ মানবপ্রীতি প্রায় সর্বকবিসাধারণ বস্তু। সোনারতরী-চিত্রা-পর্যায়ের সুদৃঢ় বিশ্বাত্ম-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত অনন্যসাধারণ মানবপ্রীতি নয়। এ মানব-প্রীতির কথা যেন যে-কোনো কবিই বলতে পারতেন এবং অনেকে বলেছেনও। এই মানবানুরাগ কতকটা আমাদের সাহিত্যের Humanism বলা যায়; ধর্ম নয়, অধ্যাত্ম নয়, অলীক কল্পনাও নয়, মানুষের কথা। কবি তাঁর মন্তব্যে (রচনাবলী দ্রঃ) এমন কথা বলেন নি যে এই হ'ল কড়ি ও কোমল কাব্যের কেন্দ্রবর্তী সুর বা একমাত্র ধুয়া। কবিবন্ধু আশুতোষ চৌধুরী কাব্য প্রকাশের সময় তাঁর পছন্দমত এই কবিতাটিকে যে প্রারম্ভে স্থাপন করেছিলেন তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে মানুষের সুখদুঃখের কথা এর পুর্বের কোনো রচনার যথার্থভাবে বিষয়ীভূত হয়নি। প্রভাতসংগীতের 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি' প্রভৃতি অস্পষ্ট ভাবাবেগের উর্ধ্বে এই কাব্যেই বিষয় হিসেবে মানুষের আত্মকথা অবলম্বিত হ'ল। তা ছাড়া সমস্ত কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট উপলব্ধ হবে যে এখানে মানুষের সঙ্গে কবির আত্মিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কাব্যরচনার দ্বারা মানুষের প্রীতির মধ্যে বেঁচে থাকার অভিলাষ। মানুষ কবিকে প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করবে বা মানুষের স্নেহভালোবাসার মধ্যেই তাঁর

জীবন কাটবে এই সাধারণ অভিলাষই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতাটি সম্ভবতঃ কড়ি ও কোমলের তৃতীয় পর্যায়ের—আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্নবিহ্বলতা থেকে মুক্তির অবসরে রচিত। 'মরীচিকা' কবিতাটিতে এই অপসরণের প্রত্যক্ষ উদাহরণও রয়েছে—

এস, ছেড়ে এস, সখী, কুসুম-শয়ন!

* * *

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।

এই পর্যায়ে কবির এই শ্রান্তি ও ভোগবিরতি অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এর কারণ কি? আমাদের মনে হয় এর একটা কারণ তাঁর এ যুগের কবিমানসের দ্বৈধ। তিনি কল্পনায় অনির্দেশ্যের সন্ধানেও ধাবিত হয়েছেন, আবার কল্পনায় মর্তের মাটিতেও ফিরে এসেছেন; কর্মময় বন্ধুর জীবনকে গ্রহণ করেছেন আবার কর্মবৈরাগ্যের দিকেও আকৃষ্ট হয়েছেন (বিশেষভাবে চিত্রা ও কল্পনা দ্রঃ)। এখানেও বিশ্ববিহীন কল্পনারাজ্য ও স্বপ্নালুতা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিহত হয়েছে কিছুদিন পরেই। আর একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে কবি দেহাত্মবাদী ও ভোগবাদী নন। কামনার কলঙ্ক থেকে তিনি আর্টকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে চান। ফলতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মকেন্দ্রিকতা ও বাসনা-মলিনতা (বাহু, চুম্বন প্রভৃতি কবিতা দ্রঃ) সহজেই কবিকে শীঘ্র মুক্তি দিয়েছে। পরবর্তী মানসীর 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় এই বাসনা-উত্তরণের দিকটি পরিস্ফুট সৌন্দর্য-প্রেরণার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ এখানকার 'ক্ষুদ্র আমি', 'আত্ম অপমান' প্রভৃতি কয়েকটি

কবিতায়ই স্পষ্টভাবে বাসনাময় অহংএর জন্যে কবি আক্ষেপ করেছেন ও এর হাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন—

ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণ বাহু—আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমারে হায় অস্থিচর্মসার।'

সমসাময়িক রচনা 'রাজা ও রাণী' নাট্যকাব্যেও এই বাসনা-উত্তরণের ছবি ফুটে উঠেছে। বিক্রমের বাসনাময় আত্মকেন্দ্রিকতা তিরস্কৃত হ'ল, ক্ষুধার অগ্নি রাজ্য গ্রাস ক'রে ক্ষুধার বস্তুকেও বিনষ্ট করলে। ইতিহাসকল্প কাহিনীর উপর ভিত্তি ক'রে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম, সরোজিনী প্রভৃতি নাটকের আঙ্গিকের অনুসরণে এই নাট্যকাব্যখানি রচিত হ'লেও কবির অজ্ঞাতসারেই এই সময়কার বাসনা-বিমুখী মনোভাব এতে বাস্তব আকারে প্রকাশ লাভ করেছে। 'বিসর্জন' নাটকেও অহংএর উগ্রতার উপর যে প্রেম জয়ী হ'ল তাতে এই বিশেষ ভাবই ভিন্ন আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিসর্জনের মূল রাজর্ষি উপন্যাসে এবং কতক পরিমাণে বৌঠাকুরাণীর হাটে ঐ প্রেরণাই ভিন্নভাবে কাজ করেছে। স্বার্থময় বাসনা থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ আর্টের রাজ্যে বিচরণের এই স্পৃহা রবীন্দ্রকবিমানসের বৈশিষ্ট্য। যেমন সৌন্দর্যে তেমন প্রেমে কবি সর্বত্র এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েছেন। কালিদাসের প্রেমকাব্যের ব্যাখ্যায় কবি প্রেমসম্পর্কে একটি আদর্শমূলক স্থির ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। কতকটা এই আদর্শানুরাগের আশ্রয়েই 'রাজা ও রাণী' সংশোধিত হয়ে বহু পরে 'তপতী'র রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কড়ি ও কোমলের এই বাসনা-উত্তরণের অনুভূতির মধ্যে দুএকটি এমন কবিতা আছে যাতে মৃত্যু, জীবন ও প্রেম সম্পর্কে কবির

চিন্তাশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর মন্তব্যে বলেছেন 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।' মেজবধূ-ঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু যে কবিকে কী পরিমাণ বিচলিত করেছিল তার বিশেষ পরিচয় এ কাব্যে না পাওয়া গেলেও আভাস আছে এবং সেকথা মনে রেখেই কবি উক্তরূপ মন্তব্য করেছেন। 'চিরদিন' শীর্ষক চারটি কবিতায়, বিশেষতঃ তিন সংখ্যক কবিতায় যদিও উক্ত ভাবের প্রকাশ, তথাপি এর সঙ্গে কোথায়, বিরহ, বিরহীর পত্র, বিলাপ প্রভৃতি কবিতাগুলিও একত্র দ্রষ্টব্য। উক্ত চিরদিন শীর্ষক তৃতীয় কবিতাটিতে মায়াবাদ সম্পর্কে কবির সংশয় প্রকাশিত হয়েছে—'তাই কি? সকলি ছায়া? আসে থাকে আর মিলে যায়?' সোনার তরীতেই আমরা দেখতে পাব এই সংশয়ের নিরসন হয়েছে এবং কবি মর্তপ্রেমের ধ্রুবত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ধারণায় উপনীত হয়েছেন।

কড়ি ও কোমলের এই অস্তি-নাস্তির মধ্যে কাব্যের মূল প্রেরণারূপে যদি কিছু আমাদের রসলোকের গোচর হয় তা ঐ রোম্যান্টিক কল্পনা-বিহ্বলতা; মানসীর প্রথমের দিকের কয়েকটি কবিতার অনির্ণেয় ব্যাকুলতার মূলেও সূক্ষ্মভাবে এই রোম্যান্টিক মনোধর্মেরই অনুবর্তন রয়েছে। পরে আমরা দেখতে পাব, এই বিহ্বল ভাবব্যাকুলতাই সৌন্দর্য-প্রেরণামূলক তথা বিশ্বানুভূতিমূলক কবিতাগুলির মধ্যে উৎসারিত হয়েছে; বিশ্বের বাইরের প্রাণচঞ্চলতার উৎসরূপ একটি সর্বব্যাপী সত্তার সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতায় কবিকে অধীর করেছে, কখনো প্রবল আত্মবিলোপ-বাসনা জাগ্রত করেছে; তারপরে স্বীয় ব্যক্তিত্বের অন্তরশায়ী একটি চালকশক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিস্ময়ে বিহ্বল করেছে এবং পরিশেষে রূপলোকের অন্তরালে অবস্থিত সুদূর

অরূপের অনুসন্ধানে প্রলুব্ধ করেছে। এই অনির্বাচ্য অনির্ণেয়-স্বরূপ রোম্যান্টিক অনুভূতির একটি বিশেষ রাবীন্দ্রিক ভাব মানসী থেকেই স্বপ্রকাশ, কড়ি ও কোমলে তার সাধারণ ও আদিম রূপ 'আজি শরত-তপনে' এবং 'আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে গেছে' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় পাওয়া যায়, এবং ঐগুলিই এ কাব্যের কেন্দ্রীয় কবিতা, অপরিণত মানবপ্রীতি বা মানুষী সুখদুঃখের কবিতাগুলি নয়।

প্রতিভার উন্মেষ

'মানসী' ও 'সোনার তরী'

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলির রচনাকাল ১২৯১—৯৩; তারপর প্রায় চার বৎসরের রচনা মানসীর পর্যায়ভুক্ত। অতি বিশাল রবীন্দ্র-কাব্যের পৌর্বাপর্য বিচার ক'রে, এবং একটি নির্দিষ্ট ধারায় তাঁর প্রতিভার ক্রমপরিণাম লক্ষ্য ক'রেই মানসীতে ঐ বিশিষ্ট প্রতিভার উন্মেষ ব'লে মনে করা যায়।

কড়ি ও কোমলের পুর্বেকার রচনা অতিক্রম ক'রে কড়ি ও কোমলে এসে পৌছালে যেমন কাব্যের উত্তাপ ও আলোক অনুভব করা যায়, তেমনি কড়ি ও কোমল থেকে মানসীতে এসে একটা উদার উন্মুক্ততা ও কল্পনার অকৃত্রিম বিশালতা উপলব্ধ হয়। কড়ি ও কোমলে ভাষার মধ্যে আড়ষ্টতা আছে, ভঙ্গিতে দুর্বলতা আছে, কোথাও ছন্দোবন্ধে ত্রুটিও লক্ষণীয়, অপরপক্ষে মানসীতে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যেন আপনা থেকেই রসমূর্তি লাভ করেছে; ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে ও অশিথিল-বন্ধ রীতিনৈপুণ্যে ভাষা সাধারণ মানবীয় সুখদুঃখের বিবৃতি-ক্ষমতা-মাত্র অতিক্রম ক'রে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সামর্থ্য লাভ করেছে। উচ্ছ্বাসময়তা থেকে মুক্তি লাভ ক'রে রূপ ও রসের প্রগাঢ়ত্বের মধ্যে মানসীর কয়েকটি কবিতা যেমন অপরূপ প্রসন্নতা লাভ করেছে, কড়ি ও কোমলে তেমন দেখা যায় না। কিন্তু কড়ি ও কোমলের অপূর্ণতার পুর্তিতেই মানসীর প্রতিষ্ঠা নয়, ভিন্নত্বেই এর গৌরব। যদিচ এমন কথা মনে করা অসংগত হবে না যে কড়ি ও কোমলের উল্লিখিত দুএকটি কবিতায় দৃষ্ট রোম্যান্টিক মনোভাব মানসীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছে,

তথাপি এই বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি না করলে চলবে না যে, কড়ি ও কোমলের বিদেহী অস্পষ্ট ব্যাকুলতা এখানে বিশেষ ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে,—'airy nothing' পেয়েছে 'a local habitation and a name' তাই নামরূপের দ্বারা চিহ্নিত অভিব্যক্ত-স্বরূপ সবল রোম্যান্টিকতা মানসীকে একটি অপূর্বত্বের দ্বারা মণ্ডিত করেছে। এই অপূর্বতা মোটামুটি তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে অনুভবগম্য। প্রথমতঃ এর সৌন্দর্য্য-ব্যাকুলতা ও বাসনা-মালিন্যহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ('মেঘদূত' ও 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতা), দ্বিতীয়তঃ এর বিশ্বাত্মবোধের ব্যাকুলতা ('অহল্যার প্রতি'), তৃতীয়তঃ এর নিগূঢ় প্রকৃতি-প্রীতি।

মুখবন্ধের 'উপহার' কবিতায় ('নিভৃত এ চিত্তমাঝে, নিমেষে নিমেষে বাজে, জগতের তরঙ্গ-আঘাত' ইত্যাদি) কবি সাধারণ ভাবে কাব্য-রচনার পশ্চাতের কবিমানস সম্পর্কে একটা ধারণা ব্যক্ত করেছেন। অতিরিক্ত সৌন্দর্যস্পৃহা বা বিশ্বের জীবনস্পন্দনের লীলার সঙ্গে অন্তরাত্মার মিলনের আগ্রহ সম্পর্কে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। ব্যাখ্যার মধ্যে তা ধরা পড়ে কিনা এই কবিতাটা পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। কবি বলছেন, জগতের নানান রূপ ও ঘটনা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে মনে প্রবেশ ক'রে তাঁর মনকে ব্যাকুল ক'রে তুলছে। এই ব্যাকুলতার অভিজ্ঞতা হ'ল অসীম—যাকে নামরূপের মধ্যে ধরা যায় না। অথচ কবির কাজ হ'ল 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' অর্থাৎ কবি হৃদয়ের সহানুভূতি অর্পণ ক'রে তাকে 'বিভাবিত' ক'রে, ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন একটি আকার দিয়ে বাইরে প্রকাশ করা। এইভাবে কবির অলক্ষ্যেই তাঁর অন্তরে একটি সৌন্দর্য-প্রতিমা সৃষ্ট হতে থাকে এবং তাকে বাইরে রূপায়িত করার ব্যাকুলতা জাগতে থাকে। এই

অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা বা 'ভাবনা'কে কবি 'বিরহী' বলেছেন ('জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা')। বস্তুতপক্ষে কবিচিত্ত কর্তৃক বিভাবিত হবার আগেই তো তারা বিরহী ছিল। অন্তরে বাহিরে যখন মিলন হ'ল এবং যখন কবি তাকে রূপ দিতে পারলেন তখন 'বিরহী' সংজ্ঞার তাৎপর্য কোথায় ? এখানে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে আসলে কবি ঐ ভাবনার স্বরূপকেই বিরহী বলছেন। অর্থাৎ বহির্জগতের শব্দ-স্পর্শাদিময় অনুভূতি থেকে কবির চিত্তে একটি বিরহব্যাকুলতার উদয় হচ্ছে। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে ঐ অনির্দেশ্য সৌন্দর্য-বিরহের কথাই বলা হয়েছে—

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে।
বিরহী সে ঘুরে' ঘুরে' ব্যথাভরা কত স্বরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।

এর থেকে এমন অনুমান অসংগত হবে না যে মানসীর গোড়ার দিকের ভুলে, ভুল-ভাঙা, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, বিরহানন্দ প্রভৃতি কবিতায় যে অনির্দেশ্য বিরহ-ব্যাকুলতা প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা-ই ধীরে ধীরে একটি অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলিপ্সার রূপ পরিগ্রহ করেছে। অর্থাৎ এই অস্ফুট ব্যক্তিত্ব-বর্জিত বিরহমিলনের আক্ষেপগুলি কবির অজ্ঞাত সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাই। এগুলি পূর্বেকার কড়ি ও কোমলের 'আজি শরত-তপনে' প্রভৃতি কবিতার সগোত্র। এগুলি প্রেমের কবিতা নয়, কারণ, প্রেমের বস্তুর কোনো পরিচয়ই এগুলির মধ্যে ধরা পড়ে না। এরকম নিরাকার প্রেমনিবেদনও সাহিত্যে দেখা যায় না। আর যদিই প্রেমের কবিতা ব'লে ধ'রে নেওয়া যায় তা হ'লে স্বীকার করতে হয়, কবির মানসলোকের অধিবাসিনী অশরীরী এমন কোনো প্রিয়তমাকে

লক্ষ্য ক'রে এগুলি লেখা যার সঙ্গে বাস্তব ব্যক্তিত্বের কোনো সম্পর্কে কবি আবদ্ধ নন। অর্থাৎ এই কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত রোম্যান্টিক অনির্দেশ্যতা সম্পর্কে আমরা যেন সন্দেহাতীত হই।

এই অনির্দেশ্যতা যখন সৌন্দর্য-বিরহের রূপ পেলে তখন বিরহের তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল এবং এই অবস্থা মানসীর 'মেঘদূত' থেকে আরম্ভ ক'রে সোনার তরী ও চিত্রার কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রোম্যান্টিক ব্যাকুলতাবোধের স্বরূপ কি?

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ সুখস্বরূপ নয়, অথচ যথার্থ দুঃখের উপরেও এর প্রতিষ্ঠা নয়। বিরহে জর্জর হ'লেও কবি যেহেতু এই মনোভাবেরই পুনঃ পুনঃ আস্বাদন কামনা করেন সেইহেতু বিশেষ ধরণের আনন্দও এর সঙ্গে মিশ্রিত আছে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতের কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপের বিখ্যাত বর্ণনা স্বতই মনে পড়ে—'এই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, জীভ জ্বলে না যায় ত্যজন।' উর্বশীর প্রেরণা সম্পর্কে বর্ণনাতেও কবি এই বিষামৃত মিশ্রিত বিকার-বিশেষেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন—'ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।' তাহ'লে এই অনির্বাচ্য চেতনা কি বিস্ময়াশ্রিত অদ্ভুত রস? তাও হতে পারে না, কারণ, মানস-সুন্দরীর রূপ পরিগ্রহ ক'রে তা বহুল পরিমাণে আদিরসাশ্রিত হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-চেতনার প্রকাশে নারীরূপের স্পর্শ তাঁর স্বভাবের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নারীরূপ-বিমণ্ডিত হয়ে অপূর্বতা প্রাপ্ত হয়েছে ব'লেই এই শ্রেণীর কবিতা সাধারণ সৌন্দর্যের কবিতা থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। যদিও কবির এই কল্পনা প্রকৃতিভাবুকতার মূলেই জন্মলাভ করেছে তথাপি এখানে প্রকৃতি কোনো বিশেষ তরুলতা বা নদীপর্বত নয়, পরন্তু যেন নিসর্গের সারভূত একটি সত্তা,

কবির উপলব্ধ সৌন্দর্যসত্তা। কবির সৌন্দর্যচেতনার যেখানে প্রথম স্ফূর্তি সেখান থেকেই এর স্বরূপ আবিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক।

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধ বরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতরনীল অতিদূর গিরিমালা

* * *

ইহারা আমারে ভুলায় সতত কোথা লয়ে যায় টেনে!
মাধুরী-মদিরা পান ক'রে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না-প্রবাহ সর্বশরীরে পশে!
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবন-মোহিনী মায়া,
যৌবন-ভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।
চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা কল্পমূরতি কত,

—ইত্যাদি (সুরদাসের প্রার্থনা)

এই অংশে কবির সৌন্দর্য-প্রেরণার উৎসভূমির পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে ও বিশেষ বর্ণনা সহকারে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে এতটা আত্ম-বিশ্লেষণ আমাদের পঠিত কোনো আধুনিক কবির কাব্যে পাইনি। প্রকৃতির মাধুর্য-রস-পানে বিহ্বল কবি প্রকৃতি-জাত সৌন্দর্যের কল্প-মূর্তির আকর্ষণে অধীর হয়ে এই তৃষ্ণা নিবারণ করতে নারীরূপকে আশ্রয় করেছিলেন। প্রকৃতি থেকে মানবদেহে আশ্রিত হতেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-কামনা কলঙ্কিত হয়ে পড়ল, তার আক্ষেপই সুরদাসের প্রার্থনার বিষয়।

দেখা যাচ্ছে, আদিরসের আলম্বন থেকে সৌন্দর্যবোধকে বিচ্ছিন্ন

না ক'রেও কবি 'আদি'র বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান। সুতরাং বোঝা যায়, ঐ সৌন্দর্যবোধ যথার্থ রসরূপ প্রাপ্ত হয়েছে বলেই তা রতি বা বিস্ময় বা অন্য যে কোনো স্থায়ী ভাবের স্পর্শ থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে। অর্থাৎ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীনেরা রসোপলব্ধির অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন নির্বিশেষ আনন্দ-চৈতন্যে মানসের স্থিতি, তা কবির এই সৌন্দর্যবোধ থেকে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু কেবল রসের স্বরূপ অবগত হ'লেই কবির বর্তমান রোম্যান্টিক পর্যাকুল অবস্থার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ এ অনুভূতির ব্যাখ্যায় আমাদের ভাষা আযোগ্য। ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের কবিদের রচনায় এই ধরণের কল্পনামূলকতার প্রাথমিক সহজ অভিব্যক্তি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। বৈষ্ণব-পদসাহিত্যকে কাব্যের দিক থেকে অবশ্যই রোম্যান্টিক বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যকে আমরা মোটামুটি সাংকেতিকতাশূন্য চিত্রধর্মী প্রাচীন কাব্য বলেই জানি। কিন্তু সংস্কৃতে এমন বহু শ্লোক রয়েছে যার মধ্যে ঠিক এই অনির্বচনীয় রোম্যান্টিক মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। মহাকবি কালিদাস একজন শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক মনোভাবেরও কবি ছিলেন। 'মেঘদূত' তার অন্যতম প্রমাণ। এই ব্যাকুলতার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে কালিদাস পর্যাকুলত্ব, উৎকণ্ঠা (প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যপবনানি মনাংসি পুংসাম্—ঋতুসংহার), পর্যুৎসুকীভাব (রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ—অভিজ্ঞান-শকুন্তল), চিত্তের অন্যথাবৃত্তি (মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ—মেঘদূত), বিকার, উৎসুকত্ব, স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু ইত্যাদিরূপে বিবৃত করেছেন। কবি ভবভূতি প্রিয়াস্পর্শজাত বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক হর্ষের স্বরূপ অপূর্বভাবে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন—

বিনিশ্চেতুং ন শক্যো সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোদো মোহো বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

অর্থাৎ 'আমি নির্ণয় করতে পারছি না—এ সুখ না এ দুঃখ, আনন্দের পরিপাকাবস্থা না মোহ,—বিষক্রিয়া না মদবিকার! যতই তোমার স্পর্শ পাই ততই আমার ইন্দ্রিয়গুলি অবশ হয়ে পড়ে—কী এক বিকার চৈতন্যকে বিক্ষিপ্ত করে—কখনও বা বিমূঢ়তা থেকে অকস্মাৎ প্রবুদ্ধ করে।'

অপর একটি অজ্ঞাত কবির বহুশ্রুত 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ' প্রভৃতি শ্লোকটিতে সুখিনী কোনো নারীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্ভূত রোম্যান্টিক চিত্তবিকার বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে এই মনোভাবের বর্ণনায় বলেছেন—

"ভাবুক লোক মাত্রই অনুভব করিয়াছেন আমরা মাঝে মাঝে একপ্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে দূর হইতে সংগীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সংগীত, বসন্তবায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কি কারণে?"

(বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা—অচলিত সংগ্রহ, ১ম)

কবি এই সম্মোহাবস্থার বর্ণনা তাঁর নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিভিন্ন অনুভাবের ও সঞ্চারিভাবের আশ্রয়ে দিয়েছেন—

এই যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে ? এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে ?

(মানস-সুন্দরী)

সব কথা গেছি ভুলে ;
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার

(মানস-সুন্দরী)

বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
'কোথা আছ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি।'

(নিরুদ্দেশ যাত্রা)

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,

(অন্তর্যামী)

তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায় চিত্ত মাতিয়া উঠে,
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ মৃত্যুর মুখে ছুটে।

(অন্তর্যামী)

কবির একালের কবিতা থেকে এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রোম্যান্‌টিক বেদনা-ব্যাকুলতার স্বরূপ অবগত হ'লে এর বিচিত্র প্রকাশ ও পরিণাম সহজেই উপলব্ধ হবে।

দেহকে ত্যাগ ক'রে দেহাতীতে এই সৌন্দর্য-রসের প্রতিষ্ঠা ব'লে অতি স্বাভাবিক ভাবেই 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় সুরদাস-কাহিনীর রূপকে কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্যে কবির ব্যগ্রতা লক্ষ্য করা যায়। কবি ইন্দ্রিয়াতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনায় সমাহিত হবেন এই আশা নিয়ে কবিতাটি শেষ করেছেন—

হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি?
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়।

সৌন্দর্য-রস আস্বাদনে যে-কামনাহীনতা সুরদাসের প্রার্থনায়, তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়, প্রেয়সীর রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধানে। সেখানেও কবি দেহকামনাযুক্ত অবস্থায় দেহাতীতকে পান নি।

খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো তোমায়,
সে কোথায়?

এই কামনাহীনতা মানসীর মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে তার প্রমাণ, আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতায় কবি এই ভাব ব্যক্ত করেছেন—

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

(নিষ্ফল প্রয়াস)

নাই, নাই—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।

(হৃদয়ের ধন)

এই কামগন্ধহীন সৌন্দর্যের প্রতি স্থির আকর্ষণ কবির সৌন্দর্য-সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সোনার তরীর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের দুর্নিবার আকর্ষণের মধ্যে এই দিকটি অপরিস্ফুট থাকলেও চিত্রায় যখনই ব্যাকুলতা স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং পূর্ণতা ও প্রশান্তি এসেছে তখনই আবার নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি কবির পরিণত আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। উর্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতার রসবিচারে আমরা এই আকর্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব।

সৌন্দর্য-প্রেরণার মধ্যে যে একটি নিরুদ্দেশ আকর্ষণের প্রবলতা আছে তা সুরদাসের প্রার্থনায় তেমন পরিস্ফুট হয়নি। উপরে উদ্ধৃত 'ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা লয়ে যায় টেনে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির মধ্যে আভাসে ঐ সুর ব্যক্ত হয়েছে মাত্র, কিন্তু মানসীর মেঘদূত কবিতায় এর প্রবলতা এবং সোনার তরী ও নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় এই ব্যাকুলতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। মেঘদূত কবিতার উপসংহারের তীব্র আর্তিই এই কবিতার মর্মকথা, যদিও এই বিলাপের আধাররূপে বিখ্যাত সংস্কৃত খণ্ডকাব্যটি বিদ্যমান। আধুনিক কবি কালিদাসের কাব্যটি থেকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও এবং ঐ প্রেরণার অবলম্বনরূপে কবিহৃদয়ে প্রকৃতির একটি বিশেষ স্বকীয় রূপ ক্রিয়া করেছে এরূপ মনে করা গেলেও, মেঘদূত যে প্রবলতম উদ্দীপনের কাজ করেছে তা

নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলছেন—

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক

কালিদাস যা বিশেষরূপে ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা-ই নির্বিশেষ-ভাবে গ্রহণ করলেন। কে জানে, কালিদাসের হৃদয়েও যক্ষ-যক্ষপত্নী ও অলকার ঊর্ধ্বে একটি আকার-প্রকারহীন নির্বিশেষ বিরহ-চেতনা বিদ্যমান ছিল কিনা। মেঘদূত কবিতায় বিপ্রলম্ভের আলম্বনরূপে একটি নারীমূর্তি বিরাজ করছে। যেমন,—

মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।

উপসংহারের কবির আর্তির সঙ্গে Mathew Arnold এর একটি ছোট কবিতার* ভাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কবি স্বয়ং মেঘদূত নামক গদ্যরচনায় অকারণ বিরহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং ঐ কবি সম্পর্কে উল্লেখও করেছেন। মেঘদূত কবিতার অকারণবিরহমূলক উপসংহারের পঙ্‌ক্তিগুলি এই—

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান—
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ।
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,

* To Marguerite.

এরই ব্যাখ্যায় 'মেঘদূত' গদ্যরচনায় লিখলেন—

> "মনে পড়িতেছে কোনো ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।"

উপরে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে যে সুগভীর বেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে তা একালের সৌন্দর্যপ্রেরণামূলক সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যেই সুলভ। সোনার তরীতে এক অপরিচিত বিদেশিনী এসে কবির সৌন্দর্য-বাসনা জাগরিত ক'রে কবিকে তীব্র বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে গেলেন। কবি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন মাত্র, তাঁর সঙ্গে সশরীরে মিলন ঘটল না। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী' প্রভৃতিতে এই তীব্র কাল্পনিক সৌন্দর্য-বিরহই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। "আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।" নিরুদ্দেশ-যাত্রায় কবি যদিচ এক তরণীতে বিদেশিনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন, এই চঞ্চলগামিনীর সঙ্গে নিজ ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ মিলন ঘটাতে পারলেন না, কারণ তা অসম্ভব। বিরহই এর প্রকৃতি, বিরহেই এই কল্পনার স্থিতি। নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষেও তীব্রবিরহজনিত আক্ষেপ প্রকাশলাভ করেছে—

> বিকলহৃদয় বিবশশরীর
> ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
> কোথা আছ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি।
> কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।

মানসীর সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা থেকে সোনার তরীর নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-প্রেরণায় উত্তরণের অবস্থায় লেখা মানসী কাব্যের শেষাংশে মুদ্রিত 'বিদায়' এবং 'সন্ধ্যায়' কবিতা দুটি অবশ্য স্মরণীয়। নিরুদ্দেশ যাত্রার বাসনার প্রকৃতি এদের মধ্যেও রয়েছে, এমন কি ভাষা ও প্রকাশ-রীতিতেও নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে এই কবিতা দুটির সাম্য লক্ষণীয়। এই সময়ে কবিকে লেখা একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মানসী কাব্যের মধ্যে 'একটা প্রবল despair ও resignationএর ভাব দেখেছিলেন' ব'লে কবি জানিয়েছেন (চিঠিপত্র, ৫)।

যাই হোক, নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-সম্পর্কিত কবিতাগুলির উপসংহারে কবির তীব্র বেদনা বিচ্ছুরিত হয়েছে। অর্থাৎ মেঘদূত কবিতার ঐ 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে' অথবা অন্য আর একটি কবিতার 'নাই, নাই,—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ'এর ভাবই 'সোনার তরী' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এবং 'নিদ্রিতা' 'সুপ্তোত্থিতা' প্রভৃতি কবিতায় সুপ্রকট। কিন্তু সৌন্দর্যপ্রেরণামূলক কবিতাগুলির মধ্যে এ ছাড়া অন্যবিধ মিলও আছে যা থেকে এদের সগোত্রত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির বেদনার পশ্চাতে রয়েছে একটি ছায়াচ্ছন্ন মেঘলোকের, অথবা অস্ফুট উষার, অথবা ধূসর সন্ধ্যার আধ-আলো আধ-অন্ধকার অস্পষ্ট প্রাকৃতিক পটভূমিকা। মেঘদূতের মত সোনার তরী কবিতায়ও মেঘান্ধকার দিবসের বর্ণনা রয়েছে—

তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা।

'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতায়—

শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশিভোর

অথবা—

একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার

প্রভৃতির মধ্যে এই কুহেলিকাময় প্রকৃতির চিত্র রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটি ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছে সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার রহস্যময় প্রাকৃতিক চিত্র। 'পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে' অথবা 'আঁধার-রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা' প্রভৃতি সন্ধ্যার বর্ণনার সঙ্গে কবিহৃদয়ের হতাশ্বাস সম্পূর্ণ মিলে গেছে। মানস-সুন্দরীও কবির কাছে দেখা দিয়েছেন সন্ধ্যায় অথবা রাত্রে—

জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়
*　　　*　　　*
তখন, করুণাময়ী, দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া।

কখনো বা 'ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে' বকুলতলায় অথবা 'নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে' এঁর আবির্ভাব। কবিতাগুলির অভ্যন্তরে সব ক'টিতেই বিদেশযাত্রার ও অপরিচিতা বিদেশিনীর কথা আছে। তাছাড়া এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতে স্বর্ণবর্ণের কল্পনা রয়েছে। আমাদের মনে হয় স্বর্ণবর্ণই হ'ল এই সময়কার বিশিষ্ট সৌন্দর্য-কল্পনার

দ্যোতক কবিমানসের সংকেত। কাব্যখানির নাম সোনার তরী, ঐ নামাঙ্কিত কবিতায় ধানও সোনার। 'মানস সুন্দরী'তে—

সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা;

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়—

আঁধার-রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা

অথবা—

তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ।

'নিদ্রিতা'য়—

একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা।

'মানস-সুন্দরী' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পারস্পরিক সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; নিরুদ্দেশ যাত্রায় বিদেশিনীর সঙ্গে তরীতে যাত্রার যে কল্পনা বর্ণিত হয়েছে মানস-সুন্দরীতেও তা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী,

—ইত্যাদি

আবার, 'অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল হেরিয়া ভরসা পাই' এবং 'হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে'—উভয়ত্র একই কল্পনা। মোটের উপর সৌন্দর্য সম্পর্কিত কবিতাগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রেরণা ও কল্পনা বহন করছে যা দিয়ে অন্য কবিতা থেকে এদের অনায়াসে পৃথক

করা যায়। এই বিশিষ্ট নিরুদ্দেশ-কল্পনা চিত্রা-কাব্যে যে স্থির সৌন্দর্য-সাধনায় রূপান্তর লাভ করেছে তা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাব।

মানসীতে প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থান ক'রেই কবিকে আকৃষ্ট করেছে দেখতে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলে প্রকৃতির এই স্বরূপাবস্থান নেই। সেখানে প্রকৃতি কবির মিলনবিরহজনিত উচ্ছ্বাসের উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছে মাত্র। বাল্যকালের রচনা বনফুল ও কবিকাহিনীতে অবশ্য এক প্রকারের প্রকৃতি-প্রীতি বিদ্যমান, কিন্তু তা ওআর্ডস্‌ওআর্থ বা বিহারীলালের অনুকরণসূত্রে গঠিত। মানসীর কয়েকটি কবিতা আলোচনা করলে দেখা যায় কবির এই প্রকৃতি-প্রীতি সহসা উদিত হয়নি। এর পশ্চাতে প্রথমে একটা সংশয়বোধ ছিল। এই সংশয় সমগ্র সৃষ্টির রূপ সম্পর্কে, যেমন—

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়। (সিন্ধুতরঙ্গ)

মনে হয় সৃষ্টি যেন বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে (নিষ্ঠুর সৃষ্টি)

অন্ধ সৃষ্টিলীলার একদিকে যে-ধ্বংসের মূর্তি ফুটে উঠেছে কবিকে তা ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করলেও তিনি একমাত্র প্রকৃতি-প্রীতির বশেই এই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, এবং কিছু পরবর্তী 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় ধ্বংসের উপর প্রেমকেই মৃত্যুঞ্জয়ী সত্য ব'লে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন—

'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু ক'রে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।

*   *   *   তবু প্রেম বলে,
'সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা-অঙ্গীকার
চির-অধিকারলিপি'।

(সোনার তরী—'যেতে নাহি দিব')

মানসীর প্রকৃতি-প্রীতিই কবিকে সৃষ্টি সম্পর্কিত সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি থেকে পরিত্রাণ করেছে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'র পরের দিন লেখা 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি গভীর অনুরাগের সঙ্গেই প্রকৃতির উদার মধুর ও গম্ভীর রূপের বর্ণনা দিয়ে পরে স্বকীয় কবিমানসের একটি পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা
কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি'
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থানে
আনিতেছে জীবনলহরী।

তখনকার কবিমানসের রসাবস্থা কবি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন—

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ-বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।

শুধু জেগে ওঠে প্রেম মঙ্গল মধুর
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্র শান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ-মূরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে
মঙ্গল-আনন্দ-ধ্বনি বাজে।

বাংলা সাহিত্যে এই অনাবিল শান্তরসের বর্ণনা দ্বিতীয়রহিত।

কবির এই প্রাথমিক যুগের প্রকৃতি-প্রীতি আরো সহজ ও স্পষ্টভাবে উৎসারিত হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায়। 'শত শত প্রেম-পাশে টানিয়া হৃদয়, এ কী খেলা তোর' থেকে আরম্ভ ক'রে 'প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে, নাহি দিস্ ধরা' এবং 'যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে মহারূপরাশি ; তত বেড়ে যায় প্রেম, যত পাই ব্যথা, যত কাঁদি হাসি।' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবি তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের গোচরে এনেছেন। আদৌ যে অপরিস্ফুট প্রকৃতি একটি অনির্দেশ্য অপরিণত মনোভাবের পোষক মাত্র ছিল, বর্তমানে তা স্বরূপে অবস্থান ক'রে কবিকে মুগ্ধ ও বিহ্বল ক'রে তুলেছে। এর পর 'কুহুধ্বনি' কবিতায় পল্লীর সঙ্গে বিজড়িত এই প্রকৃতির মানব-জীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বর্ণিত হয়েছে—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি। —ইত্যাদি।

প্রকৃতি-সম্পর্কিত এই বাসনার বিকাশের মূলে কবিচিত্তের একটি বিশেষ ভাব বা দৃষ্টি প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতিতে ভয়ংকরতা ও মাধুর্য, মহান্ এবং সুন্দর পাশাপাশি থেকেই কবিকে মুগ্ধ করেছে। ঝটিকা, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ধ্বংসের অনিবার্যতায় এবং সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতির দুরধিগম্য ভীষণতায় প্রকৃতি নিষ্ঠুর হ'লেও এর লীলাময় রমণীয় রূপ—যার মধ্যে বিবিধ বর্ণের খেলা, আলোকের সমারোহ, পত্রের শ্যামলিমা ও ফুলফলের বিকাশ থেকে আরম্ভ ক'রে পশুপাখি ও মানুষের মধ্যে প্রাণের ও প্রেমের লীলা প্রকাশিত,—তাও অপূর্ব। নিষ্ঠুর জড়ত্বকে অতিক্রম ক'রে প্রাণের লীলা জয়ঘোষণা ক'রে চলেছে, এই ভাবই কবিকে ক্রমশঃ প্রকৃতির দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'সিন্ধুতরঙ্গে' কবিচিত্তের সংশয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথমটির নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে ঐ সংশয় আরো প্রকট—

> হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
> খসিয়া পড়িলি কোন নন্দনের তটতরু হতে ?
> যার লাগি সদা ভয়,
> পরশ নাহিক সয়,
> কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

এই সংশয় থেকে মুক্তির ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে উপরি-লিখিত 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায়। কবি তাঁর এই মনোভাবের সঙ্গে স্বভাবতই এ দেশের চিরন্তন মায়াবাদের তুলনা ক'রে দেখেছেন এবং দৃঢ় কণ্ঠে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে দ্বৈতের বা বহুত্বের এই ভ্রান্তিকে অতিক্রম ক'রে নয়, একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রেই তিনি বেঁচে থাকতে চান—

এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত অনন্তযামিনী।

সোনার তরীতে যখন কবির প্রকৃতি-প্রীতি সুগভীর বিশ্বাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থির মর্তপ্রীতি বা মানবানুরাগে পরিণত হয়েছে তখন কবি যে আরো স্পষ্টভাবে মায়াবাদকে অস্বীকার করলেন তা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব। এবং আরো পরবর্তী কালে রুদ্র ও সুন্দরের, ধ্বংস ও সৃষ্টির রহস্যময় লীলা-অনুভূতি কেমনভাবে তাঁর কাব্য-প্রতিভাকে পরিণামের পথে নিয়ে গেছে তখন সেই বিস্ময়কর ইতিহাস দেখব।

প্রকৃতি সম্পর্কে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি 'একমাত্র প্রকৃতির কবি' ও 'সাধারণ মানুষের কবি' ওআর্ডস্‌ওআর্থ থেকে অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র। ওআর্ডস্‌ওআর্থের প্রকৃতি-ভাবুকতা প্রকৃতির এই সমগ্রতাবোধ থেকে উদ্দীপ্ত হয়নি, ঐহিকতাবাদী য়ুরোপের অকস্মাৎ-আগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূত্রে এসেছিল ব'লে সৃষ্টির নিষ্ঠুর দিক সম্পর্কে ঐ কবি প্রায় অচেতন ছিলেন। আবার রবীন্দ্র-আবির্ভাব কালে যদিও বাঙালি সমাজে ভোগলিপ্সা, অকর্মণ্যতা, আদর্শচ্যুতি ও নীতিহীনতা সর্বত্র প্রকট হয়ে নবতম প্রকৃতি-দর্শনের আবির্ভাবের উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করেছে, তথাপি প্রকৃতি ও জীবনকে অবলম্বন ক'রে অরূপাশ্রয়ণই ঐ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির সমাধানরূপে মনীষীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল—কেবল প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ নয়। সম্ভবতঃ ভারতীয় জীবন ও সাধনার বৈশিষ্ট্যই এই জন্যে দায়ী। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোম্যান্টিক ভাবভঙ্গির যে সর্বতোমুখী পরিণাম আমরা দেখতে পাই তাতে এটুকু বোঝা যায় যে উনিশ শতকে প্রারব্ধ বিশ্বের এই নূতন মনোভাব যেন

রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতালাভের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সেইজন্যে প্রকৃতির একদেশানুবর্তী প্রীতিসম্পর্ককে অতিক্রম ক'রে সমগ্র সৃষ্টির রহস্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মর্তানুরাগ এবং রুদ্রসুন্দরের লীলারস এই কবির কল্পনার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়ীভূত হ'ল। ওআর্ডস্‌ওআর্থ প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও যে অর্থ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন তা-ই যেন অধুনা অধিকতর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গৃহীত হয়ে সুনির্দিষ্ট ও চিরন্তন সত্যের রূপ লাভ করলে।

নিসর্গ-প্রীতি সম্পর্কে বর্তমান কবিমানসের এই যে পর্যাকুল অবস্থা এ কি অপেক্ষাকৃত নিম্নতর সংবেদনাবস্থা, না এ অনির্বচনীয় আহ্লাদরূপ রসতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে? বলা বাহুল্য, প্রকৃতিগত কবিতার কাব্যমূল্য সম্পর্কে এই সংশয় উনিশ শতকের পুর্বে দেখা দিলে অর্থহীন হ'ত না, কিন্তু বর্তমানে তার অবকাশ নেই। নিসর্গ-প্রীতিরূপ স্থায়িভাব যে যথার্থভাবে রসপর্যায়ীভূত হতে পারে তা ওআর্ডস্‌ওআর্থ ও রবীন্দ্রনাথ সমানভাবে দেখিয়েছেন। 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতার পুর্বোদ্ধৃত অংশটুকুতে কবির এই রসাবস্থা যে বিবৃত হয়েছে তা পুর্বেই বলেছি। কিন্তু এই আনন্দানুভবকে যদি প্রাচীন কোন রসের পর্যায়ে ফেলতেই হয় তাহলে শান্তরসেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুর্বেকার উদ্ধৃতিতে এই রসেরই অনুভাব ও সঞ্চারীগুলি কবি বিবৃত করেছেন। নিসর্গভাবুকতার শান্তরস-পরিণামের ইঙ্গিত কবি চিত্রার 'সুখ' শীর্ষক কবিতাটিতেও দিয়েছেন—

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো,

—ইত্যাদি।

কবি ওআর্ডস্‌ওআর্থ তাঁর নিম্নলিখিত বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি কয়েকটিতে প্রকৃতি-প্রীতি সম্পর্কে স্বীয় চিত্তের সমাহিত যোগাবস্থাই বিবৃত করেছেন—

> * * * * that blessed mood,
> In which the burthen of the mystery,
> In which the heavy and the weary weight
> Of all this unintelligible world,
> Is lightened :—that serene and blessed mood,
> In which the affections gently lead us on,—
> Until, the breath of this corporeal frame
> And even the motion of our human blood
> Almost suspended, we are laid asleep
> In body, and become a living soul :
>
> (*Lines composed a few miles above Tintern Abbey*)

প্রকৃতি-প্রীতির সঙ্গে বিজড়িত বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে একটি সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় অপর কোনো সমসাময়িক বাঙালি কবির রচনায় পাওয়া যায় না। কি সৌন্দর্য-কল্পনা, কি বিশ্বাত্মবোধ সকলই রবীন্দ্রনাথের একটি সমগ্রতাবোধ থেকে উৎসারিত। রবীন্দ্র-সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথ সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির নিসর্গ-প্রীতি বা সৌন্দর্য-স্পৃহা য়ুরোপীয় কবিদের মতই বিশিষ্ট বস্তু বা ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অপরপক্ষে এই সমগ্র দৃষ্টি থাকার ফলে নিসর্গ-প্রীতি থেকে বিশিষ্ট বিশ্বাত্মবোধ এবং অরূপের দ্বৈতলীলার অনুভবে রবীন্দ্র-কবিমানসের উৎক্রান্তি অতি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে।

মানসী কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবির বিশ্বাত্মবোধের বাসনা প্রথম প্রকাশিত হ'ল। তারপর সোনার তরী কাব্যের

'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা'য় এই বাসনা সম্যক পরিস্ফুট হয়ে অন্যকবিদুর্লভ সুগভীর মর্তপ্রীতির জন্ম দিয়েছে। এই বোধের স্বরূপ হ'ল প্রবল কল্পনাশক্তির বশে নিখিলের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে কবি-আত্মার নিগূঢ় যোগ স্থাপন করা। এর ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্বকীয়। এই বিশিষ্ট কল্পনা যে কবিতাগুলিতে প্রকাশলাভ করেছে তাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা অবশ্য স্মরণীয়। প্রথম, এগুলির মধ্যে মর্তকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং বিশ্বাতিরিক্ত অন্য কোনো সত্তা বর্তমানে স্বীকার করা হয়নি—যার সঙ্গে কবি কল্পিত মিলন কামনা করবেন। দ্বিতীয়, পূর্বোক্ত প্রকৃতি-প্রীতির ব্যাকুলতাই বিশ্বকে সমগ্রভাবে আত্মস্থ করার ব্যাকুলতা এনে দিয়েছে। তৃতীয়, এই ব্যাকুলতার ফলে পৃথিবী ও মানুষকে নির্বিচারে ভালোবাসার প্রেরণা কবির চিত্তে জেগেছে। চতুর্থ, ঐ ব্যাকুলতা অভিনব এবং বিশুদ্ধ কবিকল্পলোকের বস্তু,—দ্বৈত বা অদ্বৈত, পুরাণ বা উপনিষদে কথিত প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বের মধ্যস্থতায় কবি বিশ্বকে গ্রহণ করছেন না, এ বাসনা কবিহৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত, অহেতুক অর্থাৎ রোম্যান্‌টিক।

পাষাণী অহল্যার মধ্যস্থতায় কবি প্রথম এই ব্যাকুলতার স্বাদ অনুভব করলেন, এবং যে-কল্পিত গোপন প্রাণকেন্দ্র থেকে জীবনরসধারা নির্গত হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিত করার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন,—

> জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
> মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত,
> অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
> সুপ্ত আত্মা-মাঝে? * * *
> মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটি-জীবস্পর্শ সুখ,
> কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে?

পৃথিবীকে জীবন্ত মাতৃসত্তারূপে কবি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। কবিতাটির শেষে কবি সদ্যঃচেতনপ্রাপ্ত অহল্যার যে বিস্ময়ের বর্ণনা দিচ্ছেন সে বিস্ময় ব্যাকুল কবিচিত্তেরই, অহল্যার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে মাত্র,—

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চিরপরিচয় মাঝে নব পরিচয়।

ঐ বিস্ময়ের বশে কবি পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যুগযুগান্তরব্যাপী অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন অনুভব করেন। এই অত্যদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব সংগীত তিনি আমাদের শোনালেন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়,—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে,
যখন বিলীনভাবে ছিনু এই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ঐ তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।

কবির এই ব্যাকুলতা যে অকারণ-সঞ্জাত, অনির্ণেয়স্বরূপ, সুদূরগামী এবং জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা তা পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়—

সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ—
* * * * অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত

পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি এই সুদূরের প্রতি আকর্ষণরূপ রোম্যান্টিক মনোভাবের বিশ্লেষণ করছেন—

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্মরস্বর। মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে ; মনে তার দিয়াছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

স্বীয় রোম্যান্‌টিক মনোভাবের স্বরূপের এই যে ব্যাখ্যা কবি করলেন, তা যখন পুনরায় বসুন্ধরা কবিতার মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করছেন, অর্থাৎ বসুন্ধরার তাবৎ বস্তুর সঙ্গে একাত্মতার আগ্রহে অধীর হচ্ছেন, তখন কবির এই মনোভাবের অন্যনিরপেক্ষ বিকাশ সম্পর্কে আর আমাদের সংশয় থাকে না। এই আগ্রহ ও ব্যাকুলতা অনন্য-সাধারণ, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই প্রাপ্তব্য, এবং তাঁর রচনা থেকেই তাঁকে বুঝতে হবে, অন্য কোনো উপায় নেই।

মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে হ'লেও কবির কল্পনায় সে পৃথিবীর অনাত্মীয়। অথচ তৃণতরুলতা বা ইতর প্রাণী মাটির কাছাকাছি আছে ব'লেই যেন তারা ধরিত্রীর আত্মীয়। বহুজন্ম পূর্বে কবি যেন তৃণতরু-লতারূপে এমন কি বা অপ্রাণরূপেও সকলের সঙ্গে তথা পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। মানুষ-জীবন লাভের পর সেই আত্মীয়তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কবির এই অভিনব কল্পনা—বসুন্ধরার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অতি প্রবল আগ্রহ এবং অন্যথায় আক্ষেপ—বসুন্ধরা কবিতাটির বিষয়বস্তু।

বিজ্ঞান-আশ্রয়ী যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে কবির এই

একাত্মতা-তত্ত্বের বাইরের দিক থেকে একটা মিল দেখা গেলেও অমিল গুরুতর। কারণ, সংগ্রাম, বিরোধ এবং আত্মকেন্দ্রিকতা-মূলক জীবধর্ম ঐ অভিব্যক্তির মূলে। কিন্তু কবির অভিপ্রেত মহা-আত্মীয়তাবন্ধন অনুভব নিশ্চয়ই সর্ববিধ জৈব-সম্পর্কমুক্ত স্বার্থলেশহীন আত্মবিলোপময় মিলনের বা পশ্চাতে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ, অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা নয়। যাই হোক, কবির এ মনোভাব কোনো তত্ত্বের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। এ আশ্চর্য কবিকল্পনা মাত্র।

বসুন্ধরা কবিতায় দেখা যায়, জন্মজন্মান্তরের সংস্পর্শ-ক্রমে আগত সৌন্দর্যের বাসনা প্রবল বিরহভাবে ও মিলনের আগ্রহে কবিকে অস্থির ক'রে তুলেছে। "যেন কার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে" (মেঘদূত)। তাই কবি কোনো সংশয়ের অবকাশ না রেখেই ব'লে উঠলেন—

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,

তারপর কবি বসুন্ধরার বহুবিচিত্র প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার যে-বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে-বিরহবিলাপে সমস্ত কবিতা মুখরিত করেছেন এখানে ভাষায় তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। শুধু ঐ রোম্যান্টিক বিরহের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র উদ্ধার করছি—

তাই আজি কোনোদিন শরৎকিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র-'পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—

মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের নানাবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব।

কবির এই বাসনা যে জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্য-ক্রমে আগত স্থির রোম্যান্টিক বাসনা এ সম্পর্কে আর সংশয় নেই। অথচ এই এক বাসনার দুই বিভিন্ন প্রকাশ তাঁর এই সময়কার কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা—নিরুদ্দেশ সুদূরশায়ী এবং বস্তুর অতীত কোনো সৌন্দর্যসত্তার প্রতি আকর্ষণ, আর একটি বসুন্ধরার তাবৎ প্রাণের প্রকাশের প্রতি আকর্ষণ। একটি সৌন্দর্য-বিরহ, অপরটি নিসর্গ-বিরহ, উভয়ই কল্পনামূলক। নিসর্গ থেকে সৌন্দর্যস্পৃহা আবার নিসর্গ থেকেই বিশ্বাত্মবোধের বাসনা—মূলতঃ এই এক রোম্যান্টিক ভাবপ্রবাহ কবির এ-যুগের সমস্ত কবিতা পরিব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান।

পদ্মাতীরে সোনার তরীর অধিকাংশ কবিতা যখন রচিত হচ্ছিল সেই সময়কার অতি নিগূঢ় প্রকৃতি-প্রীতির বা প্রকৃতি-আত্মীয়তার পরিচয় ছিন্নপত্রে গদ্যেও বর্ণিত আছে। কবির এই যুগের মর্তপ্রীতির তুলনা নেই। ধরণীর ধূলি, তৃণ, তরুলতা থেকে মানুষ পর্যন্ত অনমুভূতপূর্ব আত্মীয়তার বন্ধনে কবির সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছে। বসুন্ধরা কবিতার

উপসংহারেই কবির মর্ত-উপলব্ধি সুগভীর মর্তপ্রীতিতে পরিণত হয়েছে দেখা যায়—

আজ শতবর্ষ-পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরান? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রবনা আমি। * * *
* * * ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,—
যুগযুগান্তের মহামৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে। করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি? —ইত্যাদি।

আমরা পুর্বেই নির্দেশ করেছি, সাহিত্যে এতাবৎ অদৃষ্ট এই বিস্ময়কর বিশ্বাত্মবোধের ব্যাকুলতার উৎসমূলে কোনো দার্শনিক ধারণা প্রচ্ছন্ন নেই। এ কবির স্বত-উৎসারিত সুপরিণত রোম্যান্টিক হৃদয়ের আত্মসর্বস্ব ভাবব্যাকুলতা মাত্র। কবি-আত্মার এই অদ্ভুত স্বতঃপ্রসারের দিকটি সম্পর্কে অবহিত না হ'লে অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির প্রভাব অনুমান করা বিচিত্র নয়। কবির নামতঃ ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি ঐ রকম অনুমানের পোষকতাও করতে পারে। বস্তুতঃ কবির এই নিগূঢ় বিশ্বাত্মবোধ থেকে আমরা মননের দ্বারা অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হতে পারি বটে, কিন্তু ঐ তত্ত্বকে কবির অনুভূতির পুর্বে স্থাপনের কোনো যৌক্তিকতা নেই। উপনিষদের কোনো বাণী, যেমন, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, এর মূলে রয়েছে এমন কল্পনা করলে কবির এই অপূর্ব কাব্যে, উপলব্ধির আন্তরিকতায় সন্দেহ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মত

অভূতপূর্ব সূক্ষ্ম-অনুভূতিপ্রবণ কবিমানসের বিচারে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব আরোপ করা একান্তই অসমীচীন। কবি তাঁর স্বকীয় উপলব্ধির সূত্রে যে-আত্মিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তার সম্যক এবং সঠিক অনুধাবনের দ্বারাই তাঁকে বুঝতে হবে। মোটামুটি চিত্রার রচনাকাল বা বিকাশের প্রথম পর্ব পর্যন্ত উপরিলিখিত সর্বতোমুখী রোম্যান্টিক অনুভূতির বিকাশের কাল। চিত্রায় এই বিভিন্নমুখী রোম্যান্টিক প্রবণতা পূর্ণতা লাভ করলে পর ঐ মূল রোম্যান্টিক ভাব-প্রবণতার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য—মূলতঃ কালিদাস, তার পরে উপনিষদ, এবং আরো পরে অরূপানুভূতির পূর্ণতা সাধিত হ'লে, বাউলদের প্রেম-সাধনার সার বস্তু ও চলার সুর মিলিত হয়ে এই কবি-প্রতিভাকে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে গেছে। প্রভাব বা বহিঃস্পর্শ বলতে রবীন্দ্রনাথে যদি কিছু থাকে তা একালেই, এবং তার পরিমাণও ঐ কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অবশ্য কবিমানসের বিকাশের পথে সমধর্মিত্বের সূত্রে গৃহীত ঐ বিষয়গুলিকে বাহ্য প্রভাব ব'লে অভিহিত করার সমীচীনতা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই সন্দেহ জ্ঞাপন করেছি। যাই হোক, ঐগুলির পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। আবার, কবি পরিণামে যেখানে উপনীত হয়েছেন সেখানে তাঁর স্বকীয় উপলব্ধির সঙ্গে কোনো দার্শনিক উপলব্ধির মিল থাকলেও প্রভাবের প্রশ্নই আর ওঠে না। বসুন্ধরা কবিতাটির মধ্যে তেমনি কোথাও কোথাও আধুনিক বৈজ্ঞানিক আইডিয়া পাওয়া গেলেও, তা কখনই এই কবি-স্বভাবের নিয়ামক হয় নি। জন্ম-জন্মান্তর ও নানা অবস্থা-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি যে যাত্রা ক'রে চলেছেন এই ভাবটি বিশেষভাবে গীতালি ও বলাকায় পুনরায় প্রকাশলাভ করেছে, অবশ্য সেখানে মর্তপ্রীতির সূত্রে নয়, গতি ও যাত্রার প্রেরণায়, যেমন—

অনেক কালের যাত্রা আমার অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম প্রথম-আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের অরণ্যে পর্বতে।

—ইত্যাদি।

মর্ত-উপলব্ধি সম্পর্কে যেমন, সৌন্দর্য-উপলব্ধি সম্পর্কে তেমনি, যদি বলা যায় যে, কবি উর্বশীতে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' এই আদর্শকেই মূর্তি দিয়েছেন, অথবা 'যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা' কি 'Beauty is truth, truth beauty' এই বচনকেই প্রমাণিত করেছেন তাহ'লে ঠিক বলা হয় না। সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির ধারণাও তাঁর অনন্যসুলভ স্বকীয় উপলব্ধির বিকাশের সূত্রেই জানতে হবে।

সোনার তরীতে সুগভীর মর্তপ্রীতির অভ্যুদয়ে কবি বৈদান্তিক মায়াবাদকে যে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছেন তা কয়েকটি সনেটকল্প রচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। "লক্ষকোটি জীব ল'য়ে এ বিশ্বের মেলা, তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা", "চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর, লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর", "বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে ?" প্রভৃতি কবির প্রসিদ্ধ মর্ত-জীবনানুরাগের পঙ্‌ক্তিগুলি এই সব কবিতায় প্রাপ্তব্য। এই 'দৃঢ় অনুরাগ' কবির পরবর্তী অরূপের প্রতি আগ্রহে দৃঢ়তর হয়েছে মাত্র, কারণ অসীম বা অরূপকে কবি জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রেই পূর্ণতালাভ করেছেন। আর, কবির জীবনব্যাপী কাব্য-সাধনার মূলে রয়েছে সোনার তরীর প্রতিভাস্ফুরণের মধ্যেকার এই কল্পনামূলক বিশিষ্ট মর্ত-উপলব্ধি ও সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকর্ষণ।

প্রতিভার বিকাশ

প্রথম পর্যায়

‘চিত্রা’

প্রতিভার বিকাশ বলতে চিত্রা কাব্যকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, কারণ, এই কাব্যেই পুর্বোক্ত বিভিন্নমুখী রোম্যান্‌টিক প্রবণতাগুলির পুর্ণতা দেখা গেছে এবং ভবিষ্যতের অতিমহান্ পরিণতির আভাস সূচিত হয়েছে। কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে চিত্রা হ'ল সেই উচ্চভূমি যেখানে সমস্ত পথ একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে, যেখানে উচ্চতা, পুর্ণতা ও বিরাম, এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনন্তে গিয়ে মিশেছে। চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিণতির মুখে ধাবমান।

চিত্রা কাব্যের এই পরিপুর্ণতাই চিত্রার বিশেষ লক্ষণ। এখানে দেখা যায়, কবির নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যব্যাকুলতা স্থির সৌন্দর্য-অনুধ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে, মর্ত-উপলব্ধির আগ্রহ সাধারণ মর্তপ্রীতিকে অতিক্রম ক'রে বিশেষ ও বাস্তব মানবপ্রীতির চরিতার্থতায় উপনীত হয়েছে, কাব্যের প্রকাশরীতিতে—শব্দবিন্যাসে ও বচনভঙ্গিতে বিস্ময়কর অনবদ্যতা এসেছে এবং সর্বোপরি কবি আপন সৃষ্টিক্রিয়ারত গতিশীল ব্যক্তিসত্তার অজ্ঞাত পরিণামের পথে যাত্রা অনুভব ক'রে অপরিসীম বিস্ময় বোধ করছেন।

চিত্রার সৌন্দর্য-সম্পর্কিত সব কবিতার মধ্যেই পুর্বদৃষ্ট ব্যাকুলতা এবং অধুনা উপলব্ধ স্থিরতা ও প্রশান্তি মিশ্রিত রয়েছে। ‘সুরদাসের প্রার্থনা’ কবিতায় কবি যে চঞ্চলতাময় ‘কল্পমূরতিস্রোতে’ ভেসে থাকার বেদনা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন এবং আপন অন্তরে ‘দেহহীন

জ্যোতি' রূপে সৌন্দর্যময়ীকে অনুভব করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, চিত্রায় যেন সেই বাসনারই পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এই সৌন্দর্য-প্রেরণার একদিকে চঞ্চলতার আধিক্য, আর একদিকে সমাহিত শান্তির আধিক্য—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির সম্পূর্ণ একটি উপলব্ধি গ'ড়ে উঠেছে। মুখবন্ধের চিত্রা কবিতায়—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

*   *   *

দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।

এই হ'ল এর চঞ্চল এবং তীব্রবিরহোদ্দীপক সত্তা। আবার 'একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,·········একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে' এই হ'ল ধ্যানের দ্বারা অনুভূত এর প্রশান্ত জ্যোতির্ময় রূপ। বলা চলতে পারে, প্রথমটি বহির্জগতের রূপগত বা প্রকৃতিগত ব'লে তার ঐ চাঞ্চল্য, আর দ্বিতীয়টি কবিমানসের একটি প্রজ্ঞাময় উপলব্ধি ব'লে তার ধ্রুবত্ব ও অচঞ্চলতা। 'উর্বশী' কবিতায় পূর্ণসৌন্দর্য-উপলব্ধির মুখে এই দুই রূপের সমন্বয় ঘটেছে ; ব্যাকুলতা এবং বিরহ কম নয়, আবার ধ্যানময় স্থিরত্বেরও পরিচয় সেখানে রয়েছে। 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বামকরে' অংশের মধ্যে সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির উপলব্ধ দুইরূপের সামঞ্জস্য কল্পনা করা হয়েছে। 'বিষ' অর্থে কবিচিত্তকে বিরহ-জর্জর করার প্রকৃতি এবং 'সুধা' অর্থে ব্যাকুলতা-মুক্তির এবং প্রশান্ত তৃপ্তির ব্যঞ্জনা অনুভব করা যায়। সৌন্দর্য-কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত তীব্র বিরহ বা বেদনার ভাব 'সোনার তরী'র মত চিত্রার 'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতাতেও সুলভ, যেমন,—

আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তরমন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত-যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা।

এবং-

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর—
*   *   *   *
খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহো একবার
সৌন্দর্যসভায়।

এই পঙ্‌ক্তিগুলি কবির অপ্রাকৃত সৌন্দর্যবিরহের তীব্রতার পরিচয় দিচ্ছে, এবং প্রকৃতির শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অনুভূতি থেকেই যে এ সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার উদ্ভব তাও পরিস্ফুট করছে। কবিতাটির শেষে 'বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা' প্রভৃতি কল্পনায় ঐ সৌন্দর্য-ব্যাকুলতারই মনঃকল্পিত রসমূর্তি কবি প্রত্যক্ষ করছেন।

কবির সৌন্দর্য সম্পর্কিত অনুভূতির উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতঃ চিত্রার এই পরিবর্তন এবং পরিণতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানসীর অনির্দেশ্য নিরুদ্দেশ ব্যাকুলতা কেমন ক'রে একদিকে প্রকৃতি ও

মর্ত-বিরহ এবং আর একদিকে সৌন্দর্য-বিরহের জন্ম দিয়েছে, এবং তার পর অনুভূতির মাধ্যমে আগত মানসিক-আবেগযুক্ত চঞ্চল সৌন্দর্য-বিহ্বলতার উপর ধ্যানজ জ্যোতির্ময়ী মূর্তির কী রূপে আলোকপাত ঘটেছে তা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। এই বিবর্তনধারায় আগত কবির সৌন্দর্যনিষ্ঠা কবির রচনাতেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবির ঐ উদ্যোগ এবং এই পরিণতি সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচারে স্বতন্ত্রতা ও অসামান্যতার দাবী রাখে। তার যথাযথ ও বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র সমাধা ক'রে অন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

চিত্রার দুটি কবিতা—'চিত্রা' এবং 'উর্বশী'—কবির সৌন্দর্য-প্রেরণার অভ্যন্তরে আমাদের নিয়ে যায়। 'চিত্রা' কবিতার দুটি বিভাগ। প্রথমাংশে পঞ্চভূতাত্মক জগতের শব্দস্পর্শাদির অনুভূতিকে কবি সৌন্দর্যের অলক্ষ্য সঞ্চরণ বলে বোধ করছেন। 'অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে' ইত্যাদির মধ্যে কবির রূপের অনুভূতি, 'মুখর নূপুর' ইত্যাদির মধ্যে ধ্বনির, 'অলকগন্ধ' ইত্যাদির মধ্যে গন্ধের অনুভূতি বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'জ্যোৎস্নারাত্রে' কবিতার পূর্বে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির পুনরনুসণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করা যেতে পারে—

> তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
> বসে আছি,—কানে আসিতেছে বারে বারে
> মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
> রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর ;
> কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
> পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
> চেতনাপ্রবাহ। কোথায় গাহিছ গান।

তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণকনকপাত্রে স্নগন্ধি অমৃত
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত
পারিজাত—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে, উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব বিরহে।

এই অংশে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সব ক'টিরই বর্ণনা আছে। মোটের উপর বোঝা যায় যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে যুক্তভাবেই এই সৌন্দর্যবোধের প্রতিষ্ঠা। স্নতরাং এই সৌন্দর্যের বিচিত্ররূপবত্তা, এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রকৃতি অস্থির ব'লে এর চঞ্চলগামিত্ব। কিন্তু কবি এই সৌন্দর্যকেই 'কত-যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত' ইত্যাদি বর্ণনায় বিশ্বের যাবতীয় কাব্য, সংগীত ও শিল্পের বিষয়ীভূত করলেন কেন? কবি কি মনে করেন, অনুভূতিগত যাবতীয় স্নষ্টি সবই সৌন্দর্যের স্নষ্টি?

চিত্রার একদিকে সৌন্দর্যের এই ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিময়তা, আর একদিকে অন্তরের মধ্যে স্থির সৌন্দর্য-ধ্যানের আদর্শ,—যা দেশকালের অতীত এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত। এই আদর্শের বোধে কোথাও বিরহ নেই, ব্যাকুলতা নেই, ক্ষিপ্ত আকর্ষণে দুর্নিবার বেগে বিশ্বভ্রমণ করার আগ্রহ নেই,—'অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি'। কবির বর্ণনায় মনে হয়, মনোলোকেরও ঊর্ধ্বে প্রজ্ঞাময় আনন্দলোকেই এ বোধের স্থিতি। কবির আত্মসাক্ষাৎকাররূপ রসময়তাতেই এ প্রতিষ্ঠিত। দেশ, কাল এবং বস্তুর বাস্তবতার অতিরিক্ত একটি বোধরূপে এই সৌন্দর্যের উপলব্ধি কবিকে স্পষ্টতই আত্মনিষ্ঠ প্রজ্ঞাবাদী দার্শনিকদের পর্যায়ভুক্ত করেছে।

সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে সৌন্দর্যের মধ্যে একটি পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য

করেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্য কেবল বহিরিন্দ্রিয়গত শ্রবণনয়নাদির মোহকর পদার্থ নয়, অন্তরের বিশেষ সত্যোপলব্ধি। কাব্য বা সাহিত্য আর কিছুই নয়, সৌন্দর্যের রসমূর্তি বা সত্যমূর্তি মাত্র। কবি এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি কীটসের Beauty is truth, truth beauty' বচন প্রায়শই উদ্ধার করেছেন। কিন্তু truth বলতে আত্ম-আনন্দের অতিরিক্ত নিখিলের মধ্যবর্তী বিশ্বজনীন metaphysical কোন তত্ত্ব তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি অনুমান করেছেন যে বহির্জগতেও যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে একের অস্তিত্ব তেমনি মানুষের মনেও। এই দুই একের মিলনতত্ত্বই হ'ল সাহিত্যতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব। অনুমান করা যেতে পারে অন্তরে কবি যাকে সৌন্দর্যের আদর্শ বলছেন তাকেই পরে পুর্ণতার বা ঐক্যের আদর্শ ব'লে অভিহিত করেছেন, কারণ কবির মতে সৌন্দর্য হ'ল সুষমা বা একের Ideaর বিকাশ মাত্র। ঐ অন্তরগত ঐক্যের ধারণাতেই আমরা বাহ্যবস্তুকে সুন্দর দেখি। এই অংশে কবির উপলব্ধির সঙ্গে ক্রোচের সৌন্দর্য-দর্শনের মিল দেখা যায়। 'সাহিত্যের পথে' নামক আলোচনা-পুস্তকে কবি বলছেন—

"লোকে বলে সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে কথা বিচার ক'রে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্যরহস্যকে বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্টস্‌কে অধিকার ক'রে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি, বোঁটা; তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই সমস্ত নিয়ে বিরাজ করে এই সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্বোধিত করে তাকেই যে আমার

অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তিপুরুষ।·· ···গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে নির্দেশ ক'রে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।"

এখানে, বস্তুজ্ঞানের অতিরিক্ত আমাদের অন্তরের সৌন্দর্যসত্তা বা অন্তরতম ঐক্যবোধই যে গোলাপের মধ্যে সুষমা আবিষ্কার করে, সেই কথা কবি অপরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করলেন মাত্র। আত্মভাবনিষ্ঠ কবি কিন্তু অন্যত্র স্পষ্টভাবেই বলেছেন, আমাদের অভিজ্ঞতার বা বোধের বাইরে যদি কোনো ঐক্যরূপ সত্য থাকে, তা'হলেও আমাদের ঐ বোধ যতক্ষণ না স্বীকার করে ততক্ষণ বাইরের ঐক্যের রূপও তুর্নিরীক্ষ্য হয়। কবির ঐক্যবোধের অন্তরগত স্থিতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি থেকে আরো নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। "কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম ক'রে সে আমার কাছে এমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে।" বলা বাহুল্য, কোনো শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে সৌন্দর্যের স্থিতি আধুনিক দৃষ্টিতে অযথার্থ ব'লে পরিগণিত। কবিও প্রাচীন মতের পোষকতা করেন না, কোনো কাল-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষের তিনি উপাসক নন। সেইহেতু, স্রষ্টার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধের উপরেই জোর দিয়ে তিনি নিম্নলিখিতরূপ উক্তি করেছেন—

"এতদিন নিশ্চিত স্থির ক'রে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতা মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে

প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না। তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো ক'রে বলেছিলুম তাই সোজা ক'রে বলার দরকার। বললুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"

অর্থাৎ বাহ্য সৌন্দর্যবোধ অপর একটা স্থির সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণার বশীভূত হয়ে পড়ল। একে রসবোধও বলা চলতে পারে। অন্যত্র কবি সৌন্দর্য ও সত্যকে এক ক'রে দেখার প্রসঙ্গে বলছেন—"আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি, কোনো না কোনো ঐক্যসূত্রে জানি, এবং যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তা-ই সুন্দর।"

উপরে উদ্ধৃত কবির পরিণত বয়সের উক্তি থেকে এই ধারণায় আসা গেল যে কবির মতে সৌন্দর্য এবং সাহিত্য এক হ'লেও ঐ সুন্দর অন্তরগত একটি নিবিড় ঐক্যবোধের প্রেরণাতেই সত্যরূপ লাভ করে। 'চিত্রা' কবিতার এই নামতঃ-দ্বিতীয় সৌন্দর্য-প্রেরণায় ঐ নিগূঢ় সৌন্দর্য-বোধ বা সত্যবোধের স্বকীয় প্রকাশময় উপলব্ধির কথাই বলা হয়েছে। কবি প্রথমটি থেকে আত্মবিচারণায় দ্বিতীয়টিতে এসে উপনীত হয়েছেন সত্য, কিন্তু মূলতঃ উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নেই, একটি অপরটির সঙ্গে একত্র অবস্থান করতে পারে। অর্থাৎ কবিচিত্তের একটি স্থায়ী সৌন্দর্যবোধই কবিকে উভয় ধারণায় অনুপ্রাণিত করেছে এমন কথা অযৌক্তিক হবে না। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রেরণাও কবির বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা, আর সৌন্দর্যের ধ্যানমূর্তিও তারই সৃষ্টি। উর্বশী কবিতায় এই দুয়ের মিলন ঘটেছে দেখতে পাব। একদিকে কামনাহীন, নিরঞ্জন সৌন্দর্যসত্তার অচঞ্চল প্রেরণা, অপরদিকে ঐ

সৌন্দর্যেরই নিরুদ্দেশ মূর্তির বিরহবিষক্রিয়া কবি চিত্তে বাসনার উদ্রেক করেছে। ইংরেজির অদ্বিতীয় সৌন্দর্যের কবি কীট্‌স্‌ এর এই সৌন্দর্য-বেদনায় বিশ্বপরিভ্রমণ ছিল না। একটি স্থির প্রশান্ত সৌন্দর্যের ধ্যান-মূর্তিকে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন ক'রে তার জ্যোতির্ময় আলোকে বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে সমগ্রভাবে নিরীক্ষণ করার ও তার সঙ্গে পূর্ণ আত্মিক সংযোগ স্থাপনের ব্যাকুলতাও ছিল না। কীট্‌স্‌ বিশিষ্ট বস্তুতেই কেবল সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং একান্ত পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাঁর কেবলা সৌন্দর্যপ্রীতি যদিও দার্শনিকতার স্পর্শমুক্ত, মননশীলতার সঙ্গে অসম্পৃক্ত, এবং নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারাই উদ্বোধিত ছিল, তথাপি Beauty is truth, truth beauty—that is all ye know on earth, and all ye need to know—এইরূপ বলিষ্ঠ ভাষণের থেকে এরূপ অনুমান অসংগত নয় যে তাঁরও ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি একটি স্থির সৌন্দর্যবোধের দ্বারাই পরিচালিত ছিল। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যই যে একমাত্র সত্যবস্তু তা সৌন্দর্যরসিক রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গাতেই বলেছেন,—তুং 'স্বপ্ন শুধুই মর্তে অমর, আর সকলই বিড়ম্বনা।'

চিত্রার 'পূর্ণিমা' কবিতাটিতে এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আস্বাদনের স্পৃহা দেখা যায়। গ্রন্থের মধ্যে কবি যাকে পাননি তাকে পেলেন প্রকৃতির মধ্যে, বুদ্ধির সংস্পর্শ থেকে মুক্ত একটি বিশুদ্ধ অনুভূতিরূপে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কীট্‌সের মত একই কথা বলেছেন, যদিও দৃপ্ত গদ্যময় ভঙ্গিতে নয়—কাব্যে, উপলব্ধিতে। সৌন্দর্য যে তাত্ত্বিকতা নয় কবি তা জানালেন নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে—

এ কী মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্কচিত্ত সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে।......আমি গৃহকোণে

তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,
তোমারি সন্ধানে।

অপরপক্ষে, আর্শবাদী ভাবুক শেলির সৌন্দর্য-প্রতিমা, যাকে তিনি Intellectual Beauty আখ্যায় অভিহিত করেছেন, তা তাঁর বিশিষ্ট সমাজ, জীবন, প্রেম সম্পর্কে একটি আদর্শমূলক ধারণারই কল্পিত মূর্তি এবং সংজ্ঞা। তা কেবল-সৌন্দর্য নয়। এই কেবলা সৌন্দর্যপ্রীতিতে শেলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তথা কীট্‌স্‌এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য দৃষ্ট হ'লেও কীট্‌স্‌এর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মিল নেই। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-কল্পনার পশ্চাতের সমগ্রতাবোধ কীট্‌স্‌এর পরবর্তী স্বাভাবিক পরিণাম। এই সব কারণে আমাদের আরো মনে হয় যে উনিশ শতকের পশ্চিমের বিখ্যাত কবিগণের রোম্যান্‌টিক ভাবুকতা রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা লাভের জন্যে তখন প্রতীক্ষা করছিল। রবীন্দ্রনাথের অরূপ-চেতনায় এবং অরূপ ও জীবনের সমন্বয়ে এরূপ ধারণার শেষ সমর্থন পাওয়া যাবে।

সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার মিশ্রণে শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত উর্বশী কবিতাতেই কবির সৌন্দর্য-বাসনার পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে। ঐ কবিতাটির রসবিচারের পূর্বে আমাদের দেখতে হবে যে কবির উপলব্ধ রসের স্বরূপ যাই হোক তাকে আবৃত ক'রে রয়েছে একটি নারীর সৌন্দর্য। হোক সে অমানবী, তবু এই নারীরূপের আবরণই উর্বশী কবিতার একমাত্র কৌশল বা আর্ট। নতুবা কবির সৌন্দর্য-বোধের প্রকার গদ্যের ভাষাতে কি কীট্‌স্‌এর উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির মত আধা-গদ্য আধা-কবিতার নিছক তত্ত্বপ্রকাশের ভঙ্গিমাতে জ্ঞাপন

করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। বস্তুতঃ এই অপার্থিব নারীরূপকল্পনাই পাঠকচিত্তে এই কবিতাটির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ উদ্বোধিত করেছে। উর্বশী ছাড়া কবির অন্য সমস্ত সৌন্দর্য-সম্পর্কিত কবিতাগুলির মধ্যেও নারীরূপের কল্পনা রয়েছে। মেঘদূত কবিতায় "মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা, কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা" থেকে আরম্ভ ক'রে সোনার তরী ও নিরুদ্দেশ যাত্রার 'বিদেশিনী', 'মানস-সুন্দরী' এবং চিত্রার প্রশান্তহাসিনী বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী সবই নারীরূপের কল্পনা। এ-কে নারীরূপে দেখার আগ্রহ কী তীব্র তা মানস-সুন্দরীর নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি থেকে বোঝা যাবে—

মানসরূপিণী ওগো বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা, ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমিই কি মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ ল'য়ে
অনিন্দ্য সুন্দরী ? * *
* * সেই তুমি
মূর্তিতে কি দিবে ধরা ?............
সব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি ?
* * *
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি ?

সর্বত্র এই নারীরূপমণ্ডনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ-সম্পর্কিত কবিতাগুলি যে অপূর্বতা ও বিস্ময়কর কাব্যগুণ লাভ করেছে তা পাঠক মাত্রেই অনুভব করেন। ভারতীয়ের চক্ষে উর্বশীতে নারীরূপের চরমোৎকর্ষ আছে,—তাই কবি উর্বশীর কল্পনাই গ্রহণ করলেন। কবিতাটির ঐরূপ নামকরণের সঙ্গে ঐ অপ্সরের বহুশ্রুত অলৌকিক রূপের দিকটি লক্ষ্যে না রাখলেই নয়।

বস্তুতঃ এই অপ্সরোনারীরূপকে অপার্থিব বাসনার বস্তুরূপে চিত্রিত করতে কবি নিজ কল্পনারও চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় কবিদের উর্বশী কল্পনার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে এই সৌন্দর্যমূর্তি গ'ড়ে তুলতে হয়েছে। প্রধানভাবে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকেই উর্বশীর অলোকসামান্য, কল্পনাতেও অনধিগম্য রূপ বর্ণিত হয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীতে বহুল পরিমাণে কালিদাসের উর্বশীর রূপ ও ভঙ্গি মিশ্রিত আছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের নারীরূপমোহ অনায়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্য-উপাসনায় কবির আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, এবং কবিতাটি স্ববিরোধী ভাবযুক্ত হয়েছে এমন মনে করাও বহির্দৃষ্টিপ্রবণতার পরিচায়ক। সত্য বটে, রসজ্ঞ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কর্তৃক প্রদর্শিত উর্বশীর কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ইংরেজ কবি Swinburneএর কল্পনার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষীণ প্রভাব কাব্যকলার মণ্ডনেরই সহায়ক হয়েছে,—তাও সমগ্রভাবে নয়, সমগ্রভাবে কালিদাসই এই নারীরূপকল্পনার পশ্চাতে ছায়ার মত অবস্থান করছেন। উর্বশী কবিতার সৌন্দর্যতত্ত্বের আধার—রূপকল্পনার এই চরমোৎকর্ষ সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এর তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে; এবং কবিকল্পনার এই স্বরূপ সম্পর্কে সম্যগ্‌বোধের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি ব'লেই বহির্দৃষ্টিতে

কবিতাটি স্ববিরোধী হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ নিরুপাধি সৌন্দর্য-প্রেরণাই কবির কবিতার বিষয় হলেও রূপাশ্রয়ণে,—ব্যঞ্জনায় নয়, এর বাহ্য অর্থে কল্পিত বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতাটির রূপনির্মাণ এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে কেউ যদি এমন তর্ক করেন যে কবিতাটি বস্তুতঃ উর্বশীর সম্পর্কে কবির স্তুতি, নিরুপাধি বা সোপাধি কোনো সৌন্দর্যতত্ত্বই এতে নেই, তাহলে সে তর্কের সাক্ষাৎ জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কেবল কয়েকটি পঙ্‌ক্তির ব্যঞ্জনা এবং শেষ স্তবকটির ক্ষীণ আর্তি থেকে মাত্র কবির অভিপ্রায় উপলব্ধ হতে পারে।

কবিতাটিতে উর্বশীর কল্পনায় তার অলৌকিক রূপ এবং অদম্য পলায়নপর স্বভাব এই দুটি বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি মোটামুটি উর্বশী সম্পর্কে বৈদিক ধারণা। পুরুরবা পলায়মানা উর্বশীকে যখন স্ত্রীরূপে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে তখন উর্বশী বলছে, 'আমি বায়ুর মত দুর্লভ', 'স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না, এদের হৃদয় ব্যাঘ্রীর হৃদয়ের তুল্য।'* উর্বশীর এই স্বভাবের সঙ্গে মিলেছে তার ভুবনমোহন রূপ। 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা,' অথবা 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী' প্রভৃতি কবির উক্তি থেকে অনুমান হয়, বৈদিক উষাও কিয়ৎপরিমাণে উর্বশীর রূপে স্বীয় রূপ দান করেছে। যেমন, উষা সম্পর্কে বহু বর্ণনার মধ্যে একটি মন্ত্রে রয়েছে—

অব স্যূমেব চিন্বতী মঘোনী
উষা যাতি স্বসরস্য পত্নী
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা
আন্তাদ্দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ (ঋগ্বেদ ৩।৬১)

---

* ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল—দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি।...
...ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়াণ্যেতাঃ।

সর্বত্র এই নারীরূপমণ্ডনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ-সম্পর্কিত কবিতাগুলি যে অপূর্বতা ও বিস্ময়কর কাব্যগুণ লাভ করেছে তা পাঠক মাত্রেই অনুভব করেন। ভারতীয়ের চক্ষে উর্বশীতে নারীরূপের চরমোৎকর্ষ আছে,—তাই কবি উর্বশীর কল্পনাই গ্রহণ করলেন। কবিতাটির ঐরূপ নামকরণের সঙ্গে ঐ অপ্সরের বহুশ্রুত অলৌকিক রূপের দিকটি লক্ষ্যে না রাখলেই নয়।

বস্তুতঃ এই অপ্সরোনারীরূপকে অপার্থিব বাসনার বস্তুরূপে চিত্রিত করতে কবি নিজ কল্পনারও চরমোৎকর্ষ দেখিয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় কবিদের উর্বশী কল্পনার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে এই সৌন্দর্যমূর্তি গ'ড়ে তুলতে হয়েছে। প্রধানভাবে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকেই উর্বশীর অলোকসামান্য, কল্পনাতেও অনধিগম্য রূপ বর্ণিত হয়েছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীতে বহুল পরিমাণে কালিদাসের উর্বশীর রূপ ও ভঙ্গি মিশ্রিত আছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের নারীরূপমোহ অনায়াসেই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্য-উপাসনায় কবির আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, এবং কবিতাটি স্ববিরোধী ভাবযুক্ত হয়েছে এমন মনে করাও বহির্দৃষ্টিপ্রবণতার পরিচায়ক। সত্য বটে, রসজ্ঞ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কর্তৃক প্রদর্শিত উর্বশীর কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ইংরেজ কবি Swinburneএর কল্পনার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষীণ প্রভাব কাব্যকলার মণ্ডনেরই সহায়ক হয়েছে,—তাও সমগ্রভাবে নয়, সমগ্রভাবে কালিদাসই এই নারীরূপকল্পনার পশ্চাতে ছায়ার মত অবস্থান করছেন। উর্বশী কবিতার সৌন্দর্যতত্ত্বের আধার—রূপকল্পনার এই চরমোৎকর্ষ সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এর তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে; এবং কবিকল্পনার এই স্বরূপ সম্পর্কে সম্যগ্‌বোধের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি ব'লেই বহির্দৃষ্টিতে

কবিতাটি স্ববিরোধী হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ নিরুপাধি সৌন্দর্য-প্রেরণাই কবির কবিতার বিষয় হলেও রূপাশ্রয়ণে,—ব্যঞ্জনায় নয়, এর বাহ্য অর্থে কল্পিত বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতাটির রূপনির্মাণ এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে কেউ যদি এমন তর্ক করেন যে কবিতাটি বস্তুতঃ উর্বশীর সম্পর্কে কবির স্তুতি, নিরুপাধি বা সোপাধি কোনো সৌন্দর্যতত্ত্বই এতে নেই, তাহলে সে তর্কের সাক্ষাৎ জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কেবল কয়েকটি পঙ্‌ক্তির ব্যঞ্জনা এবং শেষ স্তবকটির ক্ষীণ আর্তি থেকে মাত্র কবির অভিপ্রায় উপলব্ধ হতে পারে।

কবিতাটিতে উর্বশীর কল্পনায় তার অলৌকিক রূপ এবং অদম্য পলায়নপর স্বভাব এই দুটি বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি মোটামুটি উর্বশী সম্পর্কে বৈদিক ধারণা। পুরুরবা পলায়মানা উর্বশীকে যখন স্ত্রীরূপে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে তখন উর্বশী বলছে, 'আমি বায়ুর মত দুর্লভ', 'স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না, এদের হৃদয় ব্যাঘ্রীর হৃদয়ের তুল্য।'* উর্বশীর এই স্বভাবের সঙ্গে মিলেছে তার ভুবনমোহন রূপ। 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা,' অথবা 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী' প্রভৃতি কবির উক্তি থেকে অনুমান হয়, বৈদিক উষাও কিয়ৎপরিমাণে উর্বশীর রূপে স্বীয় রূপ দান করেছে। যেমন, উষা সম্পর্কে বহু বর্ণনার মধ্যে একটি মন্ত্রে রয়েছে—

অব স্যূমেব চিন্বতী মঘোনী
উষা যাতি স্বসরস্য পত্নী
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা
আন্তাদ্দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ (ঋগ্বেদ ৩।৬১)

* ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল—দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি।...
...ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়াণ্যেতাঃ।

অর্থাৎ "ধনবতী উষা সূর্যের পত্নী যেন বস্ত্র উন্মোচন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। স্বকীয় দীপ্তি বিস্তার করতে করতে সৌভাগ্যবতী শোভনা উষা স্বর্গ ও পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে।" কিন্তু উর্বশীর রূপে ও ভাবে যে অপার্থিবত্ব তার জন্যে বিক্রমোর্বশীয়ের উর্বশীর রূপ ও চরিত্রই প্রধান ভাবে কাজ করেছে মনে হয়। কবি কালিদাস যদিও নাটক রচনা করতে গিয়ে উর্বশীকে অনেকটা গৃহরমণীর স্বভাব দিয়ে ফেলেছেন তথাপি তাঁর রূপাঙ্কন ও চরিত্র বর্ণনার এমনি বৈশিষ্ট্য যে উর্বশীকে ঠিক মানবী ব'লে মনে হয় না। অর্থাৎ বিক্রমোর্বশীয়ের মধ্যেই উর্বশী প্রায় একটি অপার্থিব সৌন্দর্যসত্তার রূপ আগেই পরিগ্রহ করেছে এমন বললে অন্যায় হবে না। কালিদাসের রোম্যান্টিক কবিস্বভাবই এজন্যে দায়ী। যেমন, উর্বশীর রূপবর্ণনায় অতিশয়োক্তির চূড়ান্ত ক'রে রাজা বলছেন,—এর সৃষ্টিতে কান্তিমান চন্দ্র স্বকান্তি দান করেছে, স্বয়ং মদন যেন একে আদিরসের মায়া-বিগ্রহ করে গ'ড়ে তুলেছে, বসন্ত যেন তার সমস্ত ফুলের সার দিয়ে একে সৃষ্টি করেছে। 'ত্বয়া বিনা সোঽপি সমুৎসুকো ভবেৎ' ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে রাজা উর্বশীর রোম্যান্টিক বেদনাজনকত্বেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যত্র বিদূষকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়েও উর্বশীর অলৌকিকত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। রাজা বলছেন—

আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ ॥

'এর দেহ আভরণেরও আভরণ, প্রসাধনেরও প্রসাধন হওয়ার যোগ্য। সৌন্দর্যের উপমানবস্তু যা আছে এ তারও উপমান হতে পারে।' নাটকটিতে এমন বহুস্থান আছে যেখানে উর্বশীর বিমান-গতি, পলায়ন-পরতা এবং অপ্রাপ্যতা বর্ণিত হয়েছে। 'অচিরপ্রভাবিলাসিতৈঃ

পতাকিনা', 'গূঢ়ং নূপুরশব্দমাত্রমপি মে কান্তং শ্রুতৌ পাতয়েৎ' প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা বা 'মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে' প্রভৃতি তুলনার যোগ্য হতে পারে। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজা যেখানে উর্বশীকে হারিয়ে ফেলেছেন সেখানে উর্বশীও মানবীরূপ একেবারে ত্যাগ করেছে এবং রাজাও উর্বশী-বিরহে রোম্যান্টিক কাতরতা অনুভব করছেন।

যাই হোক, কালিদাসের উর্বশী, নাটকের খাতিরে মানবীরূপে চিত্রিত হ'লেও, তার মধ্যে নানান জায়গায় অপার্থিবত্বই অভিব্যক্ত হয়েছে। পুরূরবার সঙ্গে তার মিলন হ'লেও তার স্বভাবের অবন্ধনই দর্শকের চিত্তে প্রধান ভাবে রেখাপাত করে। রবীন্দ্রনাথের উর্বশীও কোনো সম্পর্কের মধ্যে ধরা দিতে চায় না। সে শুধু 'ইন্দ্রের সভার অমৃতপান-সখী', সে রূপের দ্বারা প্রলুব্ধ করে, কিন্তু কারো কাছে সম্পূর্ণ ধরা দেয় না। স্বর্গের দেবতারা তার ক্ষণিক সঙ্গলাভ করতে পারেন বটে, কিন্তু মর্তের মানুষের কাছে সে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। মাত্র একজন সৌভাগ্যবান কিছুদিন তার সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছিলেন, আবার নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যক্তও হয়েছিলেন। এই নিয়ম-লঙ্ঘন তার অতীব দুষ্প্রাপ্যতারই পরিচয় দেয়, তথা মর্তের মানুষের চিত্তকে তীব্র বিরহে ব্যাকুল করে। অপ্সরদের আর একটি বিশেষ ধর্ম মানুষের কাছে পরিচিত। স্বর্গের চক্রান্তে তারা কঠোর তপস্বীদের ধ্যানভঙ্গ ক'রে চ'লে যায়। উর্বশী-চরিত্রের এই লক্ষণগুলি রবীন্দ্রনাথের কল্পিত সৌন্দর্যের নারীমূর্তির কল্পিত আচরণের সঙ্গে মিলে যায়। নিরুদ্দেশ-যাত্রার রহস্যময়ী বিদেশিনী কবিকে কেবল পর্যাকুলই করেছে। তার স্পর্শলাভের জন্যে কবি ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন করছেন, কিন্তু স্বভাববশতঃ সে প্রলুব্ধই করছে। আবার, কঠোর কর্তব্যে রত মানুষকে যে-প্রকৃতির

দূত এসে বিভ্রান্ত করে, কাজ ভুলিয়ে সৌন্দর্যে বিহ্বল ক'রে তোলে, সে এই নন্দনেরই দূত—প্রকারান্তরে উর্বশী। মানস-সুন্দরী কবিতায় কবি বলছেন—

বারে বারে
শৈশব কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালাকারা হতে।

এই হ'ল কবির তপোভঙ্গ। উর্বশীর সঙ্গে পূর্বেকার মানস-সুন্দরীর অন্তরধর্মের মিলনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে উভয়ের এই বন্ধনহীনতা এবং পার্থিব সম্পর্কহীনতাও তুলনীয়।

যেহেতু কোনো লৌকিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, সেইহেতু উর্বশীর প্রতি তথা মানস-সুন্দরীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ নিষ্কাম। পূর্বেই বলেছি, মেনকার সঙ্গে বিশ্বামিত্রের বা উর্বশীর সঙ্গে পুরুরবার যে সকাম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল তা নিয়ম-লঙ্ঘনের দ্বারা নিয়মকেই সিদ্ধ করছে এবং সেখানেও কোনো স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সন্তানকে ত্যাগ ক'রে নিষ্ঠুরভাবে চ'লে যাওয়ার মধ্যেই তাদের স্বরূপের প্রকাশ, ক্ষণিকের ধরা দেওয়ার মধ্যে নয়। উর্বশী সম্পর্কে মানুষের এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির যে-বাসনা তা দেহজ বা কামজ নয়, তা অপার্থিব আকর্ষণ মাত্র। কবি উর্বশী সম্পর্কে আলোচনায় যুক্তিযুক্ত নির্দেশই দিয়েছেন যে 'বাসনা' অর্থে আমরা যেন 'লালসা' মনে না করি। অর্থাৎ যে অপূর্ব নারীরূপ সৌন্দর্যস্পৃহার আধার তা আমাদের বাসনাব্যথিত করলেও সকামদৃষ্টি-কলুষিত হবে না। বস্তুতঃ কবির সৌন্দর্যকল্পনা নারীরূপকে আশ্রয় করলেও যেহেতু এ-নারী অমানবী, অপ্রাকৃত, (তু০—'মা ভবং

মানুসীধম্মং দিব্বাএ সম্ভাবেহ্'—অর্থাৎ, 'দেবীতে মানুষীর ধর্ম দেখার আশা কোরো না'—বিদূষক, বিক্রমোর্বশীয়) ন ভূতো ন ভবিষ্যতি কবি-কল্পনার বস্তুমাত্র, সেইহেতু এর সঙ্গে লৌকিক কোনো কামনার সম্পর্ক স্থাপিত হতেই পারে না। এইজন্যে এই সৌন্দর্য (তথা উর্বশী) সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক উপলব্ধ সত্যটিকেই কবি প্রাধান্য দিয়ে কবিতার প্রারম্ভে স্থাপন করলেন—'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ।'

সর্বসম্পর্করহিত একটি অকুণ্ঠিত সৌন্দর্যমূর্তিরূপে উর্বশীর চিত্তে অধিষ্ঠান বর্ণনা ক'রে কবি এর রূপ, আচরণ ও প্রভাব সম্পর্কে যে কল্পনাকুশলতা দেখিয়েছেন তার সাদৃশ্য দুর্লভ। কবির কল্পনা উর্বশীর চিত্র আঁকতে স্বর্গ থেকে মর্ত, আকাশ থেকে সমুদ্রতলের গভীরতা পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। কবি এই উদ্দাম কল্পনার দ্বারাই উবশীকে সাধারণ নারীরূপের উর্ধ্বে নিয়ে গেছেন, এবং অতিমর্ত ভাববিহ্বলতার মধ্যে স্থাপন করেছেন, ফলতঃ উর্বশী বিশেষ নারী না হয়ে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত একটি অপার্থিব সৌন্দর্যসত্তার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বসন্তপ্রাতে যার আবির্ভাবে সমুদ্র লহরী-ফণা অবনত ক'রে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল, 'আঁধার-পাথারতলে' 'প্রবালপালঙ্কে' নিদ্রায় এবং মণি নিয়ে খেলায় যার দিন কেটেছে, যে মুনির ধ্যান ভঙ্গ ক'রে ক্ষিপ্রপদে নূপুর-ধ্বনি সহকারে আকাশ-পথে চলে যায়, যার মদিরগন্ধে বাতাস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং যার নৃত্যের পদবিক্ষেপে মর্তে সিন্ধু তরঙ্গিত হয়, ধরণীর অঞ্চল কম্পিত হয়ে ওঠে এবং আকাশে তারা-রূপে যার স্তনভারচ্যুত মণি ভ্রষ্ট হয়—সে নারী যে মানবী নয় এবং কোনো নির্দিষ্ট রূপবর্ণনার মধ্যে ধরা পড়ে না, তা অতি স্পষ্ট। এই অপরূপ নারীরূপ সমস্ত সম্পর্ক-রহিত এক অতিবিস্ময়কর কল্পনার বস্তু হয়ে পড়েছে।

কালিদাসের উর্বশীরূপ-বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মিলের

কথা আগেই বলেছি। 'ডানহাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে' ইত্যাদিতে গ্রীক ধারণা ও সুইনবার্নের প্রভাব কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন। আমাদের মনে হয়, বাইরে সুইনবার্নের সঙ্গে অর্থগত মিল আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনাটি কবির স্বকীয়। কবিকল্পিত এই সৌন্দর্যের বিশিষ্ট প্রকৃতিই ঐ পঙ্‌ক্তিটিতে বিবৃত হয়েছে। এই সৌন্দর্য যেমন একদিকে বিরহব্যাকুল ক'রে তোলে, তেমনি আর একদিকে ধ্যানজ প্রশান্তি নিয়ে আসে। এই অংশের সুধাপাত্রধারিণী নারীকে লক্ষ্মী ব'লে কল্পনা করা চলে না এবং এখানে নারীর দ্বিবিধরূপও বর্ণিত হয়নি। কারণ উর্বশীতে নারীতত্ত্ব নেই এবং কল্যাণরূপিণী লক্ষ্মীর কল্পনা অত্যন্ত অসংগত। আবার এমনও বলা যেতে পারে যে 'প্রেয়সী' বিশেষণ ব্যবহারের দ্বারা এবং 'বিশ্ববাসনা' শব্দ প্রয়োগের জন্যও স্ববিরোধী ভাবের প্রশ্রয় ঘটেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় 'প্রেয়সী' বিশেষণ 'অত্যন্ত প্রিয়' এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, আর বাসনা বলতে সেই তীব্র অভিলাষ যা অকারণেই মানুষের মধ্যে বর্তমান তা-ই লক্ষিত করা হয়েছে,—কামজ দেহাভিলাষ নয়। নইলে 'বিশ্ববাসনার অরবিন্দ' এই রূপকটিই বা কবি ব্যবহার করবেন কেন, আর 'অতি লঘুভার' এই বিশেষণেরই বা সার্থকতা কী? 'লঘুভার' শব্দটি একান্ত ব্যঞ্জনাময়; সৌন্দর্যের এই পূর্ণতার স্পর্শ মানুষ পেতে পারে মাত্র, তাকে সমগ্রভাবে পাবার উপায় নেই,—এই ব্যঞ্জনা।

সুতরাং আমাদের মনে হয়, উর্বশীর এই রূপকল্পনার আশ্রয়ে কবিমানসের অতি-সূক্ষ্ম স্থির সৌন্দর্যানুভূতি ব্যঞ্জিত হয়েছে। যে-কোনো রূপের আশ্রয়ে কবির সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ লাভ করুক না কেন, যদি এ-বিষয়ে কবির নিষ্ঠা ঐকান্তিক হয়, কবি যদি রূপসর্বস্ব না হন অর্থাৎ রূপ যদি অনির্বচনীয় রসীভবন-যোগ্যতা লাভ করে

তাহ'লে সাহিত্য পরীক্ষার কালে ঐ কাব্যের বহিরঙ্গের বিচারে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। বিশ্বের বিচিত্র ও বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে অনুভবনীয় ঐ সমগ্র সৌন্দর্যমূর্তি (যা কবিহৃদয়ের বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধের প্রতিরূপ মাত্র) আমাদের বহু-পরিচিত উর্বশীর রূপাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লেই একদিকে সাধারণভাবে নারীরূপের মোহ এবং অপর দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের নারীর প্রত্যক্ষ বাসনাময়তা এর বিভাব নির্মাণে স্বতই দেখা দিয়েছে। উর্বশীর abstract সৌন্দর্যের অনুধাবনে কবির রূপনির্মাণের এই অসামান্যতার দিকটি সম্পর্কে সচেতন না হলে ভুল ঘটতে পারে। এক হিসেবে সমস্ত সৌন্দর্যই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ('সাহিত্যের পথে'), তা যে-কোনো রূপের আশ্রয়েই কবিহৃদয়ে উদ্বোধিত এবং বাইরে প্রকাশিত হোক না কেন। কারণ, কবিমানসের আনন্দচৈতন্যে রূপহীন অনির্ণেয় প্রেরণারূপেই এর স্থিতি। এর জাগরণে ও আস্বাদে ব্যক্তিস্বরূপের ঊর্ধ্ব বা নামরূপের অতীত একটি অবস্থার উদ্ভব, যার বর্ণনায় বৈষ্ণব দার্শনিকেরা 'স্বার্থগন্ধহীন' 'অকৈতব' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, কবিরা বলেছেন 'ন সো রমণ ন হাম রমণী' অথবা 'রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়'। সৌন্দর্যদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ লৌকিকতা ও বিচারবোধের অতীত এই স্বপ্নাবস্থা সৌন্দর্য-সমালোচনায় অধ্যাত্মবাদী ক্রোচের উপলব্ধির সঙ্গে মিলে যায়। রবীন্দ্রনাথের মত ক্রোচেও সাহিত্য বা সৌন্দর্যকে খাঁটি সত্যবস্তু ব'লে মনে করেন, যদিও আত্মপ্রকাশই কাব্য, বহিঃপ্রকাশে কাব্যের অবিমিশ্র বিশুদ্ধ উপলব্ধি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়, তাঁর এই সকল ধারণার সঙ্গে কবির উপলব্ধির মিল পাওয়া যায় না।

কবিতাটির শেষ দুই স্তবকে উর্বশী সম্পর্কে কবির বিরহ ও

রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে। এখানে স্পষ্টতই উর্বশী তার নারীরূপ ও নারীপ্রকৃতি ত্যাগ ক'রে সৌন্দর্য-বিরহোদ্দীপক একটি সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে ;
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।

এই তীব্র বিরহ-ব্যাকুলতার স্বরূপ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। চিত্রায় এই বিরহ-ব্যাকুলতা ও প্রশান্ত সৌন্দর্যরসানুভব উভয়ে মিশে কবির সৌন্দর্যবোধ-সম্পর্কে একটি স্থির ও পূর্ণ আদর্শের জন্ম দিয়েছে।

সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির উপলব্ধ অপ্রয়োজনের বা কামসম্পর্কহীনতার তত্ত্বটি কবি স্পষ্টভাবে বললেন 'বিজয়িনী' এবং 'আবেদন' কবিতায়। বিজয়িনী কবিতায় কবি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করছেন কালিদাস ও বাণভট্টের অনুসরণে। এখানেও নারীরূপের কল্পনার মধ্যেই সৌন্দর্যের সার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। পরাভূত মদনের এই চিত্রটি পূর্বেকার 'আবেদন' কবিতায় ইতিমধ্যেই ভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর', এবং 'অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে প্রয়োজন-সম্পর্ক-রহিত সৌন্দর্যের অনুরাগী কবির বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। পরের বহু কবিতাতেও কবি এই উপলব্ধিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ দৃষ্টি Art for art's sake-এর দৃষ্টি। পরবর্তীকালে সাহিত্যবিচারেও কবি রসকে চরম সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন দেখতে পাই। বিজয়িনী কবিতায় কাব্যরস

যা কিছু ঐ সৌন্দর্যের আদর্শ নারীর রূপসৃষ্টিতে পাওয়া যায়। উপসংহারের তত্ত্বটুকু কবির উপলব্ধ সত্যের ব্যঞ্জনাময় বিবৃতি মাত্র।

* * পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।

চিত্রা কাব্যে কবির পূর্বতন রোম্যান্টিক প্রবণতাগুলির পূর্ণতা আর এক দিক থেকে ঘটেছে। এ হ'ল কবির পূর্ব-উপলব্ধ মর্ত-বিহ্বলতার ও সাধারণ মর্তপ্রীতির স্থির মানবপ্রীতিতে পরিণাম। এই মানবপ্রীতির বাস্তব সংঘাতক্ষুব্ধ জীবনের চিত্র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়, এবং প্রশান্ত, করুণ, কোমল জীবনচিত্র—'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কবির পদক্ষেপে দিক্‌পরিবর্তনের সুস্পষ্ট চিহ্ন বহন করছে। এর পূর্বেকার 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রগাঢ় প্রকৃতিপ্রীতির সঙ্গে যদ্যপি মানবপ্রীতি মিশ্রিত রয়েছে,—যেমন নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি।

তথাপি এই ক্ষীণ মানবজীবনের কথার কাল্পনিকতার অতিরিক্ত বাস্তব কোনো আবেদন নেই। 'বসুন্ধরা'য় বহুধা বিচিত্র ও ব্যাপক প্রকৃতিই কবির অবলম্বন, কেবল মানুষ নয়। কড়ি ও কোমলের

'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' কবিতাও কবির বাস্তব মানব-প্রীতির প্রথম প্রকাশ ব'লে গৃহীত হতে পারে না, কারণ গভীর মর্ত-উপলব্ধির ভিত্তিতে এ সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। তা ছাড়া, মানবীয়তার আদর্শে উদ্দীপ্ত কবির দুঃখবরণ ও আত্মবিসর্জনের এহেন উৎসাহ পূর্বে আর কোথাও দেখা যায়নি।

সোনার তরীর 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় ('এবার ফিরাও মোরে' রচনার প্রায় এক বৎসর পূর্বে লেখা) মানবজীবনের বাস্তব সংঘাতের কথা অতি ক্ষীণভাবে কবির চিত্তে ধ্বনিত হ'লেও তার অনুভূতি এত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ (যার জন্যে কবিতাটিকেও প্রথম স্তরের বলা যায় না,) যে, এই কবিতাটিকে রবীন্দ্র-কাব্যজীবনে পরিবর্তনের নির্দেশক বিশেষ কবিতা ব'লে অভিহিত করা যায় না। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার আর্ত মানবের জন্য তীব্র বেদনাবোধ, গতির মুখে চলমান মানবজীবনের পূর্ণতা সম্পর্কে একটি স্থির আদর্শবোধ এবং উদার কল্পনা ও বলিষ্ঠ অসাধারণ ভঙ্গি কাব্য হিসেবেও একে প্রথম স্তরে উন্নীত করেছে। এই বিশিষ্ট কবিতাটিতেই যে মানব-জীবনবোধের প্রারম্ভ সে সম্পর্কে কবি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে বলছেন :

> 'বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব।.... .. এই বড়ো আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে

বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, সোনার তরীর 'বিশ্বনৃত্যে'—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা

কিন্তু এতেও সেই বাজনার সুর।............যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রেয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি চিত্রায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।...... এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল।'

প্রকৃতি থেকে মানবজীবনের বাস্তবতায় এই যে উত্তরণ এ কবির নবজাগরিত আত্মবোধের পরিচয়। এই আত্মবোধই কবিকে আত্ম-বিকাশের ধারণায় কিরূপে নিয়ে গেছে তা আমরা অল্প পরেই জীবনদেবতার আলোচনায় দেখব। আত্মবিকাশ সম্পর্কিত এই ধারণাতেই কবির পূর্ব অনুভূতিগুলির পূর্ণতা লক্ষিত হয় ও বোঝা যায় যে রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ বিকাশ আরম্ভ হ'ল,—যার মূলে রয়েছে 'এবার ফিরাও মোরে'র এই পথ-পরিবর্তন। কবিতাটিতে কবির বাস্তব জীবনবোধে উত্তরণের ইতিহাস এইভাবে বর্ণিত রয়েছে—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। * * *
* * * বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।

কবিতাটির প্রারম্ভে রয়েছে মানবজীবনের দুঃখ ও সংঘাতের বেদনা—

যা ইতিপূর্বে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। কবিতাটির মাঝখানে নূতন পথে যাত্রার ইঙ্গিত, তার পর সংঘাতের মধ্যে জীবনের গতিশীলতায় মানুষের তথা কবির একটি স্থির অথচ অজ্ঞাত আদর্শের অভিমুখে যাত্রা, এবং শেষে যাত্রাকালে প্রবল আত্মবোধের স্ফুরণে গতিশীল সক্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রতি লক্ষ্যপাত বর্ণিত হয়েছে।

*   *   তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—

ইত্যাদি উক্তির মধ্যে কবির নব-উপলব্ধ ব্যক্তিত্বের আদর্শ ই কবির গোচরে এসেছে। ইনিই অধিকতর বিশেষত্বে মণ্ডিত হয়ে পরে কবির অন্তর্যামীরূপে দেখা দিয়েছেন। বস্তুতঃ 'এবার ফিরাও মোরে'র ভাবের সঙ্গে 'অন্তর্যামী'র সাদৃশ্য কয়েকস্থানে অত্যন্ত নিকট। একটি স্থির আদর্শপ্রেরণার পরিকল্পনা ও পুর্ণ পরিণাম এই কবিতার উপসংহারে বর্ণিত হয়েছে। 'অন্তরে বহিয়া নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা' এই পুর্ণপরিণাম-আদর্শের একটি রূপকল্পনা। এর অবস্থান কবির জগৎ, জীবন ও আত্মা সম্পর্কে নবোদিত একটি স্থায়ী ভাবের মধ্যে। দেখা যায়, কবির কল্পিত মানসী সৌন্দর্যমূর্তিও এখানে জীবনের ভাবাদর্শে মিলিত হয়ে পড়েছে, নিজ প্রেয়সী বিশ্বপ্রিয়ায় পরিণত হয়ে গেছে। প্রেরণার দিক থেকে এই ভাবাদর্শ শেলির Intellectual Beautyর সদৃশ, যদিচ এর মধ্যে অপ্রাপ্তির আক্ষেপ নেই। বস্তুতঃ এই আদর্শ কবির আত্মারই আদর্শ, যার অজ্ঞাত পরিচালনায় কবি অবশভাবে পরিণতির অভিমুখে চলেছেন।

তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী।

*   *   তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।

এই অংশে বিকাশশীল কবি-আত্মার বা কবির অন্তর্নিহিত আদর্শের মুখে পরিণামের যে-বর্ণনা কবি দিলেন ('প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি' তু°) তাতে কেবল আত্মবোধের স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত হ'ল না, এর প্রতি কবির দৃঢ় অনুরাগও প্রকাশ পেল। পরবর্তী জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতায় সৃষ্টিক্রিয়ারত কবির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অপূর্ব বিস্ময় এবং কল্পিত প্রেম বর্ণিত হয়েছে দেখব। চিত্রা-কাব্যের পরিপূর্ণতার বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে একটি বিশেষ চিহ্ন হ'ল কবির মানবজীবনের তথা স্বীয় ব্যক্তিগত বাস্তবজীবনের অভিমুখে এই দিক্‌পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফল সুদূরপ্রসারী। অনতিবিলম্বে রচিত 'অন্তর্যামী' কবিতা থেকে পরবর্তীকালে অরূপ-উপলব্ধির দুর্যোগময়তার বা গতিমুখরতার কবিতাগুলি পর্যন্ত এই পরিবর্তনেরই অন্তর্গূঢ় পরিচয় বহন করছে এবং এই মনোভাব গীতাঞ্জলি, অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা প্রভৃতির সুদৃঢ় মানবীয়তার মধ্যে সমাপ্তি লাভ ক'রে কবির কাব্য-জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত একটি মৌলিক প্রেরণা-রূপে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তৎকালে এ মনোভাব অভিনব, রবীন্দ্রনাথই এর জন্মদাতা।

চিত্রা কাব্যের একদিকে সৌন্দর্য-উপলব্ধির পূর্ণতা, আর একদিকে জীবনবোধের ফলে মর্ত-উপলব্ধির পূর্ণতা, এই উভয়বিধ মনোভাবের বিকাশের সঙ্গে কাব্য-রচনাগত একটি পূর্ণতার বোধও অজ্ঞাতসারে মিশ্রিত হয়ে কবিকে এই সময়ে এমন একটি উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে যা

এই পর্যায়ে কবির আত্মসর্বস্ব অনুভূতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়েছে। এই উপলব্ধির বস্তুকে কবি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়েছেন, যদিও 'অন্তর্যামী' কবিতাতেই এই উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়, এবং অন্তর্যামী ও জীবনদেবতা ছাড়া চিত্রা কাব্যের আর দুটি কবিতায় জীবনদেবতার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও স্তুতি নিবেদন দেখা যায়। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পথে এই আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্ম-দর্শনের অপরিসীম বিস্ময় কবির চিত্তে নূতনতর উপলব্ধির পথে যাত্রার আভাস এবং ক্রম-পরিণতির অস্পষ্ট অথচ ধ্রুব চেতনা এনেছে, এবং গম্যস্থানে পৌঁছানোর পথে দিক্‌পরিবর্তনের ইতিহাস স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। এইখানেই জীবনদেবতা সম্পর্কিত কবিতার মূল্য। জীবনদেবতা একদিক থেকে তাঁর কাব্যজীবনের ইতিহাস-বিবৃতিমাত্র। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবিদের রচনার মধ্যে সচরাচর অনুমানের দ্বারা, তাঁদের প্রতিভা ও কাব্যনির্মাণকৌশলের স্বরূপ অবগত হ'তে হয়। অন্তর্গূঢ় কোন্ কোন্ প্রবণতা গোপন নিয়মের বলে তাঁদের কোন্ পথে পরিচালিত করে তা পাঠকসাধারণের সম্যক্ গোচর হওয়া অসম্ভব। আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই মহাগীতিকবি আত্ম-দর্শনের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিক্রিয়াশীল আন্তর রহস্য কতক পরিমাণেও আমাদের অনুভব-গোচর ক'রে তুলেছেন।

জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতা রসিকসমাজে আলোচনায় অল্পবিস্তর ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করেছে এবং পাঠকসমাজে সমস্যারূপে অবস্থান করছে। জীবনদেবতায় কবি কোন্ সত্তাকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর অনুরাগের বিহ্বলতা প্রকাশ করেছেন, তিনি কি সর্বভূতান্তরাত্মা ঈশ্বর, না পূর্বেকার মানসসুন্দরী? এর আরম্ভ কোথায়? এর ব্যাপ্তি কতদূর? এরকম বহু প্রশ্ন জীবনদেবতা সম্পর্কে উদিত হতে পারে। এখনও

জীবনদেবতা ব্রহ্ম, এমন কি সোনার তরী কবিতার বিদেশিনীও জীবনদেবতা বা ঈশ্বর এমন ধারণা প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়। কবির রোম্যান্টিক কবিতাগুলি সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট তত্ত্ব বা মতবাদ আরোপ সুপ্রাচীন—যার ফলে নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তৎকালীন রবীন্দ্র-রসিকদের মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সহানুভূতির দ্বারা রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের সূত্রের অনুসরণেই তাঁর যে-কোনো শ্রেণীর কবিতার সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভব। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখলে তাঁর অনেক কবিতাই দুর্বোধ্য হতে পারে, ফলে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার অবকাশও যে না ঘটতে পারে এমন নয়। বস্তুতঃ এই ভাবে 'সোনারতরী', 'মানসসুন্দরী', এমন কি সৌন্দর্যের সমস্ত কবিতার মধ্যেই জীবনদেবতা দেখা হয়েছে এবং বলাকা-পুরবীতে যেখানে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ পূর্ণ হয়েছে সেখানেও জীবনদেবতা আরোপ ক'রে কয়েকটি কবিতার রসগ্রহণের চেষ্টা হয়েছে। বস্তুতঃ জীবনদেবতাই যদি কবির রচনার আদ্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করে তাহ'লে ঐ জীবনদেবতার উপলব্ধিতেই রবীন্দ্র-প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ধরতে হয়, আর 'সোনারতরী'তেই সেই বিকাশ ঘটেছে এমন মনে করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখি যে, সুদূরের প্রতি বর্তমানে ব্যাকুল কবি পরে অরূপ-লীলার সঙ্গে আত্মার যোগ অনুভব করেছেন, এবং আরও পরে জীবনের সঙ্গে অরূপকে নিবিড়ভাবে যুক্ত ক'রে দেখেছেন। সেইখানেই তাঁর প্রতিভার পরিণতি। প্রকৃতি-ব্যাকুলতার পরিণামরূপে অরূপানুভূতি স্বাভাবিকভাবে না এলে তিনি ইংরেজি রোম্যান্টিক কবিদের মত একজন হতেন, আর জীবনের সঙ্গে যোগের মধ্যে অরূপের প্রতিষ্ঠা না করলে তিনি সাধারণভাবে মধ্যযুগের ভারতীয় ভাব-সাধকদের একটি সংখ্যাবৃদ্ধি করতেন মাত্র।

কবি রবীন্দ্রের কবিতায় তত্ত্ব-আরোপ দুটি প্রবল বাহ্য কারণে ঘটেছে। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের পশ্চাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত পিতার অস্তিত্ব এবং ব্রাহ্মধর্ম ও উপনিষৎ-চর্চার পরিবেশ ছিল ব'লে এবং তিনি নিজেও কয়েকটি ব্রাহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন ব'লে তাঁর প্রথম জীবনের যে-কোনো কবিতায় তত্ত্ব আরোপ অতি সহজেই করা হয়েছে, এবং প্রকৃত কবিধর্মের সঙ্গে সহানুভূতিমূলক পরিচয় না থাকার ফলে বাহ্যতঃ দুর্বোধ্য কবিতাগুলিতে ঐ প্রকার তত্ত্ব আরোপ ক'রে একটা সহজ সমাধানের পথে সমালোচকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। দ্বিতীয়তঃ, কবির বহু কবিতায় ভঙ্গির দিক থেকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদরচনার প্রকৃতি গৃহীত হওয়ার ফলে কবির উপলব্ধ রসবস্তু বৈষ্ণবীয় ঈশ্বর ব'লে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

বাইরে থেকে কবিকে দেখার এই অ-সম্যগ্‌দৃষ্টিকে লক্ষ্য ক'রেই কবি কাতরকণ্ঠে আবেদন করেছেন—

বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে
আমায় দেখো না বাহিরে।

অর্থাৎ, 'বাহ্যদৃষ্টিতে আমার কবিতা বিচারের চেষ্টা কোরো না। বাইরের মানুষের রূপের অন্তরালে যে স্বপ্নমূর্তি গোপনচারী যথার্থ কবি রয়েছেন তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করো।' কবি-প্রতিভার স্বরূপ অনুধাবন করাই কবিকে যথার্থ দেখা এবং তা দেখতে হ'লে কবিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখা চলবে না, পূর্বনির্দিষ্ট কোনো সংস্কারের মলিনদর্পণেও দেখলে চলবে না এবং তাঁর চলতি পথের কোনো একটা বিশেষত্বকে সমগ্র ক'রে দেখলে খণ্ডিত দেখা হবে। 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কবিতারও পৌর্বাপর্য বিচার ক'রে এর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি ও যথাযোগ্য স্থাননির্দেশ কর্তব্য। কবির কাব্য-স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ

না ক'রে মনঃকল্পিত তত্ত্ব আরোপ ক'রে দেখলে কবির প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার করা হবে।

আমরা পুর্বেই নির্দেশ করেছি, চিত্রার পর্যায়ে একটি সর্বতোমুখী পুর্ণতার বোধ থেকেই 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি। জীবন-দেবতা-দর্শন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কবির আত্ম-স্বরূপ আবিষ্কার। যে বাস্তব-জীবনবোধ চিত্রা-পর্যায়ের পুর্বে কবির কাব্যে অবিদ্যমান ছিল, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সুস্পষ্ট জীবনের অভিমুখে দিক্-পরিবর্তনে সেই জীবনবোধের আবির্ভাবে কবি পরমবিস্ময় সহকারে আত্ম-জীবন-দেবতাকে প্রত্যক্ষ করলেন। এ সম্পর্কে কবি তাঁর নিজ আলোচনায় যা বলেছেন (আত্মপরিচয় দ্রঃ) তার বেশি বলার অবশ্য কিছু নেই। ঐ আলোচনা থেকে তাঁর উক্তির সারসংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়। জীবনদেবতা তাঁর সমস্ত রচনাকে একটা তাৎপর্যের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে এতাবৎ কোনো কালেই কবি সচেতন ছিলেন না। অর্থাৎ যদিও কবিতা-রচনা ছিল, তার কর্তা ছিল কবির এমন অনুভূতি পুর্বে ছিল না। শুধু কবিতা-রচনার ও সৌন্দর্য-উপলব্ধির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকেই নয়, সুখদুঃখময় চলমান ব্যক্তি-জীবনকেও এই জীবনদেবতা নিয়ন্ত্রিত করেন। ইনি বাস্তব ব্যক্তি-জীবন এবং অবাস্তব কাব্য-জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত ক'রে শুধু ইহজীবনেই নয়, জীবনান্তরেও কবিকে চালিত ক'রে পুর্ণতার পথে নিয়ে যাচ্ছেন। এঁকে কবি অন্তর্নিহিত সৃজনশক্তি ব'লেও অভিহিত করেছেন। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে তিনি এঁকে Creative Personality ব'লে উল্লেখ করেছেন এবং এই দুর্লভ শক্তির অধিকারী মানুষের মহিমা কীর্তন করেছেন।

জীবনদেবতা-উপলব্ধির পুর্বে বাস্তব-মানবজীবন-বোধ কবির একটি

অভিনব উপলব্ধি। এই উপলব্ধির সূত্রেই তাঁর আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির উৎসাহ। 'এবার ফিরাও মোরে'র আলোচনায় আমরা কবিজীবনের নির্দিষ্ট পরিণামের পথের চালক সম্পর্কে ('জানিনা কে। চিনি নাই তাঁরে—ইত্যাদি) কবির কৌতূহল নির্দেশ করেছি এবং এর একটি আদর্শ সৌন্দর্যমূর্তি কল্পনা ক'রে তার প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ-প্রকাশও লক্ষ্য করেছি। তথাপি একথা বুঝতে হবে যে 'এবার ফিরাও মোরে'র মূল কাব্য-প্রেরণা বাস্তব-জীবনবোধ থেকে এসেছে এবং ঐ জীবনবোধের পরিচয় বা মানবীয়তার প্রেরণায় সংঘাতের পথে চলার তীব্র আগ্রহই কবিতাটির প্রাণ। যার প্রেরণায় চলছেন তার সম্পর্কে কৌতূহল আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু গৌণভাবে। ঐ কৌতূহলের যথার্থ অভিব্যক্তি ও একরকম নিবৃত্তি 'অন্তর্যামী' কবিতায়। সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই কবিতাটির আদ্যন্ত কবিচিত্তের বিস্ময়ে স্পন্দিত হয়েছে। নূতন পথে আসার বিস্ময়ের সঙ্গে আত্মশক্তির সাক্ষাৎকার সহজেই উচ্ছ্বসিতভাবে কবিতাটির প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়েছে এবং ধুয়ার মত সর্বত্র অনুবৃত্ত হয়েছে—

একী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।

এই কবিতাটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে কবির অন্তরবাসী ব্যক্তিত্বের উপরে কথিত স্বরূপ উপলব্ধ হয় কিনা দেখা যাক্। আলোচনার জন্যে কবিতাটিকে স্পষ্টতঃ কয়েক অংশে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। ঐ বিভাগ কবিতাটিতেই সুনির্দিষ্ট আছে।

কবিতাটির প্রথম অংশে কবির কাব্য রচনার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কবি যে তাঁর কাব্যরচনা সম্পর্কে একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে এসে পৌঁছেছেন, তাঁর কাব্য যে নূতন ছন্দে নূতনতম বাণী বহন করছে সে সম্পর্কে কবি এখন নিঃসংশয়।

এই অংশের "আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে বলিতে দিতেছ কই" থেকে "কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার, কেহ এক বলে কেহ বলে আর, তোমারে শুধায় বৃথা বার বার" প্রভৃতি রচনার বিষয়ের ও ভঙ্গির অভিনবত্ব সম্পর্কে কবির বিস্ময়। অতঃপর "যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে চলিতে দিতেছ কই" থেকে "কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে, আমি যে তোমারে খুঁজি" পর্যন্ত কবির গতিমুখর নবজীবনের উপলব্ধির বিস্ময়। এখানে কবি স্পষ্ট অনুভব করলেন যে তিনি পূর্বতন কল্পনার জীবন থেকে সংঘাতময় কঠোর বাস্তব জীবনে অবতরণ করেছেন, এবং তাঁর অন্তরস্থিত কোন্ শক্তি এপথেও তাঁকে নিয়ে এসেছে তা-ই বিস্ময়সহকারে প্রশ্ন করেছেন। এই অংশের—

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজ নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।

প্রভৃতি 'এবার ফিরাও মোরে'র উল্লেখযোগ্য বিবর্তনের পুনরুক্তি মাত্র, এবং—

কভু বা পন্থ গহন জটিল
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল
কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল
বঙ্কিম দুরগম,
খরকণ্টকে ছিন্ন চরণ
ধুলায় রৌদ্রে মলিন বরণ

ইত্যাদি উক্তি ব্যক্তিগত মানবমুখী বাস্তব-জীবনের সংঘাত ও দ্বন্দ্বই সূচিত করছে।

কবিতাটির তৃতীয়াংশে ঐ শক্তির রহস্য সম্পর্কে কবির তত্ত্বজিজ্ঞাসা। কবির জীবনের উপর এই শক্তির সর্বতোমুখী কর্তৃত্ব এবং তাঁকে নির্দিষ্ট পরিণামের পথে চালনার বিষয় কবির এই অংশের প্রতিপাদ্য। কবি এই চালক শক্তিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্ন করেছেন—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার,
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার,
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।

কবি আশা করেন, যিনি তাঁকে সংগোপনে চালনা করছেন তিনি পরিণামে সৌন্দর্যের বেশে তাঁর কাছে ধরা দিবেন। "জীবন-পোড়ানো সে হোম-অনল সেদিন কি হবে সহসা সফল" ইত্যাদি পরিণাম-কল্পনা 'এবার ফিরাও মোরে'র শেষাংশের সঙ্গে তুলনীয়। কবি কল্পনা করছেন, যে-সৌন্দর্যময়ী এতকাল পর্যন্ত তাঁকে বিহ্বল করেছে তিনিই সম্ভবতঃ তাঁর কাছে প্রতিভাত হবেন। এখানে কবি তাঁর ঐ কল্পিত-সৌন্দর্যের আদর্শেই জীবনদেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করছেন—

অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণবসন অঙ্গে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।

বোঝা যায়, চিত্রাকাব্যে কবির সৌন্দর্যবোধেও একটা পরিপূর্ণতা এসেছিল ব'লেই পরিণামে জীবনদেবতার কল্পিত রূপেও কবি ঐ পূর্ণসৌন্দর্যের আদর্শ দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ঐ সৌন্দর্যমূর্তির পূর্ণতাবোধ জীবনদেবতাবোধে আংশিক ভাবে প্রেরণা দিয়েছে। এ সম্পর্কে বহু পরে লেখা চিত্রার ভূমিকায় (রচনাবলী দ্রঃ) কবি

ইঙ্গিত দিয়েছেন। জগতের মধ্যে যিনি বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত, কবির অন্তরে তিনি একটি সৌন্দর্যময় সত্তারূপে সর্বদা পরিলক্ষিত হচ্ছেন—এই ধারণাকে কবি যুগ্ম-সত্তার প্রকাশ ব'লে অভিহিত করেছেন এবং অন্তরশায়ী একক সৌন্দর্যমূর্তি জীবনদেবতার সঙ্গে যুক্ত, এ কথাও আভাসে ব্যক্ত করেছেন। দেখা যায়, সৌন্দর্যের aesthetic মূর্তির intellectual বা আদর্শ মূর্তিতে রূপান্তর ঘটছে। জীবনদেবতার সঙ্গে এই সৌন্দর্য-মূর্তিরই যোগ। 'অন্তর্যামী'র মধ্যেও তাই নারীরূপে জীবনদেবতাকে দেখার প্রয়াস লক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি পূর্বেকার সৌন্দর্যের কবিতার কোনো কোনো স্থানের সঙ্গে এক—

মরণনিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি।

এর সঙ্গে তুলনীয় 'মানসসুন্দরী'র—

এস প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহো টানি ; শোয়াও যতনে
মরণসুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতিশয়নে।

কিন্তু তাই ব'লে 'মানসসুন্দরী' বা 'চিত্রা' কবিতার কেবল সৌন্দর্য-মূর্তিকে জীবনদেবতা আখ্যায় অভিহিত করা অবিধেয়। তাহ'লে কবির সৌন্দর্যানুভূতিরও যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না, আবার জীবন-দেবতাকেও একদেশদর্শিতার দ্বারা বোঝবার চেষ্টা করা হয়। বস্তুতঃ জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে জড়িত, এবং এই বিকাশ কেবল সৌন্দর্য-উপলব্ধির পূর্ণতাতেই নয়, মানব-প্রীতির চরিতার্থতায়, জীবনবোধেও। 'এবার ফিরাও মোরে'র পূর্বে

লেখা কোনো কবিতাতেই এই জীবনবোধের পরিচয় নেই, সৌন্দর্য-অনুভূতি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে তো বাস্তব জীবনবোধের প্রসঙ্গও নেই। 'মানসসুন্দরী'র—

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ইত্যাদিতে কবি ঐ সৌন্দর্যসত্তারই অপ্রতিহত প্রভাব ব্যক্ত করতে চাইছেন, সমগ্র ব্যক্তিসত্তার কথা বলছেন না। এই অংশের অব্যবহিত পূর্বেই তৎকালে ক্ষীণভাবে উপলব্ধ বাস্তবজীবনাশ্রিত এই অন্তর্যামীর সঙ্গে সৌন্দর্যের ঐ নারীমূর্তির পার্থক্যও কবি নির্দেশ করছেন—

যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্লপথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম-অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে
আমার অন্তরগৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,

'সোনার তরী'র বিদেশিনী মাঝিও জীবনদেবতা ব'লে উপলক্ষিত হতে পারে না, কারণ তার সঙ্গে কবির যে সম্পর্ক তা অপরিচিতের রহস্যময় সম্পর্ক। তার আবির্ভাব মেঘমেদুর কুহেলিকাময় একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। ঐ কবিতাটির শেষের তীব্র বিরহ যে কল্পিত সৌন্দর্যবিরহ তা মেঘদূত, নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। সৌন্দর্য-প্রেরণামূলক কবিতা-গুলির সঙ্গে জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতাগুলির কাব্যরসের দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবিতার মধ্যে রোম্যান্টিক

কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে বিগুমান। জীবনদেবতা তেমন উৎকৃষ্ট কাব্যরসের অধিকার পায় নি, কারণ জীবনদেবতা প্রায় কবি-ব্যক্তিত্বের ইতিবৃত্ত মাত্র।

কবির অন্তরস্থ এই যে শক্তি কবির বহুমুখী বিকাশের কারণ, তাকে 'কবির আমি' নাম দেওয়া যেতে পারে। এই অহং-এর স্বরূপ কী, তার যথার্থ স্থিতি আছে কি না, জন্মে জন্মে কবিকে তিনি বিচিত্র পথে কী ভাবে চালাবেন, এ জন্মেই বা তার কার্য কী, এ-সম্পর্কে তার্কিক মনে নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হতে পারে। এইজন্যে কবি এই শ্রেণীর কবিতাকে 'মেটাফিজিক্যাল' কবিতা বলেছেন। মোট কথা, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের মূলে কবির একালের যে সচেতন বিস্ময়বোধ, পথে চলার অবস্থায় একবার নিজের দিকে ফিরে তাকানো, তা থেকেই জীবনদেবতার উৎপত্তি। চিত্রার পর্যায়ে কবির বিভিন্নমুখী কল্পনার বিকাশ অতি দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল। এই বিকাশকে লক্ষ্য ক'রে কবি পরবর্তীকালে জীবনদেবতার আলোচনায় বলেছেন—

> "আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশঃ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,—আমার সুখদুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আবরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।"

ঐখানেই আত্ম-সমালোচক বলছেন যে তিনি তাঁর অদ্ভুত বিশ্বাত্ম-বোধের স্মৃতির বাহকরূপে জীবনদেবতাকে প্রত্যক্ষ করছেন—

> "অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন,—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

কবির যে-আত্মশক্তি এবংবিধ বিকাশের পথে কবিকে নিয়ে যাচ্ছে, নানা বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে কল্পিত একটি অখণ্ড পরিণতির পথে চালনা করছে, বলা বাহুল্য, তার সম্পর্কে সচেতনতা, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে সচেতনতা নয়। এই অন্তর্যামী কবির চিত্তের সঙ্গে অরূপলীলার যোগস্থাপন করতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর নন, না দ্বৈত, না অদ্বৈত। কবির এই সময়কার আত্মবোধপরায়ণ চিত্ত কী অপূর্ব বিস্ময়সহকারে তাঁর অন্তরস্থিত আত্মশক্তি, দম্ভমুক্ত অহং বা creative personalityকে নিরীক্ষণ করেছেন! 'অন্তর্যামী' কবিতাটি আগাগোড়া এই বিস্ময়াবেগেই স্পন্দিত। 'জীবনদেবতা'য় কবি এই শক্তিকে অনুরাগের চক্ষে দেখেছেন, তার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে একটা সান্ত্বনা অনুভব করেছেন। এই সম্পর্ক (বঁধু, প্রাণেশ, জীবননাথ প্রভৃতি) নিছক কবিকল্পনা মাত্র। এই সম্পর্কের যাথার্থ্য আবিষ্কার করতে যাওয়া ভ্রমাত্মক। ভাবটা কী তা কবি তাঁর আলোচনাতেই বিন্যস্ত করেছেন—

> "মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপরে যে প্রেম যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?"

এই বৈষ্ণবীয় মাধুর্য-আরোপিত সম্পর্কই জীবনদেবতা কবিতার তত্ত্বকে যা-কিছু কাব্যলক্ষণাক্রান্ত করেছে। এই কবিতাটির মধ্যে খোঁজ করলে যে উপরিউক্ত আত্মশক্তি-সচেতনতার তত্ত্বগুলি না পাওয়া যেতে পারে তা নয়—কিন্তু এই কবিতাটির প্রণয়সম্পর্ক-কল্পনার কাছে তত্ত্ব একান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে।

দেখতে হবে, কবি নিজে জীবনদেবতার উপর ঈশ্বরতত্ত্ব আরোপ করেন নি এবং কাব্যেও কুত্রাপি এমন কথা বলেন নি যে যিনি তাঁর বিচিত্র আত্মবিকাশের মূলে তিনিই বিশ্বের সর্বত্রব্যাপী, এবং সর্বভূতে বিদ্যমান (আত্মপরিচয়, ১ ও ৩সং প্রবন্ধ দ্রঃ)। ঈশ্বর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ('অরূপ' বলাই সংগত) তাঁর সহজ উপলব্ধির সূত্রে নির্দিষ্ট এক সময়ে এসেছে। কবি মর্ত-উপলব্ধি এবং জীবনবোধের এই স্তর উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শকে গ্রহণ করার পর প্রকৃতি-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অরূপের লীলার সঙ্গে আত্মার মিলন অনুভব করেছেন। শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও নৈবেদ্য-রচনায় ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয়। চৈতালি কাব্যে কালিদাসের সাহিত্যাদর্শের প্রেরণা তাঁর চিত্তে কাব্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই একটি আদর্শবোধও জাগিয়ে তুলেছিল। সম্ভবতঃ এই আদর্শবোধের প্রেরণায় কবি এই সময়ে উপনিষদের মধ্যে যথার্থভাবে প্রবেশ করেন। নৈবেদ্য কাব্যে কবির অরূপবোধ বহুল পরিমাণে এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু এ কথা বলা অসংগত হবে না যে নৈবেদ্যের অব্যবহিত পরের উৎসর্গ ও খেয়া থেকেই অরূপ সম্পর্কে অনুভূতির আরম্ভ হয়েছে। যাই হোক, নির্দিষ্ট উপলব্ধির একটা সূত্র অনুসারে যেখানে অরূপ-লীলার আবির্ভাব তার পূর্বে অরূপ (বা ঈশ্বর)-কে স্থাপন করলে এই মহাকবির প্রতিভা ও সাধনা সম্পর্কে বিশ্বাস হারাতে হয় এবং সাধারণের মতই মনে করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে শুধু উপনিষদের অনুকরণ করেছেন। কবির আত্মবিকাশের এই অনন্য স্বকীয়তার নিয়ম মেনে নিলে তাঁর উপলব্ধ 'অরূপ' সম্পর্কে 'ঈশ্বর' শব্দটির প্রয়োগ থেকেও নিবৃত্ত হতে হয়। অবশ্য দার্শনিক বিচারে

কবির উপলব্ধ এই অরূপ দ্বৈত কি অদ্বৈত সে-সকল তর্কের সমাধানের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আগে থেকেই ঈশ্বর ব'লে গ্রহণ ও ঐ নামে অভিহিত করলে স্বকপোলকল্পিত কোনো ধারণার, বিশেষতঃ বৈষ্ণবীয় ভগবানের ধারণারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অথচ রবীন্দ্রনাথ আর যাই হোন, আত্মবিলোপময় জীবনবর্জিত বৈষ্ণব ভাবসাধনার পক্ষপাতী যে ছিলেন না একথা অনুরাগী পাঠক অনুভব করতে পারবেন।

চিত্রা কাব্যে আর দুটি কবিতায় কবি জীবনদেবতাকে লক্ষ্য করেছেন, একটি 'সাধনা', অপরটি 'সিন্ধুপারে'। প্রথমটিতে এই কর্ত্রী-শক্তির কাছে তাঁর জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে জন্মান্তরেও কবি এঁকে কী ভাবে লাভ করবেন তার অপ্রাকৃতরসচিত্র অঙ্কন করেছেন।

চিত্রা পর্যায়ের পর যখন কবির প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের পথে চলল তখন স্বাভাবিকভাবে এই জীবনদেবতাকে বা অহংকে পুনর্নিরীক্ষণের আবশ্যকতা রইল না। কারণ, নব জীবনবোধের মুখে বিকাশের প্রারম্ভেই যা কিছু বিস্ময়। অবশ্য এর পর চৈতালি কাব্যে একবার এবং কল্পনাতে একবার কবি বাস্তব কর্মপ্রেরণার মধ্যে এই শক্তিকে স্মরণ করেছেন। চৈতালির নিম্নলিখিত কবিতাটিতে পল্লীপ্রকৃতি থেকে নগরে কর্মের আহ্বানে যাওয়ার পূর্বে কবি বলছেন—

কাল আমি তরী খুলি লোকালয় মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে,—
হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়োনা আমারে,
যেয়োনা একেলা ফেলি জনতাপাথারে
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্ব ঝঞ্জনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়

এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি যবে রক্ত টেনে আনে
তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে মম।

কল্পনার 'অশেষ' কবিতাটিতেও ঠিক এই কর্মবৈরাগ্য থেকে অনিচ্ছা-সহকারে কর্মের মধ্যে যাওয়ার মুখে কবি জীবনদেবতার আহ্বান অনুভব করছেন—

শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে ;

* * *

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।

কবির অরূপানুভূতির পর বলাকা-পূরবী পর্যায়ে যেখানে অরূপবোধ ও জীবনবোধ মিশ্রিত হয়ে গেছে সেখানে বিশ্বলীলার মাধ্যমেই তিনি কোথাও কোথাও আত্মজীবনলীলা অনুভব করেছেন। বলাকার বিশ্বগতলীলা অরূপেরই বিশ্বগত অভিব্যক্তি মাত্র। সেখানে অরূপ-সাধনায় সিদ্ধ কবি কোনো কালেই অপ্রৌঢ়ভাবে কেবল আত্মগত জীবনলীলাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। এই জন্য জীবনদেবতা সম্পর্কিত বিস্ময় চিত্রার পর আর কোনো কালেই উপলব্ধ হবার অবকাশ পায়নি। বলাকায় 'নেয়ে'র বেশ ধ'রে কবির নিকটে যিনি অভিসার করেছেন তিনি কায়মনোবাক্যে কবির উপলব্ধ অরূপ। পূরবীর 'লীলাসঙ্গিনী' কবির কল্পিত সহচরী,—যিনি পার্থিব রসের সঙ্গে

কবির অন্তরের যোগস্থাপন করেন। ঐ কবিতায় একালের 'মানসসুন্দরী'ই একটু ভিন্নরূপে বিদায়ের অনুভূতির মধ্যে কবির স্মরণপথে এসেছেন। আর পূরবীর 'আহ্বান' কবিতায় বহির্জগতে উপলব্ধ এককে কবি নিজ অন্তরে এনে সমগ্রভাবে পরিচিত হবার বাসনা করেছেন এবং অসমাপ্ত পরিচয়ের জন্যে আক্ষেপ করেছেন। এগুলির কোনোটিই জীবনদেবতা ব'লে গৃহীত হতে পারে না।

জীবনদেবতা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলির সারসংক্ষেপ করছি : এই শক্তি ঈশ্বর নন, সৌন্দর্যমূর্তিও নন, কবির আত্মশক্তি মাত্র। অপূর্ব বিস্ময়াবেগের সঙ্গে চিত্রার পর্যায়েই এ-শক্তি কবির গোচর হয়েছিল, তার পূর্বে নয়। তৎকালীন নূতন জীবনবোধের সঙ্গেই ইনি যুক্ত এবং পরবর্তী কালে ঈশ্বর-উপলব্ধির পর এঁর পুনরাবির্ভাব ঘটেনি। চিত্রা রচনার পর্যায়ে কবির কাব্যরচনায়, সৌন্দর্যবোধে, সর্বোপরি বাস্তব-জীবনবোধে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্পর্কে কবিমানসে যে সচেতনতা এসেছিল তা-ই কবিকে আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন করে। এই সচেতনতার ফলেই আত্মশক্তির ক্রিয়ার বর্ণনা এবং তার সম্পর্কে অনুরাগের সংক্ষিপ্ত পালা।

চিত্রার পর্যায়ে এই নবোদিত জীবনবোধ কবির অন্তরকে কী পরিমাণ বিচলিত করেছিল তা একালে রচিত 'মালিনী' নাটকেও পরিস্ফুট হয়েছে। রাজদুহিতা মালিনী পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস ও প্রথার জালে আবদ্ধ; সে মানবধর্ম-বিহীন রাজকুলে আপনাকে নির্বাসিত মনে করছে। মুক্তির সংগীত কর্ণগোচর হওয়ার পর মানবসম্পর্কশূন্য রাজকুল সে কী ভাবে ত্যাগ করলে, তার মুক্তিমন্ত্র কীভাবে ব্রাহ্মণকুমার সুপ্রিয়কে অনুপ্রাণিত ক'রে গৃহত্যাগী করালে, সুপ্রিয়ের বিরুদ্ধবাদী

ক্ষেমংকরই বা কী প্রকারে এই নূতন মানবধর্মের বিপক্ষে সংগ্রাম করলে এবং পরিশেষে দুঃখসমাকীর্ণ পথে চলার পর সুপ্রিয়ের আত্মত্যাগের মধ্যে কল্যাণময় মানবীয় আদর্শের কী প্রকারে জয় হ'ল তা এই নাটিকাটির বিষয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার কল্পনাময় আত্মজীবন থেকে বিশ্ব-জীবনের মধ্যে নিষ্ক্রমণ, নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমাকে অন্তরে রেখে অকাতরে জীবনবিসর্জন প্রভৃতি কল্পনা এই নাটকে কতকটা বাস্তব আকারে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। বস্তুতঃ 'মালিনী' নাটক ভাবের দিক থেকে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার বিস্তৃত রূপ মাত্র। সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করবেন, ঐ কবিতার—

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির বাস্তব জীবন-চেতনার সঙ্গে রাজধানীর স্বার্থবাসনা-কলুষিত জীবন থেকে রাজকুমারীর মুক্তির আগ্রহের পরিচায়ক নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি একান্তভাবে তুলনীয়—

জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে
রাজকন্যা আমি—কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহিনি বাহিরে; দেখি নাই এ-সংসার
বৃহৎ বিপুল,—কোথায় কী ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।

মালিনীর ও তার ভাবাদর্শের প্রেরণায় সুপ্রিয় যে মানবীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির "শুধু জানি, সে

বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান” প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তা একান্তভাবে তুলনার যোগ্য—

স্বর্গ আছে কোন্ দূরে
কোথায় দেবতা,—কেবা সে সংবাদ জানে।
শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়—
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে।

কল্পনামূলক মর্তপ্রীতি থেকে এই পর্যায়ে বাস্তবতামূলক মানবপ্রীতিতে কবি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই জীবনবোধ পরবর্তী কালে কবির অরূপ-অনুভূতিকে কী ভাবে রূপান্তরিত ও পূর্ণতাদান করেছিল তা আমরা যথাসময়ে লক্ষ্য করব।

প্রতিভার বিকাশ

দ্বিতীয় পর্যায়

'চৈতালি' থেকে 'নৈবেদ্য'

(কালিদাস—সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ—ভারতীয় ভাবাদর্শ—উপনিষদ)

চিত্রার সৌন্দর্য-উচ্ছ্বাস, বাস্তবজীবনবোধ ও বিস্ময়াবহ আত্ম-নিরীক্ষণের প্রগল্‌ভতার পর কিছুকালের জন্যে একটা প্রশান্তি ও বিরাম লক্ষ্য করা যায়। চৈতালির সনেটকল্প রচনাগুলি এই সময়ের। কিন্তু চৈতালি যে একেবারে চুপ ক'রে আছে তা নয়। এখানে একদিকে কবি পুরাতন মর্তপ্রীতি ও মানবপ্রীতির পুনরাস্বাদন করছেন আর একদিকে কালিদাসের আদর্শে নূতন প্রকৃতি-আত্মীয়তা গ'ড়ে তুলছেন, এবং এখন থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় জীবনাদর্শে প্রবেশ করছেন। এই আদর্শকে এক কথায় তপোবনাদর্শ বলা যেতে পারে। দেখা যায়, নৈবেদ্য রচনার সমসাময়িক আনুমানিক তিন বৎসরের মধ্যে কবির সাহিত্যাদর্শ ও জীবনাদর্শে একটা পরিবর্তন এসেছে। সেইজন্য চৈতালি রচনার কাল ১৩০২—৩ কে বাহ্যতঃ বর্ণচ্ছটাবিরল অপ্রমত্ত বিরামের যুগ ব'লে মনে হ'লেও অভ্যন্তরে প্রস্তুতির বিরাম ছিল না।

চৈতালির গোড়ার দিকের চোদ্দচরণের দেবতার বিদায় (দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত-প্রবীণ'), পুণ্যের হিসাব (—'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পুজা'), বৈরাগ্য ('কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী'), দুর্লভ জন্ম প্রভৃতি কয়েকটি রচনায় মর্ত ও মানবপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কবির তত্ত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। যদিচ প্রতিভার

উন্মেষেই কবির এই দৃঢ় ধারণার উৎপত্তি, তথাপি এই ধারণা ক্রমশঃ গভীরতর হয়েছে, এবং পরে কবি কুত্রাপি মানবানুরাগ বা মানব-জীবনবোধ থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পান নি, সীমার এবং বিশেষ ক'রে মানবের মধ্যেই তাঁর অরূপ-দর্শনের সম্যক সমাধান করেছেন।

এই অংশের 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটিতে কবির পুরাতন অথচ বারে বারে আবর্তিত প্রকৃতি-প্রীতিরসের অনির্বচনীয় স্বাদ অনুভব করা যায়—

আমি যেন মিলে গেছি সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে,—ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

প্রকৃতির সঙ্গে এই জন্মান্তরীণ নিবিড় ঐক্যানুভূতিই কবির অনন্য-সাধারণতা। এই স্মৃতির বাহকরূপেই তিনি তাঁর 'অন্তর্যামী'কে পূর্বে দেখেছেন। তাঁর কাব্যজীবনের এই আদিম উপলব্ধিটি শুধু তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রতিভার তথা ধর্মবোধের নিয়ামকরূপেই নয়, বারে বারে নানা আকারে ধুয়ার মত তাঁর কাব্যজীবনে দেখা দিয়েছে। সোনার তরী ও চিত্রায় কবির যে সৌন্দর্য-উপলব্ধি তা স্বতন্ত্র পরিণামে আবদ্ধ। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ ও পরিণামে ঐ সৌন্দর্যবোধ অবিকৃতভাবে পুনরা-বির্ভূত হয়নি, সৌন্দর্যের অন্তর্বর্তী সুদূরের ব্যাকুলতা অরূপের

ব্যাকুলতায় রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে; কিন্তু মর্ত-উপলব্ধি ও মানব-জীবনানুরাগ কবির অরূপানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে শেষে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে গেছে।

প্রকৃতি-পর্যায়ের কবিতার মোটামুটি দুটো রূপ আমরা কবিদের কাব্যে লক্ষ্য করি। একটাতে প্রকৃতি দূরে থেকে মানুষের হৃদয়ে ব্যাকুলতার সঞ্চার করে, কখনো তার শান্ত সৌম্য প্রভাব দ্বারা মানুষকে মণ্ডিত করতে চায়, অথবা অনির্দেশ্য ভাবে বিহ্বল ক'রে মানুষের চিত্তে অনন্তের আভাস এনে দেয় এবং ঐহিকতামুক্ত করে। তখন প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থান করে না, প্রেরণাবিশেষের জনক হয়ে পড়ে। আর একটাতে গাছপালা, জীবজন্তু স্বরূপে অবস্থান ক'রেই মানুষের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় রূপে প্রকৃতি এবং মানুষ একই বিশ্বসৃষ্টিলীলার বিভিন্ন অংশ, এবং প্রকৃতি জড় বা অচেতন নয়, তা মানুষেরই মত জীবনময়। মানুষের কাজ হ'ল এই মূক অথচ প্রাণবান্, বিচিত্র ও বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে আত্মিক মিলন সাধন করা। একটাতে বিহ্বল ভাবাবেশে প্রকৃতিকে প্রাণময় মনে করা, আর একটাতে স্বতঃসিদ্ধ সত্যহিসাবে এর জীবনময়তা গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হওয়া। এর প্রথমটি মোটামুটি পাশ্চাত্য এবং দ্বিতীয়টি মোটামুটি প্রাচ্য আদর্শ ব'লে অভিহিত করলে অসংগত হবে না। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে যদিও রোম্যানটিক প্রকৃতি-ব্যাকুলতা এবং প্রকৃতি-আত্মীয়তা এই দুই ভাবেরই অবস্থান দেখা যায় তথাপি তাঁর পরিণত প্রতিভা রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলে দ্বিতীয় ভাবটিতেই বিশেষভাবে স্বাক্ষর দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এই দুই ভাবাদর্শের সমন্বয় দেখা গেলেও নিসর্গের সঙ্গে জন্মান্তরীণ নিবিড় ঐক্য উপলব্ধিই তাঁর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। যে-অভিনব কল্পনার বলে

কবির এই একান্ত স্বকীয় উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে তা ইংরেজি রোম্যান্টিক কবিদের কল্পনার সগোত্র হ'লেও তার পরিণামরূপ বিশ্বাত্মবোধ এবং অরূপানুভূতি রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক মনোভাব থেকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন এবং যেন রোম্যান্টিক স্বভাবের স্বাভাবিক পরিণামকে লাভ করতে পেরেছেন। প্রকৃতি-ব্যাকুলতা থেকে উৎপন্ন সুদূর ও অরূপের প্রতি আকর্ষণ এই স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবুক কবির মধ্যে অত্যন্ত সহজে ঘটেছে এবং তা ভারতীয় সাধকদের মতই ব্যাপকভাবে কবির চিত্তকে অধিকার করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবল ও পরিণামধর্মী রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অথবা কালিদাসাদি সংস্কৃত কবি থেকে সংক্রমিত, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কবি তাঁর প্রথম যৌবনে যেমন ইংরেজি সাহিত্য তেমনি কালিদাসের কাব্যনাটক ও বাণভট্টের কাদম্বরী কাব্যানুরাগবশতই গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বাল্যে তাঁর পরিবারে যে সাহিত্যিক হাওয়া বইত তার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুই ভাবেরই মিলন ছিল। ঐ সময় শিক্ষার জন্যেই কুমারসম্ভব, শকুন্তলা এবং সম্ভবতঃ উত্তররামচরিত কিছু কিছু পড়েছিলেন। যাই হোক, এই সকল প্রভাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই 'স্বপনমূরতি গোপনচারী' কবি-প্রতিভার দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি এবং রবীন্দ্রনাথে যা ঘটেছে তা অনির্ণেয় প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া ব'লে নির্দেশ করেছি। কিন্তু তাঁর স্বধর্মের অনুকূলে যদি কোনো সাহিত্যাদর্শ, কোনো রূপভঙ্গি ও ভাবাদর্শ তাঁর প্রতিভায় গৃহীত হয়েছে ব'লে ধরতে পারা যায় তা এই সময়। এই সময় যেমন কালিদাসের তপোবনাদর্শ, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষাশিল্প, অর্বাচীন সংস্কৃত

কবিদের ক্ষণিকতাবিলাস প্রভৃতি কবির চিত্তকে অধিকার করেছে। কালিদাসের কাব্য থেকে প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগী হয়ে এই সময়ে স্বাভাবিকভাবে উপনিষদের মধ্যেও কবি প্রবেশ করেছেন।

সহজ অনুরাগের বশে কালিদাসের কাব্যপাঠের প্রথম পরিচয় আমরা পাচ্ছি ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠে। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির একটি চিঠিতে রয়েছে—'এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টিদুর্যোগে রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় ক'রে দীর্ঘ অপরাহ্ণ সেইটি সুর ক'রে ক'রে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপর ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি।' আবার ৮ই শ্রাবণ, ১৩০০ এর লেখা একটি চিঠিতে বলছেন, 'কাদম্বরী অল্প অল্প ক'রে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েছে—আরো ততগুলো পাত বাকি আছে।' এই অধ্যয়নের ফলরূপে আমরা মেঘদূত, প্রেমের অভিষেক, উর্বশী, বিজয়িনী, আবেদন প্রভৃতি কবিতার প্রাচীন-ধর্মী সৌন্দর্যচিত্র পাচ্ছি। বস্তু এবং রূপ উভয়ের একান্ত সম্মিলনে এই কবিতাগুলি বহুল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম বহন ক'রে চলেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের রাজ্যে পরিভ্রমণ এবং সাহিত্যধর্মের অলক্ষিত অথচ ধ্রুব অনুসরণ সম্বন্ধে একটু পরেই আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। 'চৈতালি'তে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ কালিদাস সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যে তাঁর কাব্যগৌরব এবং তপোবনাদর্শের মহিমা কীর্তন করছেন। সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রথম দেখা গেল। প্রাচীন ভারতবর্ষের কবি-প্রতিনিধি কালিদাসের কাব্যেই আধুনিক কবি শাশ্বত ভারতকে দেখতে পেলেন। বস্তুতঃ কালিদাসই প্রকৃতি

আত্মীয়তামূলক তপোবনাদর্শের সর্বপ্রথম কবি। কালিদাসের পরিণত বয়সের তিনটি রচনায়—কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে তপোবন-প্রকৃতির এবং তার সঙ্গে মানুষের সুনিবিড় আত্মীয়তা সম্পর্কের যে পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তা বাল্মীকির রামায়ণেও নেই। কালিদাসের পরবর্তীকালে বাণভট্ট ও ভবভূতি কালিদাসের প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি কবির অনুরাগ মূলতঃ কালিদাসের কাব্য ও নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত একথা বলা যায়। কবির এই অনুরাগ যে কাব্য থেকেই সংক্রামিত, তত্ত্ব বা ধর্মপ্রণালী থেকে নয়, তার বাহ্য প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে পাওয়া যেতে পারে—

> 'আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।' (আত্মপরিচয়—৬ সংখ্যক প্রবন্ধ)।

ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ও কালিদাসের সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি তাঁর 'The Message of the Forest' প্রবন্ধে বলছেন—"When Vikramaditya became king, Ujjayini a great capital, and Kalidasa its poet, the age of India's forest retreats had passed. Then we had taken our stand in the midst of the great concourse of humanity. The Chinese and the Hun, the Scythian and the Persian, the Greek and the Roman, had crowded round us. But, even in that age of pomp and prosperity, the love and reverence with which its poet sang about the hermitage shows what was the

dominant ideal that occupied the mind of India ; what was the one current of memory that continually flowed through her life."

কালিদাস কেন তাঁর কাব্যে তপোবনকে প্রধান স্থান দিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে এবং তা থেকে এই অনুমানও অসংগত নয় যে কবি স্বয়ং ঐ জীবনাদর্শের অনুরাগী। ভোগ থেকে ত্যাগের, জনকোলাহলময় রাজধানী থেকে নির্জন তপোবনের মাধুর্য ও মহত্ত্ব কালিদাসের উপরিউক্ত তিনটি কাব্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই মনোভাব যখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিখ্যাত 'সভ্যতার প্রতি' কবিতাটিতে আবেগ সহকারে প্রকাশ করলেন—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর ;
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা ; হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি —ইত্যাদি

অথবা, 'বন' কবিতায় আরণ্যজীবনের মহিমা বর্ণনা করলেন—

শ্যামল সুন্দর সৌম্য হে অরণ্যভূমি
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
* * *
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সবল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুলফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা ;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র * *

এবং তপোবন, প্রাচীন ভারত প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় তপোবনাদর্শের প্রতি যখন অনুরাগ জ্ঞাপন করলেন, তখন আর সংশয় থাকে না যে ইতিপূর্বে সংস্কৃত সাহিত্য (মূলতঃ কালিদাস) কবির কাব্যবস্তুর আধার ও কায়া বা formরূপে বর্তমান থাকলেও একমাত্র চৈতালির কালেই কবি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনাদর্শের অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। এখন থেকে পাঁচ ছয় বৎসর ধ'রে ভারতীয় সাহিত্যের ও জীবনাদর্শের প্রতি কবির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে এবং নৈবেদ্য-রচনার সমসাময়িক কালে উপনিষদের ধর্মাদর্শের দ্বারা যখন কবি অনুপ্রাণিত হয়েছেন তখনই এই অনুরাগের চরমতা লক্ষিত হয়েছে। কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে চৈতালির এই তপোবনাদর্শ-বর্ণনার প্রতি-ছত্রে গোপনে কালিদাসের তপোবনই প্রকাশিত হচ্ছে।

এ ছাড়া চৈতালির আরো দুটি বৈশিষ্ট্য থেকে কালিদাসের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। এক হ'ল কবির কালিদাস ও তাঁর কাব্যের প্রশস্তিমূলক কয়েকটি কবিতা রচনা, আর এক, কয়েকটি কবিতায় মূক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা-সম্পর্ক ঘোষণা। পাঠক লক্ষ্য করবেন, ১৩০৩এর শ্রাবণ মাসের মধ্যেই এই ধরণের প্রায় সব ক'টি কবিতা লেখা হয়েছিল। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে ঋতুসংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, এবং শকুন্তলা কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। রঘুবংশ সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বিশেষ দেখা যায় না। পরবর্তীকালে কবি বিশ্বলীলায় যে রুদ্রের রূপ কল্পনা করেছিলেন তাতে কুমারসম্ভবের মহাদেবের ছায়া অল্পাধিক পরিমাণে পতিত হয়েছে একথা বলা যায়। কালিদাস ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে কবির মুগ্ধহৃদয়ের বিভিন্ন উক্তি থেকে উভয়ের কাব্যাদর্শের অন্ততঃ

আংশিক সাজাত্যও অনুমেয়। যেমন বলা যেতে পারে যে 'কাব্য' শীর্ষক কবিতায় বিবৃত কালিদাস-কাব্যের বাস্তবোত্তর আনন্দময়তা ও নির্লিপ্ততা রবীন্দ্রকাব্যেরও লক্ষণ—

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরই মত
* * *
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল —ইত্যাদি

তা ছাড়া এই কবিতাগুলিতে কালিদাসের কবি-গৌরব, তাঁর প্রতি আধুনিক মহাকবির গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর উদার কল্পনার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ করে। যেমন 'কালিদাসের প্রতি' কবিতায়—

সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে,

প্রভৃতি অংশে মেঘদূতের একটি বিশিষ্ট কল্পনার প্রতি কবির অনুরাগ প্রকটিত হয়েছে, আর—

কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন উমা তব চূড়া'পরে

এর মর্ম বুঝতে গেলে 'জ্যোতির্লেখাবলয়িগলিতং যস্য বর্হং ভবানী পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি' এই অংশের বাৎসল্য-রসানুপ্রাণিত সৌন্দর্য অবগত হতে হয়।

চৈতালি কাব্যের উল্লেখযোগ্য বিশেষ ধর্ম হ'ল ইতর প্রাণী ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে কবির আত্মীয়তা স্থাপন। 'সোনার তরী'র যুগের

প্রকৃতি বা মর্ত-ব্যাকুলতা থেকে এই ভাবানুভূতি অবশ্যই কিছু স্বতন্ত্র। পূর্বে যদিচ অতিপ্রবল ও সুদূরপ্রসারী রোম্যান্টিক চেতনায় কবি প্রকৃতির সকল বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা কল্পনা করেছেন, অধুনা স্থির অনুরাগ-সঞ্জাত আত্মীয়বুদ্ধিতেই নিকটবর্তী প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছেন। লক্ষ্য করতে হবে এই মধুর আত্মীয়তার মধ্যে বাহ্য পার্থক্যের ভাব বিদ্যমান ('বসুন্ধরা' প্রমুখ কবিতায় ও 'ছিন্নপত্রে' বর্ণিত কাল্পনিক একাত্মতা নয়), এবং এখানে মানুষী আদান-প্রদান সম্পর্কও অপ্রধান নয়,—ঠিক কালিদাসের প্রকৃতি-আত্মীয়তায় যা দেখা গেছে। 'হৃদয়ধর্ম' কবিতাটিতে এই মধুর-করুণ আত্মীয়সম্পর্ক সবিশেষ পরিস্ফুট—

> হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
> জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
> মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
> সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।
> মধ্যদিনে দগ্ধদেহে ঝাঁপ দিয়ে নীরে
> 'মা' বলে সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
> যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
> সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।
> সে সকল তরুলতা রচি উপবন
> গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে তারা ভাইবোন।
> যে পশুরে জন্ম হতে আপনার জানি,
> হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুরাণী।

'মিলনদৃশ্য' কবিতায় শকুন্তলা-বিদায়ের 'তরুলতা পশুপক্ষী, নদনদী, বন নরনারী সবে মিলি করুণমিলন' বর্ণিত হয়েছে। এইরূপে কালিদাসের

কবি-প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির প্রবল সাধর্ম্য একালে দেখা যায়।

প্রকারে স্বতন্ত্র হ'লেও কবির এই মনোভাবকে পূর্বদৃষ্ট ভাববিহ্বলতার একটি পরিণামী দিক ব'লে মনে করতে হবে এবং তখন থেকে এখন পর্যন্ত, জন্মান্তরীণ ব্যাকুলতা থেকে নিবিড় আত্মীয়বোধ পর্যন্ত কালিদাসের আন্তরধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যও লক্ষ্য করতে হবে। প্রকৃতি-সম্পর্কের বিবর্তন ঋতুসংহার থেকে অভিজ্ঞান-শকুন্তল পর্যন্ত কালিদাসে যেমন ভাবে ঘটেছে রবীন্দ্রনাথেও ঠিক তেমনি ভাবেই ঘটেছে। এই বিবর্তনের ইতিহাস—ভাববিহ্বল অনুরাগ এবং জীবনসম্পর্কজাত প্রীতির সম্মিলন, এ দুয়ের একটি থেকে অপরটিতে সংক্রমণের দিক কবি তাঁর 'দুই বন্ধু' কবিতাটিতে বর্ণনা করেছেন—

মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক হৃদয়,
তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়!
কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে-হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পদচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
সেদিনের আত্মীয়তা গেছে বহু দূরে ;—
তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে
পরানে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বস্মৃতি,
অন্তরে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি·········

কালিদাসের যৌবনের রচনা 'ঋতুসংহারে' প্রকৃতি মানুষের চিত্তে উৎকণ্ঠা জাগানোর সহায়ক মাত্র। বিক্রমোর্বশীয় এবং মেঘদূতে এই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেয়ে বিরহ-ব্যাকুলতার রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তার

পর কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও শকুন্তলায় ধীরে ধীরে গভীরতম আত্মীয় সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৩০২-৩ সাল থেকে ১৩০৯-১০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যজীবনে প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের অনুশীলন ও অনুসরণের কাল। এই সময়ের যাবতীয় গদ্যপদ্য-রচনায় কবি যেন ভাবানুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন বা আধুনিক যা কিছু স্বদেশীয় তার প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধায় অন্তর পূর্ণ করে তুলছেন। এই সময়ে কালিদাসের কাব্যের প্রতি অনুরাগ, সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা, ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত, উগ্র জাতীয় উদ্দীপনায় বিলাতি-অনুকরণের কঠোর সমালোচনা, ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলির রচনা ও বক্তৃতা, সংস্কৃত সাহিত্যের বস্তু ও রূপের নিগূঢ় অনুসরণ, তপোবনাদর্শের জয়গান, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য-সাহিত্য, দেশীয় যাত্রাগান ও বাউল-সংগীতের প্রতি নিষ্ঠা, এবং ছাত্রদের জন্য 'সংস্কৃতশিক্ষা' পুস্তক-প্রণয়ন। পাঠকদের বিবেচনার জন্য একালের প্রধান রচনাগুলির একটা মোটামুটি তালিকা আমরা দিচ্ছি, এর থেকে কবির জাতীয়-আদর্শ-প্রবণতার এই কাল সম্পর্কে একটা স্থির ধারণায় উপনীত হওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত রচনাগুলি সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন জীবনাদর্শের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

চৈতালি (১৩০২-৩), কল্পনা (১৩০৪-৬), কথা ও কাহিনীর কবিতা ও নাটক (১৩০৪-৬), 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ (১৩০৫), ভারতী-পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য বহু রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও লোক-সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ (১৩০৫), ক্ষণিকা (১৩০৬-৭), চিরকুমারসভা (১৩০৬), কাদম্বরীচিত্র (১৩০৬), 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ (১৩০৭), ব্রহ্মমন্ত্র (১৩০৭), নৈবেদ্যের কবিতারম্ভ (১৩০৭), কুমারসম্ভব ও

শকুন্তলার আলোচনা (১৩০৮), শকুন্তলা প্রবন্ধ (১৩০৯), নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে তপোবনাদর্শ ও বর্ণাশ্রমধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ (১৩০৮-৯), 'বিচিত্র-প্রবন্ধ' পুস্তকের সংস্কৃতসাহিত্যধারার উল্লেখ ও আলোচনামূলক নববর্ষা, কেকাধ্বনি, বাজে কথা প্রভৃতি (১৩০৮-৯)।

রবীন্দ্রকাব্যজীবনে প্রাচীন সাহিত্যাদর্শ ও জীবনাদর্শের বিশেষ ভাবে অনুসরণের এই যুগটি (প্রায় দশ বৎসর) মোটামুটি দুই দিক থেকে বিবেচনার যোগ্য। এক, সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ, যা প্রত্যক্ষ-ভাবে কল্পনাকাব্যে এবং পরোক্ষভাবে ক্ষণিকাকাব্যে বা বিচিত্রপ্রবন্ধ ও প্রাচীন-সাহিত্যের আলোচনাগুলিতে প্রাপ্তব্য ; আর এক, জীবনাদর্শের অনুসরণ, যা নৈবেদ্য-কাব্যে এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যমূলক ও পাশ্চাত্যজীবনাদর্শের প্রতিবাদমূলক আলোচনাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যাদর্শ থেকে সুদৃঢ় জীবনাদর্শে উত্তরণের এই দিকটি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার ঠিকই লক্ষ্য করেছেন—'Aesthetics ছাড়িয়া এখন Ethics সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে।'

কিন্তু কেবল নৈবেদ্য নয়, কবির স্বদেশীয়তা 'খেয়া'র কাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে তাঁর স্বাভাবিক কাব্য-উপলব্ধির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে, এমন কথাও অযৌক্তিক হবে না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে কবির বাউল-সংগীত রচনার আগ্রহ তাঁর এই স্বদেশপ্রীতি ও নবাগত অধ্যাত্ম-অনুরাগকে একসঙ্গে যুক্ত করেছে। 'রবীন্দ্র-সংগীতে'র লেখক যথার্থভাবে নির্দেশ করেছেন যে, কবির বাউল-ভাব ও বাউল-সুরের উৎসার একালেই ঘটেছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব থেকেই কবির চিত্ত যাবতীয় স্বাদেশিকতার জন্যে অভ্যন্তরে প্রস্তুত হচ্ছিল।

'কথা ও কাহিনী' প্রেরণার দিক থেকে প্রাচীন ভাবাদর্শ এবং আকারে ও অবয়বে প্রাচীন সাহিত্যিকতার অনুসরণ করেছে। এগুলির আবির্ভাব ভারতীয় ত্যাগ ও শক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত কবিমানস থেকে। কাব্যগঠনে এদের দেহে ক্লাসিক্যাল চিত্রধর্মিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আদর্শের দিক থেকে যাই হোক, এগুলির কাব্যমূল্য যথেষ্ট এবং তা নির্ভর করছে এগুলির ঘটনাসংস্থানের চমৎকারিত্ব, পরিবেশের রমণীয়তা এবং একটির পর একটি মানবীয় ও প্রাকৃতিক চিত্র উন্মোচনের নৈপুণ্যের উপর। এ সম্পর্কে কবির স্বাভিমত উদ্ধার ক'রে তাঁর এই কাব্যের ক্লাসিক্যালধর্মপ্রবণতার সমর্থন দেখানো যেতে পারে—

'এ সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব……ভালো ক'রে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতা-গুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা।…… এমনি ক'রে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরী হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।' (রচনাবলী দ্রঃ)

এই চিত্রধর্মিতার পরিচয় 'কথা'র প্রায় সর্বত্র থাকলেও পূজারিনী, অভিসার, পরিশোধ প্রভৃতি কয়েকটি কবিতাতেই বিশেষ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। 'কাহিনী' বরঞ্চ এদিক দিয়ে কাব্যগুণ-প্রধান না হয়ে ভাবপ্রধান হয়েছে। 'কথা' কাব্যের এই চিত্রধর্মী কাব্যগুণ পূর্বেই কল্পনার কয়েকটি কবিতার মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলেছে কবিবাঙ্‌নির্মাণের অপূর্ব কৌশল। কল্পনা-কাব্যের প্রাচীনাশ্রয়ী কাব্যগুণ সম্বন্ধে অতঃপর আমরা আলোচনা করব।

কল্পনা কাব্যের উপর সাধারণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও প্রাকৃতন রচনাগুলির সঙ্গে এর একটা অবিসংবাদী পার্থক্য ধরা পড়ে। তা হ'ল এর বিষয়বস্তু, রূপনির্মাণ ও বাক্যে সংস্কৃতস্বাদ। 'মানসী'র কাল থেকে কয়েকটি কবিতায় ও নাট্যে আধুনিক কবিমানস সংস্কৃত সাহিত্যকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করলেও, এমন কি সংস্কৃত বাক্যের ছাঁদ ও রূপকৌশল কোথাও সবিশেষ অনুসরণ করলেও (চিত্রাঙ্গদা তুং) সংস্কৃত কাব্যের রসে আপ্লুত তদ্গত চিত্তকে এমন নূতনভাবে প্রকাশ করতে পারে নি। সংস্কৃত সাহিত্যকে আধুনিক কবি যেন পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুললেন। কিন্তু প্রাচীনের মধ্যে কবির এই বিচরণ কেবল রোম্যান্টিক খেয়ালের বশবর্তী হয়েই, এ কথা অর্ধ-সত্য, যেমন, চৈতালির কালিদাস-প্রীতি সম্পর্কে—কবি সমসাময়িক সভ্যতার প্রতি "বিরক্তমনে কালিদাসকে স্মরণ" করছেন—এরূপ উক্তি শ্রদ্ধেয় নয়। কারণ, কল্পনা-কাব্যের নবীকৃত প্রাচীনরসের গভীরতা, 'আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে' সংস্কৃতের অনুশীলন এবং তার সঙ্গে একালের কবিচিত্তের পূর্ব-বর্ণিত প্রবণতাগুলি কবির গভীর রসাবেশেরই পরিচয় বহন করে, এবং চৈতালির সর্বতোমুখী তপোবনাদর্শ-প্রীতি কালিদাসকে গভীরভাবে আত্মস্থ করারই প্রমাণ দেয়। বস্তুতঃ কবি তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার অগ্রগতির বশেই সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শের অনুরাগী হয়ে উঠেছেন।

'কাহিনী'তে প্রাচীনের বস্তু আছে, 'কথা'য় আছে প্রাচীনের চিত্রধর্ম, 'কল্পনা'য় ও 'ক্ষণিকা'য় রূপ ও রসের একান্ত সমন্বয় ঘটেছে। ১৩০৪ এর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে স্বপ্ন, মদনভস্মের পুর্বে ও মদন-ভস্মের পর, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রাচীন চিত্রের কবিতাগুলি রচিত হয়। এগুলিতে কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও ঋতুসংহারের বহু

চিত্রের যেন যথাযথ অবতারণা করা হয়েছে। প্রাচীন মহাকবির কাব্যের এই স্বাদ আধুনিক মহাকবি যদি না দিতেন তাহ'লে পেতাম কিনা সন্দেহ। মনে হয়, প্রাচ্য সাহিত্যিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব নিয়েই যেন রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের অনুরাগী পাঠক লক্ষ্য করবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের যা রমণীয়, যা প্রণিধানযোগ্য, যা অবিস্মরণীয় সে সকলই রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, নাট্যে, সংগীতে, প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে কোনো না কোনো সূত্রে ব্যক্ত করেছেন। সংস্কৃত নাটক ও কথাসাহিত্যের রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক, নায়িকা, নাগরিক, কবি, চেটী, কঞ্চুকী প্রভৃতি অগণিত নরনারীর জীবনযাত্রার বিচিত্র পদক্ষেপ, এমন কি তাদের কথাবার্তার ভঙ্গিগুলিও যেমন কবির অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ধরা পড়েছে ও স্মৃতিতে রক্ষিত হয়েছে, তেমনি প্রকৃতি-জগতের, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বৈচিত্র্য কবির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। 'কল্পনা'র বহু পরে রচিত ঋতুনাট্যগুলিতে ও সাংকেতিক নাটকগুলিতে বাহ্যভাবে হ'লেও জীবন ও মানব-প্রকৃতি সম্পর্কের প্রাচীনাশ্রয়ী আর একটা দিক লক্ষিত হবে। মনে হবে কবি যেন সংস্কৃতের লেখনী ভুলক্রমে বাংলার পুস্তকে পরিচালিত করছেন। এবং সব মিলিয়ে বিচার ক'রে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সংস্কৃতসাহিত্যের সঙ্গে কবির সম্পর্ক সাধারণ ভাসা-ভাসা ধরণের নয়।

সংস্কৃতসাহিত্যের প্রতি কবির এই অকুণ্ঠ অনুরাগ যেন 'স্বপ্ন' কবিতার প্রথম কয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারেই ব্যঞ্জনাক্রমে পরিস্ফুট হয়েছে—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে

খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

উজ্জয়িনীর শিপ্রাতীরের পূর্বজন্মের এই প্রিয়া আর কেউ নয়, সংস্কৃত কাব্যের (মূলতঃ কালিদাসের) অকলঙ্ক কেবল-সৌন্দর্যের রাজ্য, এবং কবিপ্রিয়ার সঙ্গে কবির নির্বাক মিলন ঐ অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যলোকে কবি-মানসের স্বপ্ন-প্রয়াণ। কবির এই সুগভীর অনুরাগের সাক্ষ্যস্বরূপ কবিতাটির বর্ণিত মনোহর চিত্রগুলি কোন্ কোন্ স্থান থেকে কী ভাবে গৃহীত হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারি সে অবকাশ এখানে নেই।

'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটির মধ্যে ঋতুসংহার, মেঘদূত, এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের বর্ণসম্পাত ঘটেছে। বর্ষার এই উল্লাস বাংলার বাস্তব পল্লীপ্রকৃতির নয়, এবং কবিও এখানে পল্লীকবি নন; অথচ খাঁটি বাংলার পরিচিত দু একটি মাত্র দৃশ্য গ্রহণ ক'রে (গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে; যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে, ডাকিছে দাদুরী তমাল-কুঞ্জ-তিমিরে) তার উপর সংস্কৃত কবিকল্পনার বাস্তবাতিশায়ী মাধুর্য আরোপ ক'রে কবি প্রাচ্যভাবানুগত আর্টের চূড়ান্ত নিদর্শন দিয়েছেন। 'ক্ষণিকা'র বিখ্যাত 'নববর্ষা' কবিতাটিতেও বাস্তব বর্ষাপ্রকৃতি অপেক্ষা কবিমানসের কল্পলোকই অধিকতর আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে বাদলের ধারার সঙ্গে নবীন ধান্যের নৃত্যকে অতিক্রম ক'রে প্রাসাদশিখরে আলুলায়িত-কবরী তরুণী, বিদ্যুদ্দিক্ষনয়না অভিসারিকা এবং দোলায় দোদুল্যমানা নায়িকার অলীককল্পনাই আমাদের চিত্তকে অধিকতর রসাবিষ্ট করেছে, মুহূর্তের মধ্যে সংস্কৃত কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। 'স্বপ্ন' কবিতাটির মাধ্যমেও কবি আমাদের মনোরাজ্যে বিভ্রাট বাধিয়েছেন; দৈনন্দিন জীবনে বিস্মৃত, কেবল পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ সংস্কৃতকাব্যের

কল্পলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রে শিপ্রানদীর তটে প্রিয়ার ভবনের সম্মুখে একাকী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। মদনভস্মের পুর্বে ও পর অপুর্ব প্রেমের কাব্য কুমারসম্ভবের প্রণয়লীলার উদ্দীপন বিভাবগুলিকে আশ্রয় ক'রে দক্ষকবির লিরিক কল্পনা মাত্র। 'মদনভস্মের পর' কবিতাটিতে মদনকে প্রকৃতি ও মানবের যাবতীয় রমণীয় সম্পর্কের সারভূত বস্তুর অদৃশ্য কারণরূপে আধুনিক কবি দেখেছেন—

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।

'ভ্রষ্টলগ্নে' যে অনুতাপদগ্ধা বিরহিণীর চিত্র আঁকা হয়েছে তিনি সাজে সজ্জায় ভঙ্গিতে বাক্যে প্রাচীনা, যদিও বয়সে নবীনা। 'অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে, নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে' অথবা 'কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে, বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে' প্রভৃতি সম্পূর্ণ একালের নায়িকার চিত্র নয়। 'সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী······ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ' প্রভৃতি চিত্র সেকালের প্রতীক্ষমাণা নায়িকাদের বিলাসগৃহ-চিত্র। আর যে-প্রেমভিক্ষু বিরহী পথিক স্বর্ণমুকুট ও মুক্তার মালা ধারণ ক'রে অশ্বারোহণে এলেন তিনিও আধুনিক কোনো নায়ক নন, বরঞ্চ 'ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি, বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি'র চিত্র নিয়ে স্ফুট বর্ণিত মধ্যযুগের কোনো প্রেমিকের চিহ্ন দাবী করতে পারেন।

বলা বাহুল্য, এসব কবিতার কোনো নিগূঢ় অর্থ বা তত্ত্ব নেই, কল্পিত ক্ষীণ বিপ্রলম্ভ আশ্রয় ক'রে সৌন্দর্যসৃষ্টি মাত্র এবং সে সৌন্দর্যের উপকরণ বহন করেছে প্রাচীন সাহিত্য। আমাদের মনে হয়, কবির এই প্রকার

কল্পনাবিলাসের পশ্চাতে প্রেরণামাত্ররূপে কোনো বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোক কাজ করেছে। অনুসন্ধানের দ্বারা তা ধরা পড়তে পারে। ঠিক এই ধরণেরই কাল্পনিক অর্থহীন অভিসারের বর্ণনাময় 'ঝড়ের দিনে' কবিতাটির প্রাচ্য শব্দচিত্র যেমন অনবদ্য, প্রকাশের সংযমও তেমনি সুন্দর। 'দেখিছ না ওগো সাহসিকা, ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা' অথবা 'কেন আজি যাও একাকিনী, কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি লেখার সময় কবি যেন প্রাচীনকালের নাগরিকাদের প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অভিসারিকার বর্ণনা কেবল "রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ" অগ্রসর উজ্জয়িনীর যোষিৎগণের কথাই শোনায় না, দু একটি প্রকীর্ণ শ্লোকে দৃষ্ট পথিকের প্রতি রমণীর আদিরসাত্মক বিনয়োক্তির প্রতিধ্বনিও নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে ক'রে থাকে—

হে উতলা শোনো কথা শোনো,
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো?
এ বাঁকা পথের শেষে মাঠ যেথা মেঘে মেশে
ব'সে কেহ আছে কি এখনো।

'প্রকাশ' কবিতাটিতে সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত প্রকৃতির প্রণয়লীলা আধুনিক প্রকৃতির কবিকে একটি রোম্যান্‌টিক কল্পনায় প্রবৃত্ত করেছে। সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায় এই জড় প্রকৃতির—তৃণতরুলতা-পশুপক্ষীর মিলন-বিরহ এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে আধুনিক কবি তা থেকে উৎপ্রেক্ষা করছেন, প্রকৃতির মধ্যে প্রণয়লীলা একদিন বাস্তব আকারেই বিদ্যমান ছিল; সহসা কোনো প্রগল্‌ভবাক্ কবি প্রকাশ ক'রে দিতেই প্রকৃতি আবরণ দিয়ে ঐ লীলা গোপন ক'রে ফেলেছে। কিন্তু গোপন করলেও আধুনিক কবির কাছে তা ঠিক ধরা পড়ছে দেখা যায়—

শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে ;

কল্পনার 'হতভাগ্যের গান' এর 'হে অলক্ষ্মী রুক্ষকেশী তুমি দেবী অচঞ্চলা' প্রভৃতির ছড়ার ছন্দে চিত্রিত অলক্ষ্মীর কল্পনাতেও বহুবর্ণিত চঞ্চলা লক্ষ্মীর চিত্র বিপরীতভাবে কাজ করেছে। চিত্রা-কাব্যের আবেদন কবিতার 'মহারাণী,' ক্ষণিকার 'কল্যাণী' কবিতার 'কল্যাণী' বা লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকার 'রাণী'রই এ একটি বিপরীত প্রতিচ্ছবি। কল্পনার এই সকল কবিতা ছাড়া কয়েকটি গানের মধ্যেও ('কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ' 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন' প্রভৃতি) সংস্কৃতসাহিত্যের চিত্র ও ভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়।

'কল্পনা'য় এই প্রাচ্য সৌন্দর্য-স্বপ্ন ছাড়া অন্য জাতের কবিতাও স্বভাবতই স্থান পেয়েছে, যেগুলির প্রেরণা বহুল পরিমাণে কবির স্বকীয়, কিন্তু ভাষাশিল্পে সংস্কৃতের সুনির্দিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বর্ষশেষ, দুঃসময়, বৈশাখ এবং আহ্বান এই চারটি কবিতা লক্ষণীয়। 'বর্ষশেষ' কবিতাটি ঠিক সৌন্দর্য-প্রধান নয়, ভাবাবেগ-প্রধান। এর ভাষায় ও চিত্রাঙ্কনে art এবং অভ্যন্তরে ethicsএর প্রেরণা কাজ করেছে। এই ভাবপ্রেরণা সম্পর্কে কবির উক্তি—'এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে।' বলা বাহুল্য, নূতন প্রেরণার প্রয়োজন কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কতদূর তা অনির্ণেয়, কিন্তু বাঙালির জীবন সম্পর্কে বিষয় তৎকালে সম্পূর্ণরূপেই প্রযোজ্য। যে প্রবল জাতীয়তাবোধ এই যুগের বিশেষ লক্ষণ তা-ই কবির অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে একদিকে কবিতাটিকে যেমন সার্বজনীন আবেদনে পূর্ণ ক'রে তুলেছে, অপরদিকে তেমনি কবির ব্যক্তিগত জীবনেও বন্ধনমুক্তির

ও দুঃখবরণের সহায়ক হয়েছে। কবির তৎকালীন জাতীয়তাবোধ 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায়, ভারতলক্ষ্মী ('অয়ি ভুবনমনোমোহিনী') গানে এবং 'উন্নতি-লক্ষণ' নামক ব্যঙ্গ কবিতায়ও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। বঙ্গলক্ষ্মী কবিতাটি কবির বাস্তব স্বদেশপ্রীতির উল্লেখযোগ্য পরিচয় বহন করছে, যেমন— * * রয়েছ মা ভুলি

তোমার শ্রীঅঙ্গ হ'তে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ
তোমার ললাট-শোভা সীমন্তরতন
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।

জাতীয় ভাব-প্রেরণার ভিত্তিতে বিবিধ বন্ধনমুক্তির আগ্রহ আরও স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হ'ল 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে' ('বিদায়') প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে।

বিখ্যাত 'বর্ষশেষ' কবিতাটির প্রেরণার বীজ হ'ল—

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—

এই জাতীয় দুরবস্থার অসহনীয় চিত্রই কবিকে ভয়ংকর-সুন্দরের আদর্শ-কল্পনায় নিয়োজিত করেছে, এবং বীররসে আপ্লুত করেছে। আলংকারিক ভাষায় নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে বীররসের অনুভাব ও সঞ্চারী বর্ণিত হয়েছে বলা যেতে পারে—

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।

ঝড়ের Sublime রূপের বর্ণনা কবিতাটিতে যে নেই তা নয়, কিন্তু তা গৌণ উদ্দীপনবিভাবরূপেই স্থানলাভ করেছে। 'ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে, গোঠে ফিরে চাষী' থেকে 'মত্ত হাহারবে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য' পর্যন্ত কয়েক পঙ্‌ক্তিতে ঝটিকার ভীষণ-মধুর রূপের অবতারণা ক'রেই কবি 'ঘনগূঢ় ভ্রূকুটি', অথবা 'বিজয়গর্জনস্বন' অথবা 'মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জলদর্চি-রেখা' প্রভৃতি Sublimeএর বর্ণনার দ্যোতক শব্দচিত্রগুলিকে ভাব-প্রেরণামূলক শিব-রুদ্রমূর্তির বশীভূত ক'রে ফেলেছেন। এইজন্যে এই কবিতাটি সৌন্দর্য-প্রধান না হয়ে ভাব-প্রধান হয়ে পড়েছে। অথচ সমধর্মী ইংরেজি-কবি শেলির Ode to the West Windএ পাশ্চাত্যসমাজের নবজন্ম-কামনা প্রকাশ পেলেও ঝড়ের উদার সৌন্দর্যের ও সুদূরপ্রসারী রূপের অতুলনীয় প্রকাশে কোনো বাধা ঘটেনি। বস্তুতঃ ঐ কবিতাটিতে কবিমনের ঝটিকা ও বাহিরের ঝটিকা যেমন এক হয়ে মিশে গেছে এবং 'উদ্দেশ্য থেকেও উদ্দেশ্য-অভিলাষ-হীন' এক অপূর্ব লিরিক কবিতার জন্ম দিয়েছে—বর্ষশেষে ঠিক তেমন ঘটেনি। 'বর্ষশেষ' এর কাব্যগুণ অপেক্ষা নৈতিক ভাবাদর্শই প্রবল। বলা বাহুল্য, একালে শেলির মত তীব্র বিদ্রোহী কবিমানস রবীন্দ্রনাথের ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ ও শেলির বিক্ষোভের কারণও বিভিন্ন। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবগত অন্তর্গূঢ় আবেদনের বিভিন্নতার জন্যেই একের মধ্যে ঝড় অভাবনীয়ভাবে আত্মস্থ হয়েছে এবং অপরের

মধ্যে বাইরে থেকে আদর্শগত প্রেরণার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইজন্যে বর্ষশেষ ও Ode to the West Windএর বৈপরীত্যও কম নয়। বর্ষশেষের উল্লিখিত সার্বজনীন ব্যাপক ভিত্তিভূমি ছাড়া যেখানে কবি-আত্মার সঙ্গে একটি ক্ষীণ-সম্পর্কে এর মিলন ঘটেছে সেখানে কবিতাটিকে 'এবার ফিরাও মোরে'র সগোত্র ব'লেই বিবেচনা করতে হবে। 'এবার ফিরাও মোরে' বাস্তবজীবনবোধের প্রথম কবিতা। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখাতিক্রমণ সেই সময় প্রথম দেখলাম, তারপর জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতায় ভিন্নাকারে এই জীবনবোধের ব্যক্তিগত প্রকাশ দেখলাম, অবশেষে এখানে জাতির Evilএর পরিত্রাতা রুদ্রের রূপে কবি যে কাল্পনিক শক্তিকে আহ্বান করছেন তার পরিচয় পেলাম। এই ধারণা কিরূপে ভিন্নভাবে অচলায়তন, রাজা প্রভৃতি নাটকে রূপ লাভ করেছে তা পরে দেখব। এই নূতন ভাব সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণের মুহূর্তে কবি বলছেন—

> "অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিলে? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কীরকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।"

'অশেষ' কবিতাটি কবির একটি স্বতন্ত্র ভাবুকতার দাবী রাখে। যখনই ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত কর্মের আবেদন এসেছে তখনই (ঈশ্বরোপলব্ধির পূর্বকাল পর্যন্ত) পূর্বোক্ত জীবনদেবতাকে কবি স্মরণ করেছেন। চিত্রা পর্যায়ে এই অহংএর আকস্মিক উপলব্ধির উচ্ছ্বাসের পর জীবন-দেবতার রঙ ফিকে হয়ে এলেও স্মৃতি এখনও লুপ্ত

হয়নি। কিন্তু কর্মের উৎসাহ আহ্বান কবিতাটির কাব্যার্থ নয়, বরঞ্চ কর্মবিরাগই এখানে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কর্ম-অনুরাগ এবং কর্ম-বিরাগ উভয়ই একালে রবীন্দ্রকাব্যে পাশাপাশি রয়েছে। চিত্রাতেও 'এবার ফিরাও মোরে' ও 'জীবনদেবতা'র পাশাপাশি 'দিনশেষে' কবিতার "ভালো নাহি লাগে আর আসা-যাওয়া বার বার বহু দূর দুরাশার প্রবাসে" প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। 'অশেষ' কবিতায় এই বৈরাগ্যের মধুর চিত্র "নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার-আঁচল-খসা······ এখনো আহ্বান" পর্যন্ত।

'বৈশাখ' কবিতাটি একালের চিত্রধর্মী সংযত কাব্য-রচনাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবিতাটির সৌন্দর্য নির্ভর করছে বৈশাখের উপর সন্ন্যাসী বা রুদ্রের রূপ আরোপ করায় এবং ঐ রূপের উপযুক্ত পরিবেশ-চিত্রণে। এখানে অভিনব শব্দচয়ন ও শব্দগঠন সংস্কৃতের আশ্রয়েই নিষ্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় ত্যাগের কঠোর আদর্শের সামঞ্জস্য এই সময় কবি দেখছিলেন। এই কবিতাটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যে সন্ন্যাসীর চিত্র কল্পনা করা হয়েছে পরবর্তী 'নববর্ষ' প্রবন্ধে কবি তার সাহায্য নিয়েছেন দেখতে পাই—

"ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ······তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ,·········তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্র-বিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীন বস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে।·········তখন দেখিব ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে,

তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে—যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপর শব্দিত হইয়া উঠিবে।”

‘কল্পনা’ কাব্যের প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘দুঃসময়’ সংস্কৃত বচনভঙ্গির ও ধ্বনিময়তার সজ্ঞান অনুসরণের বিশেষ প্রচেষ্টারূপেই মূল্যবান। পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে প্রচুর অনুপ্রাসের ব্যবহারে এই কবিতাটিতে অ-পূর্বদৃষ্ট ধ্বনি-সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এই বহিঃসৌন্দর্যই (যদিও কোথাও অতিরেক ঘটেনি এমন নয়) কবিতাটির একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু। ক্ষণিকার ‘আবির্ভাব’ কবিতাটির মত বর্ণবিহ্বলতা ও ধ্বনিবিলাসই এই কবিতাটির স্বভাব, এর মধ্যে কোনো বাচ্যার্থের আবিষ্কারের প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। দেখা যায়, দুঃসময় কবিতায় বাগ্‌বিলাসের যে আতিশয্য ঘটেছে ‘আবির্ভাব’ কবিতায় বাক্‌সিদ্ধ কবি তাকে অতিক্রম করেছেন এবং ভাবাশিল্পের দিক থেকে একটি নিখুঁত কবিতা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। ভাষাভঙ্গির যে চমৎ-কারিত্ব ও প্রৌঢ়ত্বগুণ রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা বাইরের দিক থেকে কাব্যজগতের উত্তম কলানৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়—তার প্রাথমিক পরীক্ষামূলক দিকটি কল্পনা-কাব্যের সংস্কৃতানুশীলনের মধ্যেই ধরা পড়ে। দুঃসময় কবিতার পাণ্ডুলিপি রচনাবলীতে তথা সঞ্চয়িতায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দেখা যায়, ‘দুঃসময়’ ও ‘অসময়’ নামে প্রকাশিত দুটি বিভিন্ন কবিতা পাণ্ডুলিপির ‘স্বর্গপথে’ কবিতারই ভগ্ন ও পরিবর্তিত দুই রূপ মাত্র। আরো দেখা যায়, এক একটি শব্দ বার বার পরিবর্তিত ক’রে কবি অভিপ্রেত ধ্বনিগুণসম্পন্ন শব্দটি বেছে নিয়েছেন এবং

পরিশেষে কোথাও কোথাও সমস্ত বাক্যই বাদ দিয়ে অন্য কথা বসিয়েছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ কবির সমস্ত রচনাই যন্ত্রমুখনির্গত তৈয়ারি বস্তু এমন বালকসুলভ ধারণা অনুচিত হ'লেও এবং কবিবাঙ্‌নির্মিতি পরিবর্তনসাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য একথা মেনে নিলেও এখানে কবি যে-প্রকারের পরীক্ষামূলকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন অন্যত্র তা দুর্লভ। সেই জন্যে 'দুঃসময়' ও 'অসময়' কবিতা দুটিতে এই শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টের যেটুকু আড়ষ্টতা দেখা যায় পরবর্তী কোনো রচনায় তা দেখা যায় না। 'কল্পনা' কাব্য কেবল সাহিত্যিক প্রেরণার দিক থেকেই নয়, ভাষাশিল্প-শিক্ষার নিদর্শন হিসেবেও সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব দাবী করে।

দুঃসময় কবিতাটির বাচ্যার্থ না হোক ব্যঙ্গ্যার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা কোনো কোনো আলোচনা-গ্রন্থে দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম দার্শনিক সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতে কল্পনায় 'বিগত জীবনের স্মৃতিতে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন জীবনযাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিতে যাইতেছেন' এবং দুঃসময় তারই নির্দেশক কবিতা। এই আলোচনা গ্রহণ না ক'রে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার কাব্যজীবনের বাস্তব দিকে কাব্যের ক্ষেত্রে কিছুকালের ঊষরতার মধ্যে দুঃসময় নামের সার্থকতা খুঁজেছেন। বলা বাহুল্য, এরকম কোনো অর্থেই আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি নি। কবিতাটির এমন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আছে যাদের মধ্যে অর্থগত বাহ্য সংগতি পাওয়া যায় না। কবিতাটির প্রথমার্ধে কোথাও কোথাও অর্থতঃ যাত্রার উৎসাহ সূচনা মনে হ'লেও ছন্দ ও ভাষার ব্যঞ্জনা মনের নৈরাশ্যজনক বিমূঢ়তাই প্রকাশ করে। তা ছাড়া কবিতাটির শেষে

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।

ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির সুরে ও ভাষার কোমলতায় নৈরাশ্যজনক মনোভাবের ব্যঞ্জনাই পাওয়া যাচ্ছে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় নয়, এই মনোভাবের মধ্যেই যদি 'দুঃসময়' নামের কোনো সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা এই ধরণের কবিতাকে এই যুগের বৈশিষ্ট্য—সংস্কৃত ভাষার শিল্প-সৌন্দর্য ও সংস্কৃত কাব্যের রস স্বীকরণের ফল ব'লেই মনে করি।)

বিশুদ্ধ কবিত্বে অতুলনীয় 'ক্ষণিকা' কাব্য কল্পনার সমসাময়িক। এতে বিশ্বাত্মবোধের গভীর তত্ত্ব বা সৌন্দর্য-ধ্যানরহস্য প্রভৃতি কবি-আত্মার কোনো নিগূঢ় সঞ্চরণের ইতিহাস নেই, আছে যাবতীয় দ্বন্দ্বের অতীত একটি নির্মল কেবল-কবিস্বভাবের পরিচয়। সুখদুঃখ ভাবনা-চিন্তার অতীত নির্লিপ্ত কবিমানস কেবল রসাস্বাদ করতে চান, কেবল স্বপ্ন দেখতে চান। বাইরের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে একে রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল উৎস থেকে পৃথকভাবে উৎসারিত ব'লে মনে হ'তে পারে। ক্ষণিকায় বাহ্যরূপে খাঁটি বাংলা-প্রকৃতি, কিন্তু নিগূঢ় অন্তরে গোপনে সংস্কৃত কাব্যের আদর্শ বিরাজ করছে। কবির উক্তির পুনরুল্লেখ ক'রে বলা যেতে পারে—এখানেও বিচার্য কবির মনস্তত্ত্ব। এই যে খেয়ালি মনের ক্ষণিক সুখ-বাসনা, কোনো তত্ত্বের মধ্যে অবতরণ নয়, দার্শনিকতা নয়, জীবনসমস্যা নয়, অবিমিশ্র আনন্দ-স্বরূপের বশীভূত হ'য়ে সেই স্বভাবেরই চরমতা খ্যাপন, এ প্রবৃত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের। সংস্কৃত সাহিত্য কাব্যজগতে কেবল-রসসৃষ্টির চূড়ান্ত উদাহরণ। আধুনিক কবি সংস্কৃত সাহিত্যের এই রসপ্রীতির ভাবটিকে একেবারে আত্মস্থ ক'রে ফেলেছেন। দেখা যাবে কবির পূর্বোপলব্ধ অপূর্ব নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-প্রীতির আগ্রহও কবির কাছে

বর্তমানে অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছে। 'যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ ফুরাইলে দিস ফুরাতে'—এই তাত্ত্বিকতা-বিরল রসপ্রীতিই কবিকে ক্ষণিকায় একান্ত পরিতৃপ্ত ক'রে তুলেছে। মুক্ত ও বিশুদ্ধ মানসের পরিচয় বহন করার জন্যেই এর লিরিকগুণ অসামান্য এবং একেবারে খাঁটি। 'ক্ষণিকা' পড়লে বোঝা যায়, অতঃপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রয়োজন-সম্পর্কহীন ক্ষণিকতাবিলাস কবির প্রতিভায় অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল, সৌন্দর্যাভিলাষের পোষক মাত্র হয়ে রইল না।

ক্ষণিকাকে একালের সংস্কৃতানুশীলনের পটভূমিতে স্থাপন ক'রে দেখতে হবে। দেখতে হবে খাঁটি বাংলায় ছড়ার ছন্দে (সর্বত্র নয়) যে-কবিমানস প্রতিফলিত হয়েছে তা রস আকর্ষণ করেছে সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যচেতনাসর্বস্ব ক্ষণিকতাবাদ থেকে—যেখানে যৌবন, বসন্ত, আনন্দ ও প্রেমই সত্য, সুগভীর তত্ত্বকথা অগ্রাহ্য। এর ফলেই কবি জোর ক'রে বলতে পেরেছেন—

আজকে শুধু একবেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।

অথবা—

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

অথবা—

চিত্ত-দুয়ার মুক্ত ক'রে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই বলব নাক সত্যকথা।

ক্ষণিকার 'আবির্ভাব' ও 'নববর্ষা' কবিতা দুটির বিষয় ইতিপূর্বেই

প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা গেছে। এই অর্থহীন ধ্বনিসৌন্দর্যময় 'আবির্ভাব' কবিতাটির উৎসরূপে বিবেচিত হতে পারে অমরুশতকে এমন একটি শ্লোক আমরা দেখেছি। শ্লোকটী হ'ল এই—

মলয়মরুতাং ব্রাতা যাতা বিকাসিতমল্লিকাঃ
পরিমলভরো ভগ্নো গ্রীষ্মস্ত্বমুৎসহসে যদি।
ঘন ঘটয়িতুং তং নিঃস্নেহং য এব নিবর্তনে
প্রভবতি গবাং কিং নশ্ছিন্নং স এব ধনঞ্জয়ঃ॥

অর্থাৎ—মল্লিকাসুগন্ধ মলয়বাতাস চলে গেল, পরিমলময় গ্রীষ্মও শেষ হতে চলেছে। এখন, হে ঘন, তুমি যদি সেই হৃদয়হীন ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে মিলিত করতে পার, ইত্যাদি। কবি আরম্ভ করলেন,—

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়;
এলে তুমি ঘন বরষায়।

কোনো একটি শ্লোকের ক্ষীণ প্রেরণা মাত্র লাভ ক'রে কবি নিজস্ব কাব্যজগৎ গ'ড়ে তুলেছেন, এমন ঘটনা হয়ত তাঁর একালের রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কালিদাস-বাণভট্ট-জয়দেবকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতে এমন অনেক কবি রয়েছেন যাঁরা এক একটি শ্লোকে এক একটি উত্তম কাব্য রচনা করেছেন। ভর্তৃহরি, অমরু, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন, বিহ্লণ এবং আরও অনেকে অধুনা-সম্পাদিত বিভিন্ন কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। এরকম নানা কবির চাতুর্যপূর্ণ কয়েকটি শ্লোক কবি প্রজাপতির নির্বন্ধ বা চিরকুমারসভা উপন্যাসে ও নাটকে সংস্কৃত-রসিক 'রসিক' এর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। গীতগোবিন্দের মত অমরুশতক, হংসদূত, পবনদূত, বা বিদ্যাসুন্দর তাঁর অবশ্যই পড়া ছিল। অমরু সম্পর্কে কবি লিখছেন—"সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং

ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।" (জীবন-স্মৃতি)

অতঃপর রবীন্দ্রকাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমপ্রবেশ ও তার প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। 'কল্পনা' কাব্যের এই একান্ত সংস্কৃতানুগ সাহিত্যাদর্শ রবীন্দ্রকাব্যজীবনে নূতন হ'লেও এর পুর্বে নানান্ আকারে সংস্কৃত সাহিত্য (মূলতঃ কালিদাস) কাব্যের বিষয়ীভূত হচ্ছিল। কালিদাস সংস্কৃত কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীন ভারতের কবি-প্রতিনিধি, সুতরাং পরবর্তী অপর এক ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক না থাকলেই উৎকট রকম অস্বাভাবিক হ'ত। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যেমন সম্পর্ক, কালক্রমে পরিবর্তিত ভারতেরও সেই সম্পর্ক একথা প্রস্তাবনায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কালিদাস ও বাণভট্ট ছাড়া জয়দেবাদি অর্বাচীন বহু কবির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যে-কোনো সংস্কৃত কাব্যরসিকের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর, তথাপি কালিদাসই মুখ্যভাবে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে একথা বলা যেতে পারে। কালিদাসের প্রকৃতি-অনুরাগ, জন্মান্তরীণ ব্যাকুলতার অনুভূতি ও সহজ মানবীয়তা এই তিনটি গুণ রবীন্দ্রনাথেও প্রধানভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষের অধ্যায়ে কবির অতুলনীয় সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রবণতার কথা উল্লেখ করেছি এবং এই ধর্ম পাশ্চাত্য ভাববন্যার উচ্ছ্বলিত প্রবাহ হ'লেও কালিদাসের কাছ থেকে সংক্রামিত হতে পারে এমন ধারণা ব্যক্ত করেছি। স্বয়ং কবি মনে করেন যে উনিশ শতকের ইংরেজি কাব্যে কবিদের মনোভাবের যে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায় তা পুর্ববর্তী জার্মান দর্শনের প্রতিক্রিয়া,

এবং জার্মান দার্শনিকেরা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ থেকেই তাঁদের মতামতের প্রেরণা পেয়েছিলেন। † অর্থাৎ উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃতি-ব্যাকুলতা ও বহির্বস্তুর অন্তরালে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলার ধারণা—আঠারো-উনিশ শতকের জার্মানির নূতন দার্শনিক-দলের মতবাদ, যথা ফিক্‌টের Ego তত্ত্ব, শেলিংএর প্রকৃতি-অধ্যাত্মের একত্ব এবং হেগেল্‌এর Absoluteএর বিকাশ-লীলা থেকেই অনুপ্রাণিত—এবং এই অভিনব দার্শনিক মতবাদগুলি ভারতের ভাববাদী দার্শনিক মতবাদের ও সাহিত্যধর্মের দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়েছিল।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের অভিনব নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-কল্পনার প্রথম পূর্ণপ্রকাশ 'মেঘদূত' কাব্যের আধারেই সংঘটিত হয়েছিল। তারপর উল্লেখযোগ্য 'উর্বশী' এবং 'বিজয়িনী' কবিতার সৌন্দর্য-প্রেরণা বা সৌন্দর্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ধারণা কবির স্বকীয় হ'লেও কালিদাস ও বাণভট্ট ঐ প্রেরণার রূপাশ্রয়ণে সাহায্য করেছে।

'বিজয়িনী' এবং 'আবেদন' প্রভৃতি কবিতার বাসনাসম্পর্কশূন্য নারীমূর্তির কল্পনা বিষয়ে আমরা আর একটু অগ্রসর হতে পারি। আমাদের মনে হয় এরকম নারীমূর্তি ও তার সঙ্গে আচরণ-সম্পর্কটি বাণভট্টের মহাশ্বেতা ও তার সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের আচরণ থেকে কল্পিত। কাদম্বরী-কথায় চন্দ্রাপীড়ের মহাশ্বেতা-দর্শনের মধ্যে কবিকৃত মহাশ্বেতা ও তার পারিপার্শ্বিক বর্ণনায় একটি নিষ্কাম বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোকই চিত্রিত হয়েছে। মহাশ্বেতায় অলোকসামান্য নারীরূপের সঙ্গে তপঃসাধয়িত্রীর ভাব মিশ্রিত হয়ে আধুনিক কবির অভিপ্রেত প্রয়োজন-সম্পর্ক-রহিত সৌন্দর্যচিত্রের প্রেরণা দিয়েছে।

† The Message of the Forest প্রবন্ধ বা
Creative Unity – The Religion of the Forest দ্রঃ

মহাশ্বেতার রূপবর্ণনার মধ্যে বাণভট্টের মূল কথাটি লক্ষ্য করতে হবে-—'যৌবনেন নির্বিকারবিনীতেন শিষ্যেণেব উপাস্যমানা'—যৌবন (বা লক্ষণাক্রমে 'মদন') বিকারহীন বিনীত শিষ্যের মত তাঁর উপাসনায় রত। এই সঙ্গে স্মরণ করতে হবে 'বিজয়িনী' কবিতার মদনের চিত্র—

পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে,
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।

'আবেদন' কবিতার 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে 'ভক্ত' 'সর্বাধম দাস' 'দীন ভৃত্যে'র যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে তৎকালীন চন্দ্রাপীড়ের চরিত্র তুলনার যোগ্য—"এবমুক্তস্তু তয়া সম্ভাষণমাত্রেণৈবানুগৃহীতমাত্মানং মন্যমান উত্থায় ভক্ত্যা কৃতপ্রণামঃ 'ভগবতি যথাজ্ঞাপয়সি' ইত্যভিধায় দর্শিতবিনয়ঃ শিষ্য ইব তাং ব্রজন্তীমনুবব্রাজ।"—মহাশ্বেতা অতিথিকে স্বাগত সম্ভাষণপূর্বক ঐ সকল কথা বললে পর চন্দ্রাপীড় তাঁর সম্ভাষণাদিতেই নিজকে অনুগৃহীত মনে ক'রে উঠে ভক্তিসহকারে প্রণাম করলেন এবং দেবী, আপনি যা আদেশ করেন, এই কথা ব'লে বিনীত শিষ্যের মত চলমানা মহাশ্বেতার অনুসরণ করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, আবেদন ও বিজয়িনী কবিতায় প্রাকৃতিক চিত্রের মধ্যেও এই বনভূমির ও কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনার ছায়াপাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অচ্ছোদ-সরসীনীরে যে রমণী স্নানের জন্যে অবতরণ করছেন তিনি যে মূলে এই মহাশ্বেতাই তার প্রমাণও রয়েছে। কাদম্বরীতে বসন্তে তরুণী

মহাশ্বেতা (তখন তপস্বিনী নন) অচ্ছোদ সরসীতে একদা স্নানের জন্যে অবতরণ করেছিলেন,—'মধুমাসদিবসেষ্বেকদাহম্ অম্বয়া সহ মধুমাস-বিস্তারিতশোভং প্রোৎফুল্লনবনলিনকুমুদকুবলয়কহ্লারম্ ইদমচ্ছোদং সরঃ স্নাতুমভ্যাগমম্।' মহাশ্বেতার পবিত্র অলৌকিক সৌন্দর্যবর্ণনার মধ্যে অনুভবগম্য নারীরূপাত্মক আদিরসের যে ক্ষীণ আভাস একে মাধুর্যময় করেছে তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সুলভ; রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৌন্দর্য-কল্পনা নারীরূপের আশ্রয়েই গ'ড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের পরাভূত মদনের চিত্রে কুমারসম্ভবের মদনের চরিত্র যে অল্পবিস্তর প্রেরণা দেয়নি এমন নয়, কারণ, সেখানে মহাকবি মদনকে কিঞ্চিৎ বাচালরূপেই এঁকেছেন।

চিত্রাঙ্গদা নাট্যে সংস্কৃত সাহিত্যের বহিঃরূপের অনুসরণ আরো প্রকট। এর আলংকারিক বচনচাতুর্য এবং সংস্কৃতনাট্যের আঙ্গিকের অনুসরণ সহজেই চোখে পড়ে—

শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

অথবা— অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে ?

অথবা— ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার, করিয়াছি পরিশ্রান্ত

ইত্যাদি বহু উক্তির মধ্যে বাংলার আবরণে সংস্কৃত ভাষাই লক্ষ্য করা যায়। আলংকারিক উক্তির এমন প্রচুর সমাবেশ এর পূর্বের কোনো রচনাতেই দেখা যায় না। এ ছাড়া অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার

কথোপকথনের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলের আক্ষরিক অনুসরণও রয়েছে, এখানে যার কয়েকটি উল্লেখ না ক'রে পারছি না—

সে কি সত্য, কিম্বা মায়া ?	স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ওই মনোহর রূপ পুণ্যফল মোর	অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব তদ্রূপমনঘম্
শান্ত হও হে হৃদয়	হিঅঅ মা উত্তম্ম
কোনো ভয় নাই মোরে, বরাননে, আমি ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত দুর্বলের ভয়হারী।	কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্ —ইত্যাদি
অতিথি-সৎকার	ভবতীনাং সূনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্।
তব দরশনে, হে সুন্দরী, শিষ্টবাক্য সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি, চিত্ত কুতূহলী মোর।	অনসূয়া। সহি মম বি অত্থি কোদূহলং পুচ্ছিস্সং দাব ণং —ইত্যাদি রাজা। বয়মপি তাবদ্ভবত্যোঃ সখীগতং পৃচ্ছামঃ
শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি হেলায় দিতেছ বিসর্জন,	ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি। বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।

হায়, কারে করিছ কামনা জগতের কামনার ধন।	ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ —(কুমারসম্ভব) শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ।
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা	পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী।

নিম্নে উদ্ধৃত চাতুর্যময় সংলাপটি আমাদের কয়েকটি সংস্কৃত নাটকেরই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

অর্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়। কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জুন। কহ শুনি সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে।

চিত্রাঙ্গদা। ...কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন-মাঝে
রাজবংশচূড়া।

অর্জুন। কুরুবংশ !

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়-যশ বীরেন্দ্র-কেশরী
নাম শুনিয়াছ ?

কিন্তু কেবল বিক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে নয়, চিত্রাঙ্গদার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপ্ত ক'রে আছে প্রাচীন সাহিত্যের নিটোল পরিপূর্ণতা—রূপে, রসে,

ভঙ্গিতে, বচনে। নিখুঁত প্রাচীন ধর্মাশ্রয়ণের জন্যেই আধুনিক পাঠকের রুচির দাবী এতে রক্ষিত হয় নি। এই দিকটি লক্ষ্যে না রেখেই কোনো কোনো সমালোচক এতে রুচি-বিকার-দোষ অর্পণ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যরসিক সে স্থলে এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসাই করবেন। বিজয়িনী কবিতায় কবি যে নারীরূপ ও পারিপার্শ্বিক অঙ্কন করেছেন, সেই চিত্রের সঙ্গে অর্জুনের নবতনু-চিত্রাঙ্গদা দর্শনের বিস্ময় পাঠক তুলনা ক'রে দেখবেন—বর্ণনা একেবারে এক। কিন্তু সংস্কৃতানুসারিতা কেবল এর বহিঃরূপেই আবদ্ধ, ভাববস্তুতে নয়, এমন কথা বলাও হয়ত স্পর্ধার বিষয়। কারণ, রূপমোহের অতীত যে-ভাবসৌন্দর্যের মহিমা-কীর্তন এখানে কবির কাব্যবস্তু তা পরবর্তীকালে কবিকৃত কালিদাস-ব্যাখ্যারও মর্মকথা। কালিদাসের কাব্য সম্পর্কে প্রকাশিত ঐ তত্ত্ব হয়ত পূর্বেই অতি ক্ষীণভাবে কবিমানসে ছিল, পরে নৈবেদ্য প্রভৃতি রচনার সময় প্রাচীন ভাবাদর্শের প্রেরণার মধ্যে ঐ উপলব্ধিটি বিস্তৃতির সঙ্গে কবি বিবৃত করলেন। পরবর্তীকালে রচিত 'তপতী' নাটকে রূপ-লালসাকে অনুতাপদগ্ধ ক'রে যে ত্যাগময় প্রেমের জয় ঘোষণা করা হ'ল তা-ও কবির এই আদর্শ-দৃষ্টি-প্রসূত, এবং সন্দেহ হয়, প্রথম যৌবনের নাটককল্প রচনা 'রাজা ও রানী'তে এই ভাবেরই ক্ষীণ সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথই প্রাচীনসাহিত্যে ভাবধর্মের আদিকর্তা।

স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে সংস্কৃত কাব্য আদৌ কবির ভাবব্যাকুলতার আধারীভূত হয়ে ধীরে ধীরে রূপাশ্রয়ণের অন্তর্ভূত হয়েছে এবং পরিশেষে প্রাচ্য-সাহিত্য-রসিকতায় পরিণামপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এইখানেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের শেষ নয়। পরবর্তীকালে লেখা ঋতুনাট্য ও অরূপ-নাট্যগুলির সংস্কৃত আঙ্গিক ও কালিদাসের ঋতু-উৎসবাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা বাদ দিলে এই পর্যায়ে নৈবেদ্য

রচনার সমকালীন প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রভাব অবিস্মরণীয়, এবং এই মহাকবির অরূপলীলানুভূতি প্রকৃতি-ব্যাকুলতা থেকে স্বকীয়ভাবে উৎপন্ন হ'লেও এরূপ ধারণায় বাধা নেই যে একালে ভারতীয় জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শের প্রভাব অতি দ্রুত কবিকে অরূপানুপ্রাণিত বিশ্বোপলব্ধিতে নিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করেছে।

কবি 'প্রাচীন সাহিত্য' নামক বিখ্যাত আলোচনায় ভারতীয় জীবনাদর্শ বা ধর্মাদর্শের ভিত্তিতেই কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সৌন্দর্য-বিচার করেছেন। কালিদাসের ঐ দুটি সৃষ্টির কেন্দ্রে যে ধর্মাদর্শের প্রেরণা রয়েছে তা কবি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করছেন—"একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচন, এই দুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসারমধ্যে ভারতবর্ষ বহুলোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না,—তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ—আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে-নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি, তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রম-ভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন

অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।”

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে যে ধর্ম রয়েছে (শাস্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান নয়, পরিবর্তমান বৃহৎ মানব-ধর্ম) তা রবীন্দ্রনাথ এই যুগে এত বিচিত্রভাবে বলেছেন যে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র হবে। স্থিরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কবি রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ-উদ্বোধনের মূলে রয়েছে কালিদাসের কাব্য এবং বিশেষভাবে তাঁর তপোবনাদর্শ। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনাকালে কবি এত অধিক পরিমাণে এই আদর্শের বশীভূত হ'য়ে পড়েছেন যে, সাধারণ সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে যিনি সৌন্দর্য বা রসকেই চরমতত্ত্ব ব'লে অভিহিত করেছেন (সাহিত্যের পথে দ্রঃ) এবং যিনি বিশ্বের আনন্দলীলার অতিরিক্ত কোনো তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের নির্দেশ দেন নি, তিনি একান্ত শ্রেয়োবোধের দিক থেকেই কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার বিচার করছেন। এই কারণেই এতাবৎ কালিদাস-রসিক সাধারণ পাঠক ও আলং-কারিকদের বিচার থেকে আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের বিচার স্বতন্ত্রও হয়ে পড়েছে। প্রাচীন ধারণায় কুমারসম্ভব আদিরসের অপূর্ব কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল বিরহ-মিলনময় চিরন্তন দাম্পত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্র। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার (তথা পার্বতীর) বিচ্ছেদ কাব্যকৌশলের জন্যেই অতীব প্রয়োজন, বিরহ না থাকলে মিলন পরিপুষ্ট হয় না। আবার দুষ্মন্ত উত্তম ধীরোদাত্ত নায়ক, শকুন্তলাও অভিপ্রেত মুগ্ধা ও মধ্যা নায়িকা। কালিদাস মহাভারতের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রকট স্বার্থ-প্রণোদিত ও কামব্যবহারময় কাহিনীকে অসামান্য দক্ষতা সহকারে নানাভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ক'রে উপাদেয় আদিরসাত্মক কাব্যে পরিণত করেছেন, দুর্বাসার শাপ যে-কৌশলের অন্যতম পরিচয়

বহন করে। অভিজ্ঞানশকুন্তলের অভ্যন্তর থেকে দুষ্মন্তের স্বার্থপরতার ও কামুকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এমন বিচার তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বস্তুতঃ এঁদের আলোচনা অনুসারে, প্রাচীন কবিরা প্রেমকে দেহের আধারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যথার্থ বাস্তবরূপে দেখেছিলেন, অশরীরী আদর্শচেতনারূপে প্রত্যক্ষ করেন নি। অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা আধুনিক কবি-সমালোচক কল্পনায় যেন কালিদাসের কবিমানসের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে বললেন—"সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, পাপ একেবারে চিত্তের ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধা-ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে............কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই—তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপস্থলে যাহা স্বভাবতঃ হইতে পারিত, তাহাকে তিনি দুর্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন।............দুঃখবেদনাকে তিনি সামান্যই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন। ....পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে, স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল।"

কল্যাণময় ধর্মাদর্শের ভিত্তিতেই প্রেম সার্থক, এই কথা বোঝাতে গিয়ে মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলাকে একটি ঐক্যমূলক তাৎপর্যের

দৃষ্টিতে কবি দেখলেন—"যে-প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্ন-প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে-অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে............দুর্বাসার শাপ কবির রূপক মাত্র। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপনমিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত।"

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচন তাঁর অপরিসীম শক্তিমত্তার পরিচায়ক। অপর এক মহাকবির প্রতিভার মধ্যে প্রবেশ ক'রে যে গোপন রহস্য তিনি আবিষ্কার করলেন, এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি-অবয়বের সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে যে অননুকরণীয় ভাষায় সুদুর্লভ অনুরাগের সঙ্গে নানাপ্রকারে তাঁর অভিমত প্রমাণ করলেন তার তুলনা কোনো সমালোচনার ইতিহাসে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমাদের আলোচনা ঠিক তা নিয়ে নয়। আমরা সমালোচক-কবির এই নব্য দৃষ্টিভঙ্গি ও তার কারণ সম্বন্ধে যেন অবহিত হই। একালে শুধু কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সমালোচনেই কবির এই আদর্শপ্রবণতা সীমাবদ্ধ থাকে নি, সাধারণ সাহিত্য-বিচারেও কবি 'সুন্দরে'র সঙ্গে 'শিব'কে মিলিয়ে তবেই পরিতৃপ্ত হয়েছেন, তার উদাহরণ 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধ (১৩১২)। সেখানেও কবি কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার কথা উত্থাপন ক'রে নিম্নলিখিত উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন—"সে (মদন) যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায়, তখনি বিপ্লব উপস্থিত হয়;

তখনি প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না ………কারণ, ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য ; এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে।" (প্রাচীন সাহিত্য)

সাহিত্যাদর্শেও এই ধর্মপ্রেরণা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক রচনা। তার পূর্ব থেকেই নৈবেদ্য রচনা চলছে ও উপনিষদের মধ্যে কবি প্রবেশ করেছেন ('ব্রহ্মমন্ত্র' রচনা দ্রঃ)। উপনিষদের উপর কবির স্বকীয় অনুরাগ এই সময় থেকেই জন্মলাভ করে, এর পূর্বে নয়। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের ও ধর্মাদর্শের প্রতি অনুরাগ একরকম ১৩০৩ থেকেই কবির চিত্তকে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল, যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ নৈবেদ্য কাব্যে কবি, পরকীয়ভাবে হ'লেও, প্রথম ঈশ্বরোপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করলেন। এর পূর্বে কবি যখন তখন ব্রহ্মসংগীত রচনা করলেও ফরমায়েশের বশবর্তী হয়েই করেছেন, তাঁর উপলব্ধিতে ব্রহ্ম তখনও স্বাঙ্গীকৃত হয় নি। নৈবেদ্যের ব্রহ্মসংগীতগুলি এদিক থেকে অনেক পরিমাণে স্বত-উৎসারিত বলা যেতে পারে। যাই হোক, কবিপ্রতিভার অরূপলোকে সঞ্চরণ সম্বন্ধে এই কথাটুকু আমাদের জানতে হবে যে পূর্বতন সোনারতরী-চিত্রা কাব্যে দৃষ্ট প্রকৃতিভাবব্যাকুলতা কবিকে ধীরে ধীরে অসীমের রহস্যলীলায় প্রবেশ করিয়েছে, কিন্তু মাঝখানে কালিদাসের তপোবনাদর্শ তথা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাদর্শ ঈশ্বরলীলার প্রতি আগ্রহে প্রবল উদ্দীপনের কাজ করেছে। নৈবেদ্যে এই উদ্দীপনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ রয়েছে। মোটামুটি নৈবেদ্য থেকে এই যে নূতন অধ্যায়ে কবি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তাঁর কাব্যজীবনে তার মূল্য অপরিসীম। উৎসর্গ, খেয়া,

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, রাজা, ডাকঘর প্রভৃতি রচনা বা অরূপ-লীলারসের এই বিস্তৃত অধ্যায়টি তাঁর মূল কাব্যপ্রেরণার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন অভিমত বালকোচিত, বরঞ্চ মর্তপ্রীতিমূলক জীবনরসকে কবির অরূপ-সাধনাই গভীরতর ও যথার্থতর করেছে, এবং বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের মধ্যে স্থাপিত করেছে—রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পৌর্বাপর্য লক্ষ্য ক'রে এমন যৌক্তিক ধারণা পোষণ করাই সংগত।

'নৈবেদ্য' কাব্যে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি অতি প্রয়োজনীয় আলোচ্য দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। তা হ'ল তাঁর কাব্যের বাঙ্‌নির্মাণের কৌশল, ভাষাশিল্পের উদ্‌যোগ ও পরিণাম। বলা বাহুল্য, শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভার এই দিকটি এতাবৎ আলোচনায় উপেক্ষিতই হয়ে এসেছে। অথচ একথা অবশ্য স্বীকার্য যে কোনো কবিই প্রথম কাব্যারম্ভ থেকেই বচনভঙ্গির সুপরিণামের অধিকারী হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথও হননি। বাঙ্‌নির্মাণের নৈপুণ্য কখনো কবির ও সাধারণের অগোচরে তাঁর অন্তরে আপনা হতেই সৃষ্ট হতে থাকে, কখনো তাঁর সজ্ঞান প্রচেষ্টা বাইরেও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যদিও কাব্যের আভ্যন্তরীণ রস ও বাহ্যরূপ মহাকবির এক প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়, আচার্য আনন্দবর্ধন এই মহামূল্যবান নির্দেশে অলংকারাদিময় কাব্যদেহ গঠনে কবির পৃথক প্রচেষ্টা সম্পর্কে অন্তর্ধারণা রোধ করেছেন, তথাপি প্রকাশধর্মী নিগূঢ় কবি-প্রতিভার স্ববশে গৃহীত পদার্থনিচয়ের স্বরূপ অনুসন্ধানে উৎসাহই দিয়েছেন; এবং ঐ নির্দেশ পরিণত প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবিদের প্রৌঢ় রচনা সম্পর্কে প্রযোজ্য এই কথা ব'লে, যে সব সাধারণ সমালোচক কোনো কাব্যের বহিরঙ্গ রীতি-অলংকারাদির দোষগুণ বিচার ক'রেই

কবির স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তাঁদের পন্থার অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। বস্তুই হোক আর রূপই হোক রবীন্দ্রনাথ যা বাইরে থেকে গ্রহণ করেছেন তা তাঁর প্রতিভার স্ববশেই গ্রহণ করেছেন, এবং আমরা মনে করি ঐরূপ গ্রহণের প্রকারের ও পরিমাণের আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব, নিঃশেষ বিচার অসম্ভব। এই ভাবেই তাঁর রূপসৃষ্টিকৌশলের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি।

বাংলা কাব্যরীতিতে অনায়াসলব্ধ শিল্পসৌন্দর্যে পূর্ণ যে-ভাষার দান তাও রবীন্দ্রনাথের আলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয়। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় খাঁটি প্রাকৃত বাংলার এমন কোনো রূপ নেই যা রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বাস্তব সুখদুঃখের যাবতীয় উক্তি, এমন কি দেশীয় পরিহাসকুশলতাও কোনো না কোনো আকারে তাঁর গদ্যে পদ্যে স্থান পেয়েছে, এবং বাংলা ভাষার অতীত সম্ভাব্য যা কিছু রূপ সব যেন রবীন্দ্র-প্রতিভায় আপনা থেকে এসে যোগ দিয়ে নিজকে গৌরবান্বিত করেছে। আবার সংস্কৃত বচন-বিন্যাসের যে ধ্বনিময় রমণীয়তা ও বাগর্থের হরগৌরী মিলন-সম্পর্ক তাও রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্যকরূপে আত্মসাৎ করেছে। বঙ্গবাণী ও সংস্কৃতবাক্ সমান অনুরাগসহকারে কবিকে বরণ করেছে। এক কথায় প্রাচ্যভাষা-জগতের সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উচ্ছিষ্ট হয়েছে। এই কারণেই এদেশীয় মানুষের যা-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অতি অনায়াসেই রূপলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, মহতী বাক্‌শক্তিই মহৎভাবের বাহন। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি বলা যুক্তিসংগত। কারণ, যাঁদের উপযুক্তভাবে আমরা মহাকবি আখ্যা দিয়েছি সেই বাল্মীকি, কালিদাস, শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতির অত্যাশ্চর্য প্রকাশনৈপুণ্য—যা তৎকালীন এক একটি জাতির সমুদয় মনোভাবের

সম্যক বহনক্ষমতা লাভ করেছে তা-ই তাঁদের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য এবং মহাকাব্য মহৎ কবি-কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে পড়ে, আধুনিক কবি-সমালোচক T. S. Eliot ক্লাসিক নামধেয় উল্লেখ-যোগ্য প্রাচীন রচনার লক্ষণ-নির্ণয়ে প্রকাশ-ক্ষমতার এই অনন্যসাধারণ দিকটির উপরেই লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন।† প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে প্রয়োজনমত ইংরেজি বাক্‌রীতিও রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষ ক'রে গদ্যরচনায় প্রখ্যাত অপ্রখ্যাত বহু ইংরেজ লেখকের উক্তি আংশিকভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অধ্যয়নের দ্বারা তা আবিষ্কার করতে পারবেন। শিক্ষিত বাঙালির আধুনিক বাগ্‌ভঙ্গি—যে-ভাষায় আমরা লিখছি তার কৌশল যে আংশিকভাবে ইংরেজি তা অস্বীকার করা যায় না; এবং বিদেশীয় বহুভাবও যে-কবিকে প্রকাশ করতে হয়েছিল, তিনি যে উন্নত সাহিত্যের অধিকারিণী আমাদের তৎকালীন দ্বিতীয় মাতৃভাষা থেকে সুবিধামত উপাদান সংগ্রহ করবেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অবান্তর বর্জন ক'রে যথাসম্ভব রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের মুখ্য সূত্রটিরই আমরা অনুসন্ধান করব।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত গীতিকাব্যের ভাষা বলতে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাই বোঝাত। পদরচয়িতারা বিচিত্র সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রাকৃত বাংলাকে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের সঙ্গে যেরকম দশদিকে চালিত করেছেন এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই তার মধ্যে যেভাবে বিপুল শক্তি ও সৃষ্টির সম্ভাবনা এনে দিয়েছেন তাতে বিস্ময়ান্বিত হতে হয়। অষ্টাদশ শতকে কবি ভারতচন্দ্র ঐ ভাষাকে পরিমার্জিত ক'রে যে অভিনব কাব্য-রচনারীতি গ'ড়ে তুললেন মোটামুটি তা-ই হ'ল

---

† What is Classic ?

আমাদের কাব্যে মনোভাব প্রকাশ করার তৎকালীন সম্পূর্ণ ভাষা। আধুনিক সাহিত্যের প্রবর্তনা না এলে ঠিক ঐ ভাষাতেই আমাদের বহুদিন চলে যেত। কিন্তু প্রথম অসন্তোষ জানালেন মধুসূদন। মহাকাব্য-রচনার প্রেরণায় তাঁর কবিমানস ক্রিয়াগত বাক্যাংশের ব্যবহারে খাঁটি বাংলা ব্যবহার ক'রে বিশেষণাদিতে ইংরেজি এবং বাগ্‌ভঙ্গিতে মিলিত ইংরেজি ও সংস্কৃতের অনুসরণই যুক্তিযুক্ত ব'লে মেনে নিলে। এই ভাষাই যে বাংলা মহাকাব্যের তথা কাহিনী-কাব্যের শ্রেষ্ঠভাষা তার প্রমাণ পাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য কবির কাহিনী-কাব্য রচনায় এই ভাষার অনুসরণে। কিন্তু নবতম সৌন্দর্যবেদনামূলক নির্বিষয় গীতিকাব্যের মধ্যে ব্যবহারে ঐ পয়ারমূলক কাহিনীর ভাষা যখন অচল হয়ে পড়ল, তখনও নবতম ভাষাসৃষ্টির প্রয়োজন উপলব্ধ হ'ল না, অথবা, ক্ষমতাসম্পন্ন কবির আবির্ভাব ঘটল না। আমি আধুনিক বাংলার প্রথম খাঁটি লিরিক কবি বিহারীলালের কথা বলছি, যিনি কবি অপেক্ষা সাধক ছিলেন বেশি এবং ভাবতন্ময়তার আতিশয্যে যিনি বক্তব্যের একটানা যৌক্তিকতা এবং শিল্পের প্রতি স্বভাবতই অমনোযোগী ছিলেন্।

পয়ারছন্দে রচিত শিল্পসুষমাশূন্য ঘরোয়া গদ্যের বিহারী-ভঙ্গিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোরের 'পদ্যপ্রলাপ' শুরু করেন। 'মানসী' রচনার পূর্বপর্যন্ত কবির অন্তরে যেমন তাঁর নিজের সত্যমূর্তি গঠিত হয়নি, ভাবে ইংরেজির কবিদের ও বিহারীলালের অনুকরণ চলছিল, ভাষাতেও তেমনি পয়ারছন্দে বিহারীলালের থেকে অধিক অগ্রসর কবি হতে পারেন নি। এমন কি ছন্দঃকুশলতা অপেক্ষা ভাবের বহনের দিকে দৃষ্টি অধিক ছিল ব'লে কড়ি ও কোমলেও দু-এক জায়গায় ছন্দঃপতন থেকে কবি অব্যাহতি পান নি। যেমন—

১০ ১০

থাক থাক চুপ কর তোরা | ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে

১১ ৯

আবার যদি জেগে ওঠে বাছা | কান্না দেখে কান্না পাবে যে

অথচ 'মানসী'র কাল থেকেই কবির ছন্দঃকুশলতা ও ভাষানৈপুণ্য কাব্যের দুইকূল প্লাবিত ক'রে নিয়ে চলল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের শক্তি আবিষ্কার এবং পদাবলীর ভাষাচাতুর্য আয়ত্ত করার ফলেই মানসীতে একজন শক্তিমান কবির লেখনীর পরিচয় প্রকটিত হ'ল। অথচ যে-ভাষায় ও যে-ছন্দে বাঙালির হৃদয়বীণা অনুরণনযোগ্যতা লাভ করেছে পদাবলীর সে-ভাষার দিকে লিরিক কবি বিহারীলালের দৃষ্টি স্বতই পড়া উচিত ছিল; তা যে ঘটেনি তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম মাত্র। বিহারীলাল যাকে অস্বীকার করলেন, প্রতিভাসম্পন্ন কবি তাকে সহজেই বরণ করলেন, কারণ, তাঁর অন্তর জানে, এ ছাড়া উপায় নেই। 'মানসী' থেকে রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার প্রথম প্লাবনে পদাবলীর ভাষাই হ'ল কবির গীতিময়তার মুখ্য অবলম্বন। ভুলে, ভুল-ভাঙা, বিরহানন্দ, ভালো ক'রে বলে যাও, ভৈরবী গান প্রভৃতি মানসীর ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের মধ্যেই পদাবলী স্টাইলের যদিচ অধিকতর প্রকাশ,—নিষ্ফল কামনা, ব্যক্তপ্রেম প্রভৃতির মধ্যেও এর প্রয়োগ খুব বিরল নয়। তবে পয়ার-জাতীয় ছন্দে অপেক্ষাকৃত কম এটুকু বলা যায় এবং অমিত্রাক্ষরের আদর্শে রচিত 'মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষরে' মোটামুটি মধুসূদনীয় ভাষাভঙ্গিই প্রযুক্ত হয়েছে। মানসী এবং সোনার তরীতে এই উভয়মুখী ধারাতেই কবি ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করেছেন। ঐ দুই কাব্যের পদাবলী-অনুগ

ভাষার কয়েকটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় অত্যুক্তি ঘটবে না, যদিও ভাষাভঙ্গি কবিতার মধ্যে এমন অনুপ্রবিষ্ট যে তা অনুভবগম্য, দৃষ্টান্ত-যোগ্য নয় ব'লেই আমরা মনে করি :

মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস নয়ন-কূলে ; এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি ; আকুল বাতাসে মদির সুবাসে বিকচ ফুলে ; চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে প্রেমের ঘোর ; গান শুনে আর ভাসে না নয়নে নয়ন-লোর ; কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ ভরি আঁচোর ; কখনো সারারাত ধরি হাত দুখানি, রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া ; তোমার আঁখির মাঝে হাসির আড়ালে ; মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু, প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ; বেলা যে পড়ে এল জলকে চল····· কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল ; লাজে ভয়ে থরথর ভালোবাসা সকাতর তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয় ; পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে ; কাঁচল পরি আঁচল টানি ; উরসে পরি যূথীর হার বসনে মাথা ঢাকি ; তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার সে আঁখি তোমারি হোক ; শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া চিরজীবনের তিয়াসে ; ঘরে যারা আছে পাষাণে পরাণ বাঁধিয়া ; কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব ; ইত্যাদি। (মানসী)

যাহা লয়ে ছিনু ভুলে সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে ; ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী ; বাদর ঝর ঝর গরজে মেঘ, পবন করে মাতামাতি, শিথানে মাথা রাখি বিথান কেশ, স্বপনে কেটে যায় রাতি ; আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে ; আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম ; কলসে লয়ে বারি—কাঁকন বাজে নূপুর বাজে চলিছে পুরনারী ; পারশে

যেন বসিয়াছিল ধরিয়াছিল কর, এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর ; মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত ; এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে তবুও কাছে নাহি যায়, খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায় ; কবরী কেমনে বাঁধিবে নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ; পরশে পরশে দোঁহে করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে ; কমল-ফুল-বিমল শেজখানি নিলীন তাহে কোমল তনুলতা ; জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার বসিয়া আছে, বুকের কাছে ; ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে বাসর-শয়ন করেছি রচন কুসুম থরে ; উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল, উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল, বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী মত্ত বোল ; চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়লাজ, বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে ভাবে বিভোল ; যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস ওগো এস মোর হৃদয়-নীরে ; ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকি ঝিনি, কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ঘিরে ; যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে ; আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়ো না, অমন দীন নয়নে তুমি চেয়ো না ; রয়েছে সাধ, না জানি তার সাধনা ; বিকল-হৃদয় বিবশশরীর ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি ; ইত্যাদি। (সোনার তরী)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনা, মানসীর দু-একটি কবিতায় বর্ণিত পদাবলীর বিষয়বস্তু প্রভৃতি থেকে এই যুগে কবির পদাবলী-প্রীতি সম্পর্কে অনুমানও করা যায়। পদাবলীর অদ্ভুত হৃদয়ভাব-প্রকাশের উপযোগী ভাষার প্রভাব গ্রহণ ক'রে আধুনিক মহাকবি একে ধীরে ধীরে আত্মস্থ ক'রে তুলেছেন। চিত্রা-পর্যায়ে তাই পদাবলীর বাহ্য পরিচয় দুর্নিরীক্ষ্য ('শুধু আমার নূপুর

আমারি চরণে ঝিমরি ঝিমরি বাজে' ইত্যাদি দু-একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া)। একালের একমাত্র জীবনদেবতায় এবং পরবর্তীকালের নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি-রাজা প্রভৃতি ঈশ্বরভাবুকতার রচনায় বৈষ্ণব-পদাবলীর ভঙ্গি প্রয়োজনবশেই কবিকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

একদিকে পদানুসারী গীতিময় ভাষা আর একদিকে মধুসূদন-নবীনচন্দ্র প্রদর্শিত পয়ার জাতীয় ছন্দের কোমল ও পরুষ অক্ষরের মিলনযুক্ত সংস্কৃতবহুল সাধুভাষা বঙ্কিমী আমলের সাধু ও চলিত গদ্যের মতই রবীন্দ্র-রচনায় পাশাপাশি প্রযুক্ত দেখা যায়। একটি মোটামুটি ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে, অপরটি মোটামুটি পয়ারজাতীয় ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যে-উপমানৈপুণ্যে ও অনুপ্রাসের যথোপযুক্ত ব্যবহারে কবিগুরু প্রসিদ্ধ এবং সামাসোক্তি ও উৎপ্রেক্ষায় সিদ্ধহস্ত সেই সব সংস্কৃত অলংকারে ও মোটামুটি আলংকারিক বাক্য গঠনে এখনও রবীন্দ্র-প্রতিভা হস্তক্ষেপ করে নি। দু-একটি উপমাশ্রেণীর অলংকার ও personification কবি স্বকীয় সহজ কাব্য-নৈপুণ্যবশে স্বতই প্রয়োগ করেছেন, সার্থক অনুপ্রাসাদির ব্যবহারে এখনও তাঁর প্রতিভা মনোযোগী হয়নি ; পূর্ণ আলংকারিক বাগ্‌বিন্যাসের অধিকার যেন এখনও আসে নি। সোনার তরী রচনাকালে তাঁর সহজনৈপুণ্যের মধ্যে ভবিষ্যতের এই অসাধারণ সম্ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়। পয়ারজাতীয় ছন্দে লেখা নিম্ন-লিখিত অংশটিকে উদীয়মান কবির সহজ প্রকাশশক্তি ও সম্ভাব্য পরিপূর্ণতার বহু নিদর্শনের অন্যতম ব'লে গণ্য করা যেতে পারে—

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নতশস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন

রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

('যেতে নাহি দিব')

সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির অবিকল অনুসরণ এই সময়কার চিত্রাঙ্গদা নাট্য-রচনাতেই প্রথম দৃষ্ট হয়, এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা' 'সোনার তরী'র সমসাময়িক হ'লেও ওর অভিনব বাক্‌-কুশলতা ঐ নাট্যেই আবদ্ধ ছিল, গীতিকাব্যে তেমন সঞ্চারিত হয়নি বললেও চলে। তথাপি মানসীতে যা লক্ষ্য করা যায় না এমন আলংকারিক বাগ্‌বিন্যাস সোনার তরীতে আছে,—সমুদ্রের প্রতি, প্রতীক্ষা, হৃদয়-যমুনা এই তিনটি কবিতা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। এমন কি নিরুদ্দেশ যাত্রার 'ঝলিতেছে জল তরল অনল, গলিয়া পড়িছে অম্বরতল' ইত্যাদির উৎপ্রেক্ষায় কুমারসম্ভব অষ্টম সর্গের বা কাদম্বরীর সন্ধ্যাবর্ণনার ছায়াপাত বিচিত্র হয়নি। কিন্তু কেবল দু-একটি অলংকারেই সংস্কৃতানুসারিতার বা অন্যথার বিচার হয় না। কবির বচনভঙ্গিকে কবির অভিলাষ অনুসারেই বিচার করতে হবে। সংস্কৃত শব্দের ধ্বনির ঐশ্বর্য তার অন্যতম গুণ। এখনো কবি অভিপ্রেত ধ্বনিগুণের জন্য, ওজস্বিতা-কোমলতার প্রয়োজনে, সংস্কৃত শব্দের চয়নে বা ঐ আদর্শে শব্দগঠনে সচেষ্ট হন নি। নতুবা 'পরশ-পাথর'-এর মত

ভাবের ও চিত্রের দিক থেকে মোটামুটি সুন্দর কবিতাতেও এক-স্থানে নীরস, গদ্যভাষা প্রয়োগে কবির বাধে নি। যেমন—

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা না পায় অভাগা।
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।

মোট কথা, সোনার তরীতে কবির রূপনির্মাণ-প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না, কবি-প্রতিভা কাব্যদেহের উৎকর্ষসাধনে মনোযোগী হয়নি।

চিত্রা-পর্যায়ে সৌন্দর্য-সাধনায় ব্রতী ও জীবনবোধে উদ্দীপ্ত কবি শব্দালংকারে অল্পবিস্তর মনোনিবেশ করেছেন দেখতে পাই। উর্বশী কবিতার 'যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা' অথবা 'শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে' অথবা 'কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী,' প্রভৃতির মধ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহারে যথাযোগ্যতার দিকে কবিকে দৃষ্টি দিতে দেখি। তেমনি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার 'কল্যাণকঙ্কণ করে, সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু' প্রভৃতির মধ্যেও উপযুক্ত শব্দালংকারময় সুন্দর শব্দের উপর কবির আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। আবার 'অন্তর্যামী'তে—

কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল,
কভু সংকটছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম

প্রভৃতির মধ্যেও কাব্যদেহের ধ্বনি-সৌকর্য-সাধনে ব্রতী হতে দেখি।

কিন্তু কল্পনা কাব্যে অনুপ্রাসবহুল ও ব্যঞ্জনাময় শব্দের প্রয়োগে কবিকে যে-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় তা এর পূর্বে দেখা

যায় না। বস্তুতঃ কল্পনার কয়েকটি কবিতাই ভাষাশিল্পীর সুন্দর কাব্যদেহ নির্মাণের সজ্ঞান প্রচেষ্টার উদাহরণ, ফলতঃ কোথাও একটু কৃত্রিম এমন অভিমত প্রকাশ করলে বোধ হয় নিতান্ত অসংগত হয় না। আমরা 'দুঃসময়' কবিতাটি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। মহাকবির কেবল বাহ্যরূপ বা আর্ট নিয়ে বিলাসও অনেক সময় পাঠকের কাছে গুরুতর ব'লে মনে হতে পারে এবং কবি খেলাচ্ছলে যা সৃষ্টি করেন তা কোনো না কোনো অর্থের সূত্রে গৃহীত হয়ে গভীর কাব্যপ্রেরণার উত্তম উদাহরণ ব'লে পরিগণিত হতে পারে। 'বর্ষামঙ্গল' এবং 'আবির্ভাব'ও এই শ্রেণীর সৃষ্টি, যদিও রূপের দিকে থেকে এরা 'দুঃসময়' থেকে অধিকতর উন্নত।

কিন্তু কেবল সুললিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দেই নয় বিলম্বিত-যতির পয়ারশ্রেণীর ছন্দেও কবি ভাবানুযায়ী শব্দচয়নশক্তির সার্থক প্রয়াস দেখিয়েছেন। 'বর্ষশেষ' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর নৃত্য,' 'নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি,' 'উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চিরেখা' এবং 'খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি' প্রভৃতি কাব্যাংশে নূতনতর শব্দযোজনার দ্বারা কবি যে দীপ্ত-গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জিত করতে চাইছেন তা অতি স্পষ্ট। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। এইজন্য আমরা কল্পনা-কাব্যকে কবির ভাষা নিয়ে পরীক্ষামূলকতার একটি বিশিষ্ট অধ্যায় ব'লে মনে করি। ইতিপূর্বে আমরা দুঃসময়-অসময় কবিতার 'স্বর্গপথে' নামক পাণ্ডুলিপির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। গ্রন্থন কর্তৃপক্ষ এই পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ ক'রে রবীন্দ্র-রসিকদের মহা উপকার করেছেন। পরবর্তী 'ক্ষণিকা'য়

কবির স্বভাব এত সহজ, স্পষ্ট ও কৃত্রিমতা বা অতিশয্যহীন যে মনে হয়, কবি যেন অকস্মাৎ লিরিক কাব্যের ক্ষণিক মুহূর্তের উপযোগী স্বকীয় ভাষা এতদিনে খুঁজে পেয়েছেন। আমরা কল্পনা-কাব্য থেকে কবির পরীক্ষামূলক অনুপ্রাসশিল্পের কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি, এদের কতকগুলি সার্থক ও তুলনারহিত, আবার কতকগুলি অল্পবিস্তর আতিশয্যযুক্ত। কল্পনার পূর্বেকার কোনো রচনার সঙ্গে এরকম বচনভঙ্গির তুলনা মিলবে না।

'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া।'
'এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত, ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে'
'অতি ভৈরব হরষে জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে'
'উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে'
'কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি'
'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া'
'বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন'
'কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে'
'বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল দুকূলে।'
'গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে'
'উর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে'
'নবীন নবনী-নিন্দিত করে দোহন করিছ দুগ্ধ'
'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে'
'ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ'
'আলোক-পরশে মরমে মরিয়া'

—ইত্যাদি

সুনির্বাচিত অনুপ্রাস প্রয়োগের এই ঘটা ইতিপূর্বে ঘটেনি। কবির এই সময়কার ধ্বনিপ্রিয়তার জন্যে মেঘদূত ও বিশেষভাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দই দায়ী ব'লে আমাদের মনে হয়। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসও কবিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকবে। অর্বাচীন সংস্কৃত কাব্যে রসগভীরতা অপেক্ষা কলাকুশলতার দিকটি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, জয়দেবে যার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ, এবং 'রমণীকমনীয়কপোলতলে পরিপীতপটীররসৈরলসঃ। অয়মঞ্চতি পঞ্চশরানুচরো নবনীপবনীধুবনঃ পবনঃ' প্রভৃতির মত বিক্ষিপ্ত শ্লোকেও যা লক্ষিতব্য। কাব্যের শিল্প-গুণের দিকে কবি-প্রতিভার সতর্ক দৃষ্টির কারণ, কবি মনে করতেন—প্রকাশই কবিত্ব, রূপনির্মাণই আসল কবিকর্ম, বচনের মধ্য দিয়েই অনির্বচনীয়তা রক্ষা করতে হয়, এবং আধুনিক কবি ইলিয়টের মত 'Genuine poetry can communicate before it is understood' এমন কি অতিরিক্ত কলাকৌশলবাদী সংস্কৃত আলংকারিকদের মত (অন্ততঃ কল্পনা রচনার যুগে) তাঁর নিম্নলিখিতরূপ মনোভাব হওয়াও বিচিত্র নয়—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াপি বা।
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া ন হ্রিয়তে মনঃ॥

বস্তুতঃ কল্পনায় কোথাও কোথাও যে ধ্বনিবিন্যাসের অতিরেক ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ক্ষণিকের। অতি শীঘ্রই কবি তা কাটিয়ে উঠেছেন, 'কথা' ও 'ক্ষণিকা'র সংযত যথোপযুক্ত ও সার্থক অনুপ্রাস-প্রয়োগ এবং শব্দযোজনশক্তিই তার প্রমাণ দেয়। অতঃপর কবি সংস্কৃতের ধ্বনিমন্ত্রকে তাঁর প্রতিভার এমনি অঙ্গীভূত ক'রে ফেলেছেন যে তাঁর স্বতউৎসারিত কবিমানসের প্রকাশ ব'লে কোনো সন্দেহ থাকে না। কল্পনা কাব্যের মধ্যেই এমন কয়েকটি রচনা রয়েছে যাতে

অনুপ্রাস-বাহুল্য দোষ নেই, শব্দপ্রয়োগের মধ্যেও প্রয়াসের কোনো চিহ্ন লক্ষিত হয় না, পরীক্ষামূলকতার কোনো লক্ষণই নেই। রূপে ও রসে সামঞ্জস্যময় অনবদ্য প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি এদের বলা যেতে পারে। আমরা উদাহরণস্বরূপ 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা, মম শূন্যগগনবিহারী' এই গানটি এবং 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' এই কবিতাটির কথা বলছি। 'বৈশাখ' কবিতাটির চিত্রনির্মাণ-গত যে চারুত্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার কতখানি সার্থক শব্দযোজনার ফল, কবিতাটির রূপবিচারেই তা উপলব্ধ হবে। 'ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,' 'তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু,' 'দগ্ধতাম্র দিগন্তের,' 'শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠ,' 'রহি রহি দহি দহি,' 'আবর্তিয়া তৃণপর্ণ ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া' প্রভৃতির বচন-বিন্যাস ও অনুপ্রাস-প্রয়োগ রুদ্রমূর্তি বৈশাখের একটি পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক চিত্র আমাদের নয়নগোচর করতে সহায়তা করেছে।

কল্পনার এই পরীক্ষামূলকতার পরেই কবির সিদ্ধহস্তে কথা ও ক্ষণিকার চিত্র ও সংগীতে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী অপূর্ব কবিতাগুলি রচিত হয়। 'অভিসারে'র 'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা, অঙ্গে আঁচল সুনীলবরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ' চিত্রটিই 'কথা'র কলানৈপুণ্যের সর্বোত্তম সৃষ্টি। এ ছাড়া 'সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ, বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান, মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান দ্বারী ফুকারিয়া বলে' কিংবা 'দিবসের শেষ আলোক মিলাল নগরসৌধ-পরে' প্রভৃতির রূপনির্মাণও অপূর্ব। ক্ষণিকার লৌকিক বাংলা ছড়ার ছন্দের মধ্যেও কবির যথোপযুক্ত সুন্দর অনুপ্রাসের অভাব নেই, তাঁর নৈপুণ্যগুণে এ চাতুর্য সৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়েছে, স্বকীয় প্রকট অস্তিত্বে বাইরে অবস্থিত নেই। যেমন—

বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল-চোখে করুণ আঁখিজল

অথবা—

চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা

অথবা—

পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত

* * *

আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়

অথবা—

ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।

অথবা—

কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত।

অথবা—

শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।

ক্ষণিকায় ছড়ার ছন্দে মধ্য ও অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার খুবই বেশি, কিন্তু তা এমনি সুপ্রযুক্ত যে কর্ণপীড়ার তো প্রশ্নই নেই, কাব্যের অবর্ণনীয় মাধুর্যের আস্পদ হয়েছে। অপরপক্ষে ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে রচিত নববর্ষা, আষাঢ়, অবিনয় প্রভৃতি কবিতাতেও—

বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে,
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে।

প্রভৃতির মত অংশ সহজেই মেঘদূতের মত শ্রেষ্ঠ রচনার সমধর্মিতা দাবী করতে পারে। দেখতে হবে যে কল্পনার 'বর্ষামঙ্গলে' অথবা ক্ষণিকার 'নববর্ষা' কবিতার প্রাচীনধর্মী চিত্রবর্ণনার মধ্যেই কবির ভাষা-কৌশল সীমাবদ্ধ নেই, বাংলার পল্লীপ্রকৃতির বাস্তব চিত্র যেখানে উন্মোচিত হয়েছে এমন 'আষাঢ়' বা 'মেঘমুক্ত' কবিতাতেও ছন্দ ও ভাষাভঙ্গি প্রত্যক্ষতাকে অধিকতর উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। 'আষাঢ়' কবিতার—

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের খেত জলে ভরভর,
*　　　*　　　*
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথপাশে দেখ্ চাহি রে।

অথবা 'মেঘমুক্ত' কবিতার—

কথা-বলাবলি নাহি চলে আর
একাকার হল তীরে আর নীরে তালতলায়।

প্রভৃতিতে বর্ণনাকৌশল ও বাস্তবচিত্রনির্মাণ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে। এমন কি 'নববর্ষা' কবিতার কাল্পনিক দোলা-আরোহিণীর বর্ণনার—

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক, কবরী খসিয়া খুলিছে।

প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য পঙ্ক্তির সঙ্গে একাধারে পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনাতেও ঐ চাতুর্যের স্পর্শ অসংগত হয়নি, যেমন—

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে।

অথবা—

ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে ভাষার প্রাচীনাদর্শীয় ধ্বনিগুণ কবি লৌকিক বাংলাতেই নিষ্পন্ন করতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষার এই শক্তির আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

সংস্কৃত ভাষাদর্শ বাংলায় প্রতিফলিত ক'রে অথবা সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার পরিণয়বন্ধনে কবি যে-সিদ্ধিলাভ করলেন তার ফল হ'ল সুদূরপ্রসারী। বলাকা-পুরবী-মহুয়ার রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণামের যুগের বিখ্যাত কবিতাগুলিতে ও নটরাজের সংগীতে এই বচন-বিন্যাস-চাতুর্যই কবির অভিপ্রেত জীবন ও অরূপের সমন্বয়ের অন্তর্গূঢ় রসটি প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। ঐ যুগের 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' বলাকার পাখার ধ্বনি, পুরবীর 'কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল' ও 'বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে' থেকে মহুয়ার 'মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী' এবং বনবাণীর 'মিলন-মাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে রক্তিম আগুনে', এমনকি পত্রপুটের 'নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী'র বর্ণনা পর্যন্ত সংস্কৃত-বাংলার মিলন-প্রলাপেই মুখরিত।

কবিতার চেয়ে সংগীতে এই চমৎকারিত্বের দিকটি অধিকতর সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের

সঙ্গে কথার সমান অধিকারের জন্যে কথার মোহ সৃজনের দিকে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। সংগীতে কবি অনুপ্রাসের ধ্বনিগুণকে সুরের অতিরিক্ত অলংকাররূপে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। "নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর" এর মেঘমন্দ্রধ্বনির চরম উদাহরণের কথা অথবা 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' এর সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের ভঙ্গিতে নিয়মিত ধ্বনিমাত্রিকতার কথা বাদ দিলেও "চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণী-মঞ্জরী সঞ্চলিতা" অথবা "কেশরকীর্ণ কদম্ববনে মর্মর মুখরিল মৃদুপবনে, বর্ষণহর্ষভরা ধরণীর বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা" কিংবা "নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু; পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র-ভানু" প্রভৃতির অসাধারণ ধ্বনিময়তা অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে কবির অভিপ্রেত ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে। অবশ্য, বিশেষ কতকগুলি মর্মমুখী গানে ও কবিতায় বাউলধর্মী কবি ভাষাভঙ্গিতে আন্তরিকতাপূর্ণ অথচ অচতুর সারল্যের পথ বেছে নিয়েছেন দেখা যায়।

'নৈবেদ্য' কাব্যটিকে আমরা ভাব-সন্ধিকালের রচনা ব'লে মনে করেছি। কালিদাসের প্রকৃতি-আত্মীয়তামূলক তপোবনের জীবনাদর্শ ও উপনিষদের ধর্মাদর্শের রাজ্যে বিচরণের ফলরূপে আমরা এই কাব্যটিকে পেয়েছি। নৈবেদ্য যেন এই সময়ের আদর্শলোকে বিচরণশীল কবি-মানসের ঘনীভূত প্রকাশ। তাই কাব্যটির প্রায় সর্বত্র আত্মহারা জাতিকে প্রাচীন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসও লক্ষিত হয়। কিন্তু এই কাব্যটি ঐ ধর্মাদর্শ থেকে অরূপ-অনুভূতিতে সংক্রমণের ইতিহাসও বহন করছে। নৈবেদ্যে যে ঈশ্বরভাবুকতা আছে তা 'খেয়া' কাব্যের

নানা রচনায় দৃষ্ট কবিধর্মের স্বকীয় প্রবণতা-জাত অরূপ-ব্যাকুলতা নয়, বহুল পরিমাণে আদর্শের দ্বারা উদ্দীপিত,—তথাপি এই কাব্যেই আমরা যেহেতু প্রথম ঈশ্বরের ধারণা পেলাম, কবি ধীরে ধীরে ভিন্ন রাজ্যে পদক্ষেপ করছেন বুঝলাম এবং যেহেতু এর প্রবল ধর্মভাবের জাগরণ থেকে পরবর্তী অরূপানুভূতির অধ্যায়ের অনিবার্য সম্ভাবনা সূচিত হ'ল, সেইহেতু, কবির কাব্যজীবনের বিকাশের দিক থেকে এই কাব্যটির বিশেষ মূল্য আছে ব'লেই আমরা মনে করি।

প্রতিভার বিকাশ

তৃতীয় পর্যায়

অরূপানুভূতির প্রারম্ভ

'নৈবেদ্য' থেকে 'শারদোৎসব'

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত কবির রোম্যান্‌টিক ভাবাবেশ যা মূলতঃ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে কখনো সৌন্দর্য-দর্শনে কখনো বা মর্ত-প্রীতির ব্যাকুলতায় উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল তা সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই কবি-প্রতিভাকে অরূপ-দর্শনে নিয়োজিত করেছে। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ রোম্যান্‌টিক অনুভূতি-সর্বস্ব কবির এই ভাবান্তরে উত্তরণ বিচিত্র কিছুই নয়। কারণ, ভাববাদী রোম্যান্‌টিক অনুভূতিপ্রবণ কবিরা যে কতক পরিমাণে মিষ্টিক হতে পারেন তার প্রমাণ উনিশ শতকের কয়েকজন ইংরেজ কবির মধ্যেই দেখা গেছে। মিষ্টিকদের একমুখী ভাবময় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অরূপের ধারণায় আসা সম্মুখে আর একপদ মাত্র অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষা করে। ইংরেজি সাহিত্যে নব্য রোম্যান্‌টিক কবিদের মধ্যে, বিশেষতঃ কেল্‌টিক রহস্যময়তা নিয়ে আবির্ভূত স্বপ্নদ্রষ্টা ইয়েট্‌সএর মধ্যে ঐ পরিণাম কতকটা লক্ষ্যগোচর হতে পারে। অন্য কোনো দৃষ্টান্ত থেকে না হোক রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কবির রচনাতে রূপময় রসলোক থেকে অরূপলোকে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা থেকে এ অনুমান অসংগত নয় যে ভাবসর্বস্ব মহৎ কাব্যোপলব্ধি ও ধর্মোপলব্ধির মধ্যে ক্ষীণ ব্যবধান মাত্র থাকে। আর তুলনার দ্বারা একথা বলা যেতে পারে যে ওআর্ডস্‌ওআর্থ বা শেলি যদ্যপি অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্বারদেশ থেকে ফিরে এসেছেন এবং ইয়েট্‌স প্রবেশ

করেছেন মাত্র, প্রাচ্য কবি অতি সহজেই সে রাজ্যে বিচরণ করতে পেরেছেন। এইজন্যে যাবতীয় রোম্যান্টিক ভাবপ্রবাহ রবীন্দ্র-সমুদ্রে সার্থক সমাপ্তি লাভ করেছে ব'লেও আমরা মনে করি।

রবীন্দ্র-কাব্যের এই ক্রমপরিণামের সূক্ষ্মসূত্রটি আমাদের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন থাকার ফলে কবির অরূপের স্বরূপ, অরূপ-প্রেরণার আরম্ভ, কাব্য-যৌবনের সৌন্দর্য-সত্তা ও জীবন-দেবতার সঙ্গে অরূপের সম্বন্ধ প্রভৃতির ক্ষেত্রে অপরিস্ফুট ও অপরিণত ধারণার অবকাশ ঘটেছে। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে অরূপের আবির্ভাব যেন দ্রুত ঘটেছে ব'লেই মনে হয় এবং তার কারণের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন হবে না। প্রথমতঃ জীবনদেবতার উপলব্ধির মধ্যে বিকাশ-পরায়ণ কবি-আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ এবং সেই সূত্রে ক্রম-পরিণামের পথে ধাবমান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিশ্বের যোগ-আবিষ্কারের পরমতম বিস্ময়, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন প্রাচ্যসাহিত্য—মূলতঃ কালিদাসের সঙ্গে কবির গভীর পরিচয়ের ফলে সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ, তপোবনাদর্শ ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাদর্শের প্রতি কবির স্থির অনুরাগ-প্রতিষ্ঠা—এই দুটি ঘটনা কবির কাব্যজীবনকে দ্রুত পরিবর্তনের পথে নিয়ে গেছে এবং ধর্মাভিমুখী করেছে, নৈবেদ্যে যে ধর্মাভিভবের প্রথম প্রকাশ।

অল্পসংখ্যক কয়েকটি গান এবং বহুসংখ্যক চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতায় 'নৈবেদ্য' পূর্ণ। নামেই প্রকাশ একটি আধ্যাত্মিক ভাব এর সমস্ত রচনাকে ঘিরে আছে। নৈবেদ্যে বিশুদ্ধ কাব্য যে নেই তার কারণ যে-আদর্শ এতাবৎ কবির অন্তরে সঞ্চিত হচ্ছিল তাকেই কবি এখানে রূপ দিয়েছেন। তপোবনাদর্শ ও উপনিষদের ধর্মাদর্শ কবিকে এই যুগে কী পরিমাণ মুগ্ধ করেছিল তার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় নৈবেদ্যই বহন করছে। চৈতালিতে যে ভাবধারার আরম্ভ, নৈবেদ্যে তারই

পূর্ণতা। নৈবেদ্যের চতুর্দশপঙ্‌ক্তির কবিতাগুলি কবির এই আদর্শের রূপায়ণ হিসেবেই সাধারণ্যে সুপরিচিত এবং সংহত ও সংযত রীতি-গাম্ভীর্যে মূল্যবান্। ভাবে ও ভঙ্গিতে ক্লাসিকধর্মপ্রবণতাই এর একমাত্র কাব্যস্বরূপ।

নৈবেদ্য ভগবদ্‌ভাবময় সত্য, কিন্তু ভাবাদর্শের বন্ধনই এখানে লক্ষণীয় বিষয়, কবিমানসগত মুক্ত উপলব্ধি নয়,—অর্থাৎ এখানে কাব্য-উপলব্ধির সূত্রে প্রাকৃতিক লীলার মধ্যে প্রকাশমান অসীম কবিচিত্তকে ব্যাকুল করছেন না—যেমন করেছেন খেয়াতে অথবা গীতাঞ্জলিতে, এমন তর্ক উত্থাপন করলে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়। এমন কি প্রারম্ভের গানগুলিতেও উপলব্ধির বিস্ময় অপেক্ষা উপলব্ধ বস্তুর স্বরূপ এবং অনুরাগীর অন্তরের প্রার্থনার ভাবই মুখ্যভাবে দেখা দিয়েছে এমন মন্তব্য করাও অযৌক্তিক হবে না। কারণ, উপলব্ধির বিস্ময়ের মধ্যে কবির স্বকীয় অরূপ কিভাবে আসছে তার পরিচয় আমরা অব্যবহিত পরেই উৎসর্গ ও খেয়ার মধ্যে পাচ্ছি। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহযোগে উদিত প্রজ্ঞা অপেক্ষা প্রত্যয়ই যেন মধ্যযুগের মিষ্টিকদের মত নৈবেদ্যে কবিকে অধিক অনুপ্রাণিত করেছে—

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয় বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয় করে বাস।
বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি, অন্ধ বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে, নাই তার কোনো ত্রাস।

জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধির অতীত এই প্রত্যয়ই যে সর্ববিষয়ে ঈশ্বরানুরাগীর অবলম্বন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির এই প্রত্যয় তাঁর প্রথম ভগবদুপলব্ধির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ আদর্শপ্রেরণামূলক কিনা সে সংশয় স্বাভাবিক। উপনিষদের সঞ্জীবনরস যে কবির এই ভগবৎ-

মুখিতার কারণ তাতেও সন্দেহ নেই। তথাপি এই অভিপ্রায়ের মূলে কবি-প্রতিভার স্বকীয় কোনো নির্দেশ নেই, উপনিষদের বাহ্যপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে বাহ্যভাবে একজন অতি সাধারণ কবির মতই তিনি এই কবিতাগুলি রচনা করেছেন, এরকম ধারণা তাঁর একালের আদর্শ-প্লাবনের মুখেও পোষণ করতে বাধে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কবিধর্মের অভিলাষবশতই অরূপমুখী হবেন, বর্তমানে উপনিষদ তাঁর ঐ অভিলাষকে ঐশ্বর্য দিয়ে প্রগল্‌ভ করেছে মাত্র, এরূপ অনুভবই যথার্থ অনুভব। এই কারণে, কবিতাকে বাদ দিয়ে তার অন্তর্বর্তী কবিকে দেখতে পেয়েছি ব'লেই, নৈবেদ্যকে আমরা অরূপ-সাধনার প্রবেশদ্বারের সমীপে বর্তমান ব'লে মনে করেছি।

দেখা যায়, কয়েকটি কবিতাতেই জীবনের সঙ্গে অনন্তের যোগ যেন কবির কাব্য-প্রেরণার সূত্রেই ঘটেছে। নিম্নলিখিত অংশে কবির বিশিষ্ট পুরাতন প্রকৃতিভাবুকতার সঙ্গে বর্তমানে উদিত অনন্তের ধারণা যেন অবাধে স্বতই যুক্ত হয়ে পড়েছে—

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।
জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত। এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,

মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যতারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল,
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

অথবা—

……………সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়।

দেখা যাচ্ছে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র যুগের বিশ্বাত্মবোধের মধ্যে কবির যে বিস্ময়-ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল তা-ই এখন অসীম সম্পর্কিত ধারণায় কবিকে চালিত করছে। নিম্নলিখিত অংশেও তাই, বসুন্ধরা তার রূপরসগন্ধ নিয়ে কবিকে কেবল মুগ্ধ করছে না, ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিমিত্তভূত সত্যের ধারণাতেও ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে—

একি শ্যাম বসুন্ধরা,—সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরু-পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। একি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।
তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,

ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন,
অসীম বিচিত্র কান্ত।

এই প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচিত 'সোনার তরী' অধ্যায়ের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার প্রবল রোম্যান্টিক উপলব্ধির কথা স্মরণ করা যাক্—'মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে, যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে, আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ অনুভব তারি' ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে যেন সেই অনুভূতির আশ্রয়েই কবি বর্তমানে তাকে অতিক্রম করছেন ও বিশ্বব্যাপী কোনো এক শক্তির অস্তিত্ব আপনার অন্তরে অনুভব করছেন। সেই পূর্ব কাব্যজীবনের স্বার্থবিস্মৃত সৌন্দর্য-উপলব্ধির বা বিশ্বাত্মবোধের মুহূর্তগুলি যে কবি-বর্ণিত অসীম বা অরূপের অপরিস্ফুট আভাস তা কবি মাত্র এখন জানতে পারলেন। এখানকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে কবির পূর্বেকার কাব্যোপলব্ধি যে ভগবদুপলব্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও কিভাবে রূপান্তর ঘটছে তার পরিচয় কবি দেননি, দিতে পারেনও না। কারণ, উপলব্ধির প্রকারমাত্র কবির আয়ত্তগম্য, কার্যকারণ-পরম্পরা অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকের বিচারযোগ্য। কবি বলছেন—

তখন করিনি নাথ, কোনো আয়োজন ;
বিশ্বের সবার সাথে হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে ; কত মুহূর্তের 'পরে,
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ। লই তুলি
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি,—

* * *

খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি, আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসংগীত সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।

শেষের কয়টি পঙ্‌ক্তিতে কবি স্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ দিলেন যে পূর্বতন প্রায়-অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-অনুভূতি প্রভৃতিকে মাত্র এখন বিশ্বসংগীতের সঙ্গে যুক্ত ক'রে উপলব্ধি করতে পারছেন। অর্থাৎ ঐ সকল অনুভূতি কেবল নিজ মনোবিকার নয়, তার মূলে যে বিশ্বব্যাপী অরূপের লীলা রয়েছে, তা সবেমাত্র আজ কবি বুঝতে পারছেন। এর থেকে এই অনুমানও করা যায় যে নৈবেদ্যের পূর্বে রচিত কাব্যের মধ্যে কুত্রাপি ভগবদুপলব্ধি নেই। এই হ'ল কবির বিশ্বদেবতা সম্পর্কে প্রথম সচেতন অনুরাগ।

উপনিষদের ধর্মাদর্শের সূত্রে কবির প্রথম ভগবদুপলব্ধির স্পর্শ এখন পাওয়া গেল, যদিও কিভাবে তিনি রোম্যান্টিক ভাব-বিহ্বলতা থেকে অনন্তের মধ্যে এলেন সেই সংক্রমণের প্রকার বা ঐ অনন্তের স্বরূপ বহুল পরিমাণে পাঠকের অগোচরে থেকে গেল। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, উপনিষদের আলোচনা ও ব্রহ্মমন্ত্র রচনার কালেই নৈবদ্য রচিত হয় ব'লে ঈশ্বরের কাব্যময় অনুভূতির দিককে আবৃত ক'রে ভাবাদর্শপ্রবণতাই এতে অধিকমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু এর পরবর্তী কালে রচিত 'উৎসর্গে'র কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির পার্থিব ইন্দ্রিয়ানুভূতির অপার্থিবত্বে সহজ সংক্রমণের ইতিহাস মুদ্রিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে কবিমানসের যে বিহ্বল রসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আগত হ'লেও বস্তুজগতের সঙ্গে একান্তই সম্পর্কবিহীন, আনন্দময় শুদ্ধ রসস্বরূপ উপলব্ধি মাত্র। যেমন—

মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশচকিত
কোথা গো স্বপনবিহারী।

এখানে কবি যাকে নানাভাবে সম্বোধন ক'রে আসবার জন্যে অনুনয় জানাচ্ছেন তিনি কে? উত্তরে শুধু এই বলা যায় যে তিনি আর কেউ নন, কবির তৎকালীন রসানুভূতির মুহূর্তের ব্যক্তিরূপ কল্পনা মাত্র। স্বপ্নময়তা এবং চকিতের স্পর্শই এর স্বরূপ, রাজপথে প্রত্যক্ষতার মধ্যে এর আনাগোনা নেই। কবির মানসে ইতিপুর্বে বহুবার এবংবিধ রসচর্বণা ঘটলেও এই রসমুহূর্ত সম্পর্কে ভাববার অবস্থা, এর স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা এবং একে অসীমের অনুভূতি ব'লে সাব্যস্ত করার যৌক্তিকতা যেন এতাবৎ উপস্থিত হয়নি। কোনো বিদেশিনীর পদশব্দ ইতিপুর্বে বারবার শ্রুতিগোচর হ'লেও একে সুদূরবর্তী অসীমের রহস্যের আলোকে নূতন ক'রে দেখার মত মনোভাব তখন কবির ছিল না। উৎসর্গের নিম্নের পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবির রসোপলব্ধির বিস্ময়-ব্যাকুলতা এবং তাকেই একটি সত্তারূপে উপলব্ধি করার আগ্রহ আরো পরিস্ফুট-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সুদূর অনির্দেশ্যতা ত্যাগ ক'রে একটি বিশেষ রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। পুর্বেকার নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা ও মর্ত-ব্যাকুলতাই যেন এখন একটি পরিবর্তিত আকার লাভ করতে চলেছে—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে

তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।

* * *

সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার,
সে কথা যে যাই পাসরি।

উৎসর্গের এই সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতার নিশ্চিত মনোভাবকে জীবনদবতার লীলানুভূতি ব'লে গ্রহণ করলে ভুল হবে। কারণ, আমরা পুর্বেই দেখেছি যে জীবনদেবতা ঈশ্বর নন, তার সম্পর্কে কবির এহেন ব্যাকুলতাও নেই এবং চিত্রা-পর্যায়ের পর জীবনদেবতাবোধের প্রয়োজনও লুপ্ত হয়ে গেছে। ইনি জীবনাতিশায়ী অরূপের পুর্বাভাস মাত্র। এখানে কবি ধরা-না-দেওয়া অনন্ত মুহূর্তগুলিকেই ব্যক্তিরূপে দেখেছেন এবং ঠিক এর পরবর্তীকালেই কার্যকে কারণরূপে দেখার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি অনায়াসেই এই মুহূর্তগুলিকে কার্য মনে করেছেন ও তার কারণরূপে বিদ্যমান অরূপ বা অসীমের কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। খেয়াতেই অসীমের মধ্যে এই স্বাভাবিক উত্তরণের অবস্থা ঘটেছে, ঠিক উৎসর্গে নয়। উৎসর্গে ঐ কার্য থেকে নিশ্চিতরূপ কারণে যাওয়ার সংক্রমণ অবস্থা সূচিত হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ পরীক্ষা ক'রে দেখলে বোঝা যাবে কবি অরূপকে জানা-না-জানার অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। কবিমানস একে উপলব্ধি ক'রেও ঠিক ধরতে পারছে না। কেবল 'অস্তি' এই ধারণাটুকুর মধ্যে স্থির হয়েছে—

কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়
"কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়
"কে গো সে"—

* * *

তোমারে জানি না চিনি না একথা বলতো
কেমনে বলি ?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি যাও
খনে খনে যাও ছলি।
জ্যোৎস্নানিশীথে, পূর্ণশশীতে
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে।

এই অভাবনীয়ের চকিত-স্পর্শ-বিহ্বল রসাপ্লুত কবিচিত্ত এখানে রসরূপ কার্যের পশ্চাতে অসীমরূপ কারণ অনুসন্ধান করছেন। আরো পরে প্রকৃতির লীলার মধ্য দিয়ে ও মানুষী স্নেহ প্রেম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশমান অরূপকে কবি নিশ্চিতরূপে ধরেছেন। রসরূপ মানসিক অবস্থাটিকে অরূপস্পর্শ ব'লে তখন স্পষ্টভাবে অভিহিত করেছেন। বিশ্বের তাবৎ অনুভূতির মধ্যে অরূপই আমাদের কাছে এসে ধরা দিচ্ছেন (তু৹-'তিনিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই'), কবির বিশ্বদর্শনের এই মূল কথাটি তত্ত্ব

আকারে নৈবেদ্যের 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির মধ্যে বলা হ'লেও ঐ তত্ত্বের কবিস্বভাবের মধ্যে যথার্থ উপলব্ধির রূপ পরে দেখলাম। পার্থিব রসোপলব্ধিই যে ঈশ্বরোপলব্ধি এই তত্ত্বটি পরিণত জীবনে সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যেও কবি নানাভাবে বিবৃত করেছেন এবং 'রসো বৈ সঃ' 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' প্রভৃতি উপনিষদের উক্তি উদাহৃত ক'রে বিশুদ্ধ রসানুভূতিকে অনন্তের সঙ্গে বিজড়িত ক'রে দেখেছেন। বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যেও যেমন, আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যেও তেমনি একের বিকাশলীলা চলেছে, কাব্য-আলোচনার ক্ষেত্রেও কবি এই হেগেলীয় ধারণার পরিচয় দিয়েছেন (সাহিত্যের পথে—তথ্য ও সত্য দ্রঃ)। আমরা 'পুরবী'র 'আহ্বান' কবিতাটির আলোচনাকালে কবির অন্তরগত রসবোধের সঙ্গে ঐক্যানুভূতির এই দিকটি সম্পর্কে পরে আলোকপাত করেছি। 'এক' বলতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুভূতির বাইরের কোনো সত্তাকে লক্ষ্য করেন নি। এইখানে রবীন্দ্রনাথের চরম মনোনিষ্ঠা। 'সত্য' বলতেও কবি মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির বাইরের দার্শনিক বা গাণিতিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। মানবীয় রসবোধের মধ্যেই যে অসীমের বা অরূপের স্বাদ গ্রহণ করা যায় এই ধারণাটি রবীন্দ্রকাব্যে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে দেখা দিয়েছে।

উৎসর্গের 'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে' ইত্যাদি কবিতাটিতে যদিচ আধ্যাত্মিক কোনো আইডিয়ার প্রভাব অনুভব করা যায়, নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে তিনি কবির স্বানুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত এমন মনে করা স্বাভাবিক, যেমন—

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি।

জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে
শুধু তুমি আমি এসেছি। —ইত্যাদি

অথবা— চিরকাল এ কী লীলা গো অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে অদ্ভুত এই দোল।

'প্রবাসী' এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এখানে কবি বিশ্বের অণুপরমাণুর সঙ্গে আপনার যোগ উপলব্ধি ক'রে পরমুহূর্তে এই অকারণ যোগের হেতুভূত অসীমের কথাই দৃঢ়ভাবে জানালেন—

যেথা যাই আর যেথায় চাহিরে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে
প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে
জনমে জনমে মরণে।

এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে নৈবেদ্যের সদৃশ মনোভাব ব্যক্ত হ'লেও, ঐ সকল কথা আমরা পরবর্তী গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যে বার বার পেয়েছি। এইসব কারণেও নৈবেদ্যকে আমরা অরূপানুভূতির প্রবলতম সহায়ক ব'লে মনে করেছি। উৎসর্গের ৪২ সংখ্যক কবিতাটিতে বিশ্বলীলার দ্বৈতরূপের মধ্যে (সুন্দর ও ভয়ংকর) অরূপের আবির্ভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বৈতরূপের মধ্যে বিশেষতঃ দুর্যোগময় দুঃখরূপের মধ্যে অরূপ সম্পর্কিত ব্যাকুলতার আবির্ভাব কবির বিশিষ্ট উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব যে জীবন-দার্শনিকতায় লীন হয়ে গেছে তার মূলে অরূপ-উপলব্ধির এই বৈশিষ্ট্যটিই কাজ করেছে। উৎসর্গের এই কবিতাটির মধ্যে প্রথম আমরা কবির ঐ অনুভূতির পরিচয় পেলাম। কবিতাটি একটু পরেই আলোচিত হচ্ছে।

উৎসর্গের সব কবিতাই যে অসীমের দ্বারপ্রান্তের বর্ণনা এমন নয়। সাধারণ মানুষের হতাশা ও বেদনা, নারীর মাধুর্য, প্রকৃতি-প্রীতি

প্রভৃতি সম্পর্কে লেখা কবিতাও এতে আছে। নৈবেদ্যের মত উৎসর্গও অরূপ-সাধনায় প্রবেশের প্রস্তুতির বার্তা বহন করে, শুধু উৎসর্গ এক পদ অগ্রসর এইজন্যে যে নৈবেদ্যে অধ্যাত্মবোধ প্রাচীন ধর্মাদর্শের দ্বারা গ্রস্ত, উৎসর্গে তা স্বকীয় অনুভূতির প্রত্যক্ষে জীবন্ত। কিন্তু উৎসর্গের—

'আলো নাই, দিন শেষ হোলো ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ'

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির কবিতার পার্থিব ভাব-বিলাসকে অধ্যাত্মে আরোপিত ক'রে কবিতার রূপক ব্যাখ্যায় যেন প্রবৃত্ত না হই।

কবির অরূপ-উপলব্ধি তাঁর প্রকৃতি-ভাবুকতা বা প্রকৃতি-সৌন্দর্য-বিহ্বলতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতি-উদ্বোধিত রসোপলব্ধির এই নিবিড় মুহূর্তগুলি কী ভাবে কবিকে অসীমের উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে তার আশ্চর্য পরিচয় 'খেয়া' এবং 'শারদোৎসবে' বর্তমান। ধরা যাক খেয়ার দ্বিতীয় কবিতা 'ঘাটের পথে'—যেখানে বেণুশাখার উপর বারিপতনের ঝর ঝর শব্দ, একূলে ওকূলে কালো ছায়া, আঁধার সন্ধ্যায় জোনাকির চমকের সঙ্গে ঝিল্লির ঝংকার—এসব বর্ণনার পর কবি ঐ পথের জন্যে ব্যাকুলতার কথা জানাচ্ছেন—

ওগো দিনে কতবার ক'রে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।

এবং কল্পনা করছেন—

আমি বাহির হইব ব'লে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।

ঠিক এই প্রকারের উৎপ্রেক্ষা যদিচ পূর্বেকার কোনো কোনো কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, উভয়ের ব্যঞ্জনার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ তা একটু সহৃদয়তা সহকারে বিচার করলেই ধরা পড়ে। যেমন ক্ষণিকার বিখ্যাত 'নববর্ষা' কবিতায়—

ওগো নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে বসে অমল বসনে
শ্যামল বসনে।

প্রভৃতিতে প্রকৃতিভাবুক কবির প্রাচ্যভাবানুগত একটি চিত্রকল্পনা মাত্র প্রকাশ পেয়েছে। যেমন একজন আধুনিক কবিও † অতিশয়োক্তি সহকারে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনায় বলছেন—

মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক !

অথচ 'ঘাটের পথে' কবিতায় কেবল প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত কোনো সত্তার প্রতি ইঙ্গিতের ভাবই স্পষ্ট। এমনকি উৎসর্গের পূর্বে উল্লিখিত 'আমি চঞ্চল হে' কবিতার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতেও অসীমের প্রতি নির্দেশই দেওয়া হয়েছে—

রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়,
তরুমর্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।

এই অনুভূতি সম্পর্কে দর্শনশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যতার প্রশ্ন তু'লে কবি একটু আগেই বুঝিয়েছেন যে এই রহস্যময় 'কী' বা 'কে' শাস্ত্র ও তত্ত্বের

† করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁধাধরা মতামতের মধ্যে ধরা না গেলেও তাঁর কাছে সত্য, যেহেতু এ তাঁর উপলব্ধ বিশেষ একটি সত্তা—

না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।

* * *

পণ্ডিত সে কোথা আছে, শুনেছি না কি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামতো।
যাবনা আমি তাঁর কাছে, তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যতো!
(উৎসর্গ)

রসাবেশের এই ক্ষুদ্র নিমেষগুলির মূল্য কী তা 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' এই দুটি কবিতায় কবি ব্যঞ্জনার দ্বারা জানাতে চেয়েছেন। পার্থিব সম্পর্কশূন্য অপ্রয়োজনীয়তা-পরিচ্ছিন্ন এই শুভক্ষণের জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুতির আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয় সর্বস্বই ত্যাগ করতে হয়—

'মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে।'

'কৃপণ' কবিতাতেও কবির এই উপলব্ধি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, সমস্ত পার্থিব প্রয়োজন-সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারলে তবেই রসরূপ অনন্তের সাক্ষাৎলাভ করা যায়। যে পরিমাণে স্বার্থমুক্তি সেই পরিমাণেই অমূল্য অনন্তের স্বাদ লভ্য। দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তগুলিই অনন্তস্বরূপ; কবিবুদ্ধি এর কারণ অনুসন্ধানে ধীরে ধীরে স্বতই অনন্তত্ব ও অসীমত্বগুণযুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বে গিয়ে পৌছেচে। 'খেয়া' কাব্যের বৈশিষ্ট্য—অরূপ-সাধনায় কবির প্রবেশের পথ ও পদচিহ্ন এর মধ্যে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এবং এর মাহাত্ম্য হ'ল এই যে কবি-সাধকের অরূপসিদ্ধির প্রকারও এখান থেকেই একরকম সুনির্দিষ্ট

হয়ে গেছে। কারণ, অরূপলীলার স্বরূপটি এখানেই প্রথম পরিস্ফুট-ভাবে কবিচিত্তের গোচরীভূত হয়েছে। আমরা এখান থেকেই একরকম ধারণা করতে পারি যে কবির অরূপ বা অসীম বা এক প্রকৃতির লীলার মাধ্যমে রসরূপে কবির অন্তরে প্রবেশ করছেন, পূর্বনির্দিষ্ট কোনো আইডিয়া বা তত্ত্বরূপে নয়। নৈবেদ্যের মধ্যে যদিই ভারতীয় আদর্শের প্রভাব লক্ষণীয়, এখানে সহজ উপলব্ধির নির্মল আলোক উপভোগ্য।

এই কাব্যটির প্রবেশমুখে স্থাপিত বিষাদ-করুণ সুরের 'শেষ খেয়া' কবিতাটি কবির অরূপলোকে প্রবেশের সংকেত দিচ্ছে। কবিতাটি একান্তভাবে বাউলধর্মী রচনা। বাউল সংগীতের ভাষা ও ভঙ্গি এবং অন্তর্নিহিত জন্ম-মৃত্যু, যাওয়া-আসা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতাই এই কবিতাটির শান্তবিষাদের কারণ। 'সোনার কূলে', 'চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে', 'সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে', 'আমার ঘাটে', 'ঘরেও নহে, পারেও নহে' প্রভৃতি নানান উক্তি বাউলদের অনুরূপ কল্পনাভঙ্গির পরিচয় দেয়। সমস্ত কবিতাটিতে কবির পারগামী বৈরাগী মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন অনেক বাউল-সংগীতের সোজাসুজি ব্যাখ্যা হয় না, একমাত্র মরমীর কাছে তার অর্থ উপলব্ধির বিষয় মাত্র হয়, তেমনি কবির সদৃশ বৈরাগ্যের অবস্থায় নির্বিঘ্নচিত্তে পার্থিবতা অপার্থিবতার মাঝখানে থাকার কালে এই কবিতাটির রস উপভোগ্য হতে পারে। 'ঘরেও নহে পারেও নহে' প্রভৃতিকে সাধনপথে অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তির অবস্থা, বা 'কেমন ক'রে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে' প্রভৃতিকে কবির হারিয়ে যাওয়া কোনো নিবিড় অরূপ-উপলব্ধির স্মৃতি ইত্যাদি-রূপে একরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু ঐরকম ব্যাখ্যা

বেশীদূর টেনে নিয়ে গেলে রূপকের জালে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। ঘরছাড়া বৈরাগীর মন নিয়ে প্রবেশ করলে কবিতাটির মর্ম কতকটা অনুধাবন করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না ব'লে আমরা মনে করি। বস্তুতঃ এই কবিতাটি রবীন্দ্রচিত্তে বাউল সংগীতের অসামান্য প্রভাব নির্দেশ করে এবং কবির বিশিষ্ট অরূপমুখীনতার চিহ্ন বহন করে।

খেয়ার কবিতাগুলির প্রকৃতি-অনুরাগ ও সহজ প্রকাশ-ভঙ্গি 'ক্ষণিকা'র বহু কবিতার সঙ্গে তুলনার যোগ্য। বিশেষ এই যে, খেয়ায় পার্থিব প্রীতিকে অতিক্রম ক'রে অপার্থিব অনুভূতিই কবিমানস আশ্রয় ক'রে বিদ্যমান। অবশ্য খেয়ায় কয়েকটি বিশুদ্ধ প্রকৃতি-প্রীতিরসের কবিতাও রয়েছে এবং দু'একটি কবিতায় পার্থিব প্রকৃতি-প্রীতি ও পার্থিবাতিশায়ী অতীন্দ্রিয় নির্বিশেষ রসানুভূতি এই দুয়ের মধ্যে কবিচিত্তের একটা দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। যেমন 'নীড় ও আকাশ' কবিতায় ওআর্ডস্‌ওআর্থ এর Skylark এর মত শূন্যে বিহার ও মর্ত্তে প্রত্যাবর্তনের অবিরাম যাতায়াত কবি বর্ণনা করেছেন। কবির এই দ্বিধা পরবর্তী কাব্য-জীবনেও প্রকাশ পেয়েছে এবং তা লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন ('পথে ও পথের প্রান্তে' দ্রঃ)—'মনটা দুই বাসার পাখি, একটা কাছের বাসা, আর একটা দূরের।' অবশ্য এই কবিতাটির মধ্যে এই কথাও রয়েছে যে ইতিপূর্বে কবি ঠিক এরকম শূন্যে বিহার করেন নি—

> নীড়ে বসে গেয়েছিলেম আলোছায়ার বিচিত্র গান।
> সেই গানেতে মিশেছিল বনভূমির চঞ্চল প্রাণ।
>
> * * *
>
> আজ কি আমায় গাইতে হবে নীল আকাশের নির্জন গান।
> নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরান ?

আপন মনের পাইনে দিশা, ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা
যখন করি বাঁধন-হারা এই আনন্দ-অমৃত পান।
তবু নীড়েই ফিরে আসি, এমনি কাঁদি এমনি হাসি
—ইত্যাদি

বোঝা গেল কবির মানব-অনুরাগের সঙ্গে এই আকাশবিহারী শূন্যতায় অরূপানুসন্ধানে যাত্রা অসংগতিপূর্ণ নয়। বিখ্যাত 'প্রবাসী' কবিতাটিতে কবি এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের অপূর্ব সমাধান ও সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। আবার দেখা যায় 'সমুদ্র' কবিতায়, জানা পৃথিবীকে নয়, অন্তবিহীন অজানাকেই অভিনন্দিত করার আগ্রহ প্রবল। সে অবস্থা যেন পার্থিব উপভোগরত দ্বৈতাবস্থা নয়, অসীমের সঙ্গে তখন কবি যেন একীভূত, যেমন—

যাক না মুছে তটের রেখা, নাইবা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক না সাড়া বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একের দেশে একেবারে এক নিমেষে
লও রে বুকে দু-হাত মেলি অন্তবিহীন অজানাকে।

দুএকটি কবিতায় আবার প্রকৃতি ও অসীমের সম্পর্ক-বিরহিত শুষ্ক ও ব্যর্থ কর্মপ্রচেষ্টার জীবন নিন্দিত হয়েছে। যেমন 'দিনশেষ' ('হায়রে বিজন দীর্ঘরাত্রি, হায় রে ক্লান্ত কায়া') অথবা 'সব পেয়েছির দেশ' কবিতা। 'বন্দী' কবিতায় তেমনি লোভ, অহংকার ও প্রতাপের বশে আমাদের বন্দিত্ব পরিস্ফুট করা হয়েছে—

ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ করবে জগৎ গ্রাস
আমি রব একলা স্বাধীন, সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত নাইকো তার ঠিকানা।

গড়া যখন শেষ হয়েছে কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে আমারি এই ডোর।

বহু পরের 'রক্তকরবী' নাটকে প্রকৃতি-রসসম্পর্কহীন মনুষ্য-আত্মার এই বন্দিত্ব ও বন্ধনমোচন দেখানো হয়েছে। খেয়ার রচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার রাষ্ট্রনৈতিক বহির্জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে কবির বাস্তবতা থেকে এই উত্তরণ কিছুটা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতি-রসে নিবিড় এই মুহূর্তগুলির আনন্দ অতিবাস্তব কর্মময় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে লভ্য নয়, এ যে বাস্তব-অতিশায়ী, অনাবশ্যক, অহৈতুক অথচ অতি সহজ তা কবি জানালেন 'অনাবশ্যক' (কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে), 'তোরা কেউ পারবি নে গো পারবি নে ফুল ফোটাতে' ইত্যাদির মধ্যে।

পূর্বে উৎসর্গের একটি কবিতায় প্রকৃতির দ্বৈতরূপ বর্ণনা এবং এর মাধ্যমে অনুভূত অরূপের কথা উল্লেখ করেছি। এতে প্রকৃতিগত আনন্দময়তা সম্পর্কে কবি বলেছেন—

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি মোর সভাতে?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদ-বিহ্বল শোভাতে।

প্রকৃতির আনন্দরূপের মধ্যে অরূপের এই আবির্ভাব কিন্তু সাময়িক। ঋতুপরিবর্তনে পুনশ্চ যে নবীনের আবির্ভাব হয় তার মূর্তি দুঃখময়, ভয়ংকর-সুন্দর। কবি প্রকৃতির এই দুই মূর্তিকে অরূপের বিভিন্ন আকারে প্রকাশ ব'লেই মনে করেন। এই জন্যে—

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝর ঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,

*   *   *

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস মূরতি ধরিয়া।

*   *   *

ললাটে তিলকরেখা
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়োনা অতিথি সব ধন মোর না লয়ে।

প্রভৃতির মধ্যে অরূপের এই কঠোর প্রকাশের নিকটে সর্বস্ব সমর্পণ কবিমানসের প্রকৃতিগত রস-উপলব্ধির পরিণামের একটি অবস্থা সূচিত করে। ‘ক্ষণিকা’র আবির্ভাব নামক বিখ্যাত ভঙ্গিকুশলতাময় কবিতাটিতে “বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়, এলে তুমি ঘন বরষায়” ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির দুই রূপে কবির মুগ্ধত্ব বর্ণিত হ’লেও সেখানে অরূপের ইঙ্গিত নেই। নিসর্গরসবিহ্বলতাই সেখানকার সর্বস্ব। অথচ এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হ’ল এই এর বিশেষত্ব। এই দুই কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থেকেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রকৃতি-বিহ্বলতা থেকেই কবির অসীম-বিহ্বলতার উদয়।

শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্রের মাধ্যমে কবি এই যে অবর্ণনীয় রসস্বরূপ অসীমকে পেলেন তা যদি কেবল পার্থিব সুখানুভূতিরই বশবর্তী হ’ত তাহ’লে অসীমের কল্পনা হ’ত খণ্ডিত। কিন্তু দুঃখানুভূতির মধ্যেও

তিনি লভ্য, বরঞ্চ দুঃখের গভীরতায় অরূপের সম্যক্ দর্শন যেমন সম্ভব তেমন সুখে নয়, এই তত্ত্বটিও খেয়ার অরূপ-সাক্ষাৎকারের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্ব-সৃষ্টিলীলার দুটো দিক, একটাতে আনন্দময়তা, আর একটাতে দুঃখবেদনা, ভয়ংকরের অনুভূতি,—এই দুই রূপের মধ্যেই কবি লীলাময়ের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। দুই বিরোধের মধ্যে, একের লীলা-দর্শনই তাঁর অরূপদর্শনের সার কথা, এবং 'খেয়া' থেকে আরম্ভ ক'রে বলাকা-পুরবীকালের জীবন-অরূপের সমন্বয় পর্যন্ত কবির এই উপলব্ধিটিই কেমন মূলসূত্ররূপে কাজ করেছে তা আমরা পরে বিশেষভাবে দেখব।

আগমন, দুঃখমূর্তি, দান, হার প্রভৃতি খেয়ার কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায় লীলাময় অরূপ রুদ্র-ভয়ংকরের বা দুঃখের রূপে প্রতীয়মান। 'আগমনে' নিশীথরাত্রে মেঘগর্জন ও বিদ্যুতের ঝিলিকের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যার পদক্ষেপ কবির শ্রুতিগোচর হ'ল তাকে বরণ ক'রে নেওয়ার বা সর্বনাশকেই আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করার দুর্বার উৎসাহ নিশ্চয় সাধারণ নয়। এই উৎসাহ 'দান' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে—

এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্র হেন ভারি।

*　　　*　　　*

ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে কী পেলি তুই নারী।
নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তথাপি এর কাছে কবিকে আত্মদান করতেই হবে—

সর্বনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি যায় সকলি যাক,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে খেলা মোদের করব সারা। (হার)

প্রয়োজনের জগতে এ হ'ল হেরে যাওয়ার, ভোগসুখে বঞ্চিত হওয়ার, দারিদ্র্য আদি সর্ববিধ দুঃখের মধ্যে পতিত হওয়ার কথা। কিন্তু কবি কিসের জোরে একে অতিক্রম ক'রে হেরে গিয়ে জিতবেন তা ভাববার বিষয়। তাই 'হার' কবিতার শেষে অতিরিক্ত পার্থিব ভোগী, দাম্ভিক স্বার্থমূঢ় ব্যক্তিদের যেমন একদিকে নিরস্ত করেছেন তেমনি হেরে জেতার কথা বা অহং-লোপের আনন্দময়তার জয়ের কথা কবি যুক্তির আকারে উপস্থাপিত করেছেন—

এই হারা তো শেষ হারা নয়, আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কিনা কে বলবে তা সত্য ক'রে।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে বিকিয়ে দেব আপনারে।

এখানে প্রশ্ন উঠবে কবি কি তাহ'লে নিবৃত্তিমার্গের সাধনাই গ্রহণ করবেন? এর উত্তরে সংক্ষেপে এই কথাই বলা যাবে যে কখনোই নয়, বাস্তব জীবনকে গ্রহণ ক'রে, অথচ প্রবৃত্তি, লোভ এবং স্বার্থকে পরিস্ফীত না হতে দিয়ে প্রয়োজনমুক্ত জীবনে যে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায় তা-ই কবির কাম্য হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কবির অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে জীবন-দর্শনও মিশ্রিত রয়েছে। উক্ত দুই লীলাকে অভিন্নভাবে গ্রহণ ক'রে এর সঙ্গে নিজকে সম্পূর্ণ মিলিত করাই যে কবির অভিলাষ, তাঁর কাব্যোপলব্ধির চরম কথা, তা অসংখ্য গানে, কবিতায়, ঋতুনাট্যে, অরূপনাট্যে, ঠাকুরদা বা তৎসদৃশ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দ্বৈতলীলার অনুভবের মধ্যে দুঃখানুভূতির দিকটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং কী ক'রে এই দুঃখানুভূতির উত্তরণ-স্বভাব তাঁকে অরূপদর্শনে

উত্তীর্ণ করলে তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-কাব্যের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঠিক পরিচয় লাভের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিছক প্রকৃতি-প্রীতি থেকে মানবপ্রীতি বা সুখদুঃখময় বাস্তব-জীবন-প্রীতিতে পরিবর্তন ('এবার ফিরাও মোরে') এবং তা থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে ঘনীভূত দুঃখবোধের মধ্যে অরূপোপলব্ধি কী প্রকারে ঘটল এবং সেই অরূপের স্বরূপই বা কী তা ঐ প্রবন্ধে কতকটা বিস্তৃতভাবেই কবি আলোচনা করেছেন। খেয়ার 'আগমন' ও 'দান' কবিতা সম্পর্কে কবি বলছেন—

"খেয়াতে আগমন ব'লে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ ক'রে শান্তিতে ঘুমিয়েছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা।

ঐ খেয়াতে 'দান' ব'লে একটি কবিতা আছে।······এমন যে দান

এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে। শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।”

অরূপ-উপলব্ধির এই বৈশিষ্ট্য বিকাশশীল কবি-প্রতিভার স্বকীয় হ'লেও তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে থাকবে। নিসর্গে দুই পরস্পর বিপরীত রূপের অবস্থান ইতিপূর্বে নিসর্গ-ভাবুক এবং সাধক কবি বিহারীলালের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু তিনি এর সমাধানে মনোযোগী হন নি বা অসমর্থ ছিলেন (সাধের আসন দ্রঃ)। তাঁরও পুর্বে বাংলাসাহিত্যে শ্যামাসংগীত রচয়িতাদের বিশেষতঃ রামপ্রসাদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি স্বতই এর স্বরূপ ব্যাখ্যায় এবং দুঃখের পরিত্রাণের উপায় নির্দেশে নিয়োজিত হয়েছিল কিন্তু তার প্রকৃতি অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র ব'লে এখানে আলোচনার অবকাশ রইল না।

দুঃখকে আলিঙ্গন করার এবং সেইভাবে বরণের দ্বারা তাকে অতিক্রম করার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নাট্যে যেরূপ চিত্রিত করেছেন পুর্বেকার ভারতীয় সাহিত্যে বা দর্শনে ঠিক তেমনভাবে দেখা যায় না। জ্ঞানমার্গে দুঃখ এবং আনন্দ উভয়প্রকার পার্থিব চেতনাকেই প্রাতিভাসিক সত্য বা মিথ্যা ব'লে অস্বীকার করা হয়েছে। ভক্তিমার্গে প্রেমময় ও আনন্দময় ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা শুদ্ধ আনন্দ লাভের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে বাস্তব দুঃখের কারণ তৃষ্ণা ও বাসনা সমূলে উৎপাটিত ক'রে সুখদুঃখহীন অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে বলা হয়েছে। যদি বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ আনন্দরূপ ব্রহ্ম এবং বৃহৎ দুঃখ স্বরূপতঃ অভিন্ন ব'লে মনে করেন এবং তদর্থে উপনিষদের বহু মন্ত্র উদ্ধার করেছেন, তাহ'লে তিনি নূতন কিছু উপলব্ধি করলেন একথা বলা যায় কী ক'রে? তার উত্তরে এই বলা যায় যে —'ব্রহ্মই সত্য' যদিও এর অতিরিক্ত উপলব্ধির আর কিছুই নেই,

তথাপি যেহেতু ব্রহ্মের স্বরূপ অনির্ণেয় সেইহেতু তাঁকে নানাভাবে জানার আগ্রহেই নানা মতবাদ দেখা দিয়েছে দর্শনে ও সাহিত্যে। সুতরাং নবভাবে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির অবকাশ অবশ্যই আছে। তাছাড়া উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন মনীষীর দ্বারা বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথও স্বীয় ধারণার অনুকূল ভাবেই উপনিষদকে গ্রহণ করেছেন (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। সুতরাং উপনিষদের ও পরবর্তী পরিস্ফুট কোনো দার্শনিক ধারণার মধ্যে দাতা-গ্রহীতারূপ সম্পর্ক স্থাপন যুক্তিযুক্ত নয়। উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ধারণার বিচার করতে গেলে অপ্রামাণ্যতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। রবীন্দ্র-মানসে যে যে অর্থে উপনিষদের বচনগুলি গৃহীত হয়েছে সেই সেই অর্থে আবার উপনিষদের প্রভাব বিচার করার পাকচক্র থেকে এতাবৎ আমরা অব্যাহতি পাই নি। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-মানসের স্বকীয়তাকে উদ্ধার ক'রে দেখতে হবে। ইন্দ্রিয়গত আনন্দ ও দুঃখের হেতুরূপ প্রতীয়মান দ্বৈত সত্তার বিরোধলীলার মধ্য দিয়ে অরূপ প্রকাশিত হচ্ছেন কবির এমন ধারণা বরঞ্চ হেগেল্‌এর দর্শনমতে প্রামাণিক ব'লে গণ্য হতে পারে। আর যদি ঈশ্বর বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাপক ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে কবি একথা বলেন যে—অরূপের লীলাময়ত্ব উপলব্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায় এবং তখন সুখদুঃখ সমস্তই একাকার হ'য়ে বিশুদ্ধ আনন্দরূপ প্রতিভাত হয়, যেমন কবি বলেছেন নিম্নের পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

'তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

এবং এই প্রকারে সর্ববিধ দ্বৈতনির্মুক্ত হওয়ার আদর্শ প্রকটিত হয়, তাহলে বোধ হয় বিরোধের সমাধান হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব

নিয়ে রবীন্দ্রনাথে কোনো বিরোধ নেই, তাঁকে উপলব্ধি করার প্রকার নিয়েই ভারতীয় দর্শনে মোটামুটি বিশিষ্টাদ্বৈতের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি নূতন। তাঁর ধারণাকে কবির ধারণা ব'লে পিছনে ফেলে রাখলে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

সুখদুঃখানুভূতি সম্পর্কে কবিধর্ম ও শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় পুনঃপুনঃ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন, বাহুল্যভয়ে ঐ সম্পর্কে নানা অংশের উদ্ধার থেকে বিরত হলাম। রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদিগোষ্ঠীর মতই দুঃখকে আত্যন্তিক ব'লে স্বীকার করেন নি, সুখকেও অর্থাৎ বিষয়ানন্দকেও নয়। কারণ, তাঁর মতে কেবল সুখরূপ জীবস্বভাব স্বার্থের আবিলতাসমাকীর্ণ, বিষয়তৃষ্ণাজাত, বদ্ধতার কারণ এবং অপরিশুদ্ধ; দুঃখও জৈব সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার ধর্ম। অদ্বৈতবাদীদের সঙ্গে কবির পার্থক্য এই যে, কবি ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত বাস্তব দুঃখসুখকে পরিত্যাগ করতে চান না, কারণ তিনি মনে করেন এগুলিকে গ্রহণ না ক'রে আনন্দময়তায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, জীবনকে গ্রহণ না ক'রে ত্যাগ করা বা জীবনাতীত হওয়া যায় না। যথাভূত সুখদুঃখ গ্রহণপূর্বক এ দুয়ের অতীত আনন্দময়তা কবির কাম্য,—এই হ'ল রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের সার কথা। অনেক সময় গভীর দুঃখ আমাদের ঐ অতীত অবস্থায় নিয়ে যায়, এজন্ম কাব্যেও সুখানুভূতি অপেক্ষা দুঃখানুভূতির উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। গভীর বাস্তব দুঃখ কবির মতে উন্নীত (Sublimated) হয়ে আনন্দে রূপান্তরিত হতে পারে যেমন Tragedyর দুঃখ ও ভয় বিশুদ্ধ আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু গভীর বাস্তব দুঃখকে অতিক্রম করার মত তুরীয় মানসিক অবস্থারও অধিকারী হওয়া চাই, অথবা অরূপলীলার সঙ্গে নিজকে একীভূত করা চাই। এই নিয়েই কবির ধনঞ্জয়বৈরাগী ও ঠাকুরদা চরিত্রের কল্পনা। এঁরা

সেই অবস্থায় উঠেছেন যেখানে উপনীত হ'লে দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ হওয়া যায়—যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। বাস্তব দুঃখের উপরে সাহিত্যিক দৃষ্টি আরোপ ক'রে কবি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত একটি চিঠিতে বলেছেন—

> দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা-সূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্।

বলা বাহুল্য, বাস্তব দুঃখ থেকে নির্বিশেষ ভূমার আনন্দে উৎক্রমণ রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আর আমাদের সান্ত্বনা এই যে কবি 'দণ্ডীর দণ্ড' নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের চালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি।

ঋতুচক্রের আবর্তনের মধ্যে যে-অরূপের পদধ্বনি কবির শ্রুতির গোচরীভূত হয়েছে ব'লে কবি বারবার উল্লেখ করেছেন তার প্রথম বিস্তৃত পরিচয় 'শারদোৎসবে'র মধ্যে পাওয়া যাবে। শারদোৎসবে কবির উপলব্ধি উপসংহারের বিখ্যাত গানটিতে প্রকাশিত—

> আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
> আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

এই একান্ত রসাস্পদ, রূপের মধ্যে রূপাতীত, পার্থিব প্রকৃতির মধ্যবর্তী রহস্যময় অপার্থিবকে সন্ন্যাসী এবং তাঁর সহচরেরা কিরকম বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন তা নিম্নলিখিত অংশ থেকে বোঝা যায়—

"সন্ন্যাসী। ঐ যে আকাশ ভরে গেল!

প্রথম বালক। কিসে?

সন্ন্যাসী। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্চে আলোতে, আনন্দে! বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্চো না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্চি।

সন্ন্যাসী। তবে আর কি! চক্ষু সার্থক হয়েচে, শরীর পবিত্র হয়েচে, মন প্রশান্ত হয়েচে। এসেচেন, এসেচেন, আমাদের মাঝখানেই এসেচেন। দেখেচো না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কিরকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে!......"

প্রকৃতির মধ্যে অরূপ-উপলব্ধি শারোদৎসবে একেবারে স্পষ্ট। প্রকৃতিকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলেই যে মুক্তি ঘটে তা আলোচনা-প্রসঙ্গে কবি এক জায়গায় বলছেন—

> ......প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে-প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্যসম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সে স্বীকার কখনোই নিষ্ফল নহে।

অন্যত্র কবি শারদোৎসবকে ছুটির নাটক ব'লে অভিহিত করেছেন। 'ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবল একমাত্র হচ্ছে—বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।' প্রয়োজন-সম্পর্করহিত অহেতুক আনন্দের মধ্যেই সন্ন্যাসী, ঠাকুরদা ও ছেলের দল অরূপকে লাভ করেছে। কিন্তু কঠোর কর্মে রত উপনন্দ? কবি বলছেন এইখানেই ঐ অরূপ-উপলব্ধির

বৈশিষ্ট্য। উপনন্দ, নিজের প্রয়োজনে নয়, প্রভুর ঋণ শোধ করতে স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে পুঁথিলেখার কাজ বা কাজের দুঃখ বরণ করেছে। এই স্বেচ্ছায় দুঃখবরণেই তার মুক্তি। সন্ন্যাসী বলছেন— 'লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি! তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।' কবি বলেন, এই ঋণশোধের সৌন্দর্যটিই শারদোৎসবের মূল কথা, কেবল খেলা নয়। "ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখতপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেকটি ঘাস নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে।" বলা বাহুল্য, এখানেও দুঃখানুভূতির মধ্যে অরূপানুভূতির পূর্বপরিচিত তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। অরূপের সঙ্গে মানব-আত্মার যে আদান-প্রদান সম্পর্কটির উল্লেখ কবি এখানে করলেন তা খেয়ায় 'কৃপণ' কবিতাটিতে পূর্বে পরিস্ফুট হয়েছে। ঐ কবিতাটির নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—

হেন কালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" ব'লে বাড়িয়ে দিলে হাত।
মরি এ কী কথা রাজাধিরাজ "আমায় দাও গো কিছু"—
শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা-নিচু।

এই আত্মোৎসর্গের দুঃখাদর্শকেই কবি 'ধর্ম' প্রবন্ধে (শান্তিনিকেতন) ব্যক্ত করলেন—'ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনই পূর্ণতার মূল্য অছে—তাহাই দুঃখ; সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর।.........

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটি মাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়।'

দেখা গেল অরূপ-লীলারসের প্রথম পর্যায়েই মানবীয় সুখের সঙ্গে দুঃখের মর্মগত পার্থক্যের দিকটি কবি উপলব্ধি করেছেন এবং অরূপ-আনন্দের প্রেরণায় দুঃখ, ভয় এবং মৃত্যুও অতিক্রম করে যাচ্ছেন। এই পর্যায়ের পর গীতাঞ্জলিতে বিশেষতঃ গীতালিতে এই ভাবটি অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে এবং বলাকায় কবি দুঃখময় গতির জীবনকে বরণ করেছেন। বলা বাহুল্য, দুঃখকে বরণ ও দুঃখাতিক্রমণের মূলেই কবির অভিপ্রেত জীবন-অরূপের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শারদোৎসবের দুএকটি গানে অরূপ-স্পৃহ কবি সুখত্যাগ ও সর্বনাশকে বরণের আগ্রহ জানালেন—যার মধ্যে 'আনন্দেরি সাগর থেকে' গানটি অন্যতম। কবির অভিলাষ হ'ল—

কোন্ পাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে?
পালের রশি ধরব কসি
চলব গেয়ে গান।

মানুষের সমস্ত আনন্দ ও দুঃখকে একটি নৈসর্গিক রহস্যময়তার মধ্যে গ্রথিত ক'রে রসরূপে উপলব্ধ অরূপের সঙ্গে জীবনের যে উদ্দেশ্যময় সংযোগ-সাধন তাই হ'ল রবীন্দ্র-কাব্যোপলব্ধির মর্মকথা। কবি-দার্শনিক পার্থিব সুখকে আনন্দে উত্তীর্ণ ক'রে দেখেছেন, দুঃখকেও আনন্দস্বরূপ ব'লেই অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে কেবল স্বার্থময় বিষয়ানন্দ ভোগে আনন্দ নেই। তাঁর যুক্তি কতকটা এইরকম: সৃষ্টির যাবতীয় বৈচিত্র্যের

মধ্যে লীলাময় আপনাকে প্রকাশ করছেন। তাঁর প্রকাশ আনন্দরূপ; তা সুখ ও সৌন্দর্যাদি প্রিয় বস্তুর মধ্যেও যেমন অভিব্যক্ত, দুঃখের বা ভয়ানকের মধ্যেও তেমনি অভিব্যক্ত। যেহেতু লৌকিক জগতে কেবল সুখকেই আমরা চরম ব'লে মনে করি ও চাই এবং দুঃখ ও বিপদ প্রভৃতিকে শত্রুরূপে দেখি সেইহেতু অরূপানুভূতিলাভ আমাদের ঘ'টে ওঠেনা। এই তত্ত্বটি 'রাজা' নাটকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

ঋণশোধের অন্তর্নিহিত এই দুঃখতত্ত্বের আত্যন্তিক মূল্য ছাড়া এর অরূপ-উপলব্ধির প্রকারের দিকটি অবহেলার যোগ্য নয়। শারদোৎসব অরূপের আগমনের বিস্ময়রসে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে—'আমার নয়ন-ভুলানো এলে।' এবং উপনন্দকে অতিক্রম ক'রে ঠাকুরদা ও সন্ন্যাসীই সহৃদয় সামাজিকের আকর্ষণস্থান হয়ে উঠেছে। এই 'ঠাকুরদা' চরিত্রের মধ্যে যেহেতু জীবন ও অরূপসিদ্ধি বিষয়ে কবির উপলব্ধ সত্যটি ধীরে ধীরে প্রকটিত হয়েছে তাই এর সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

শারদোৎসবের স্বল্প পূর্বে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' ঐতিহাসিক নাটক হ'লেও কবির বিশিষ্ট জীবনাদর্শের দ্বারা অনুরঞ্জিত। এই নাটকের মূল 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে বসন্তরায়ের চরিত্রে কবি তাঁর তৎকালীন আদর্শ—উদার, প্রেমিক ও সদানন্দ মানুষকে রূপায়িত করেছিলেন। বিসর্জন নাটকের গোবিন্দমাণিক্যও সেকালের এই শ্রেণীর সৃষ্টি। সমগুণান্বিত চরিত্র 'মালিনী' নাটকের 'সুপ্রিয়' আরো একটু অগ্রসর—বাস্তবজীবনবোধে অনুপ্রাণিত। সর্বত্রই এই ধরণের চরিত্রের সঙ্গে বিপরীতধর্মী চরিত্রের সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তে বসন্তরায়ের পাশাপাশি যে-'ধনঞ্জয় বৈরাগী' কল্পিত

হয়েছেন তিনি আরো অধিক অগ্রসর এবং কবির পূর্ববর্তী আদর্শ-অভিলাষের মূলে উৎপন্ন হয়েও বহুলাংশে ভিন্ন। এই চরিত্রে কবির বাউলধর্মী অরূপানুরাগ ও বাস্তব-জীবনের একান্ত মিশ্রণ ঘটেছে। চরিত্রটি খেয়া-শারদোৎসব কালের নবোদিত অরূপানুরাগের পরিচয়—জীবন ও অরূপের সমন্বয়, ভীষণ ও মধুরকে অন্তরে গ্রহণ করার প্রত্যক্ষ প্রথম দৃষ্টান্ত।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রকট জীবনধর্মের দিকটি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত থেকে গৃহীত। প্রায়শ্চিত্ত রচিত হয় ১৩১৬ বৈশাখে। ১৩১৫ সালে গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে এবং এদেশীয় সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। ঐ সময়ে এদেশেও স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা। কিন্তু উক্ত বাস্তব চিত্র থেকে অনুলিখিত হ'লেও ধনঞ্জয় বৈরাগী কেবল রাজনৈতিক সত্যাগ্রহের বিগ্রহ নন, এর সঙ্গে পূর্বপরিকল্পিত ভাবাদর্শ ও অধুনা উপলব্ধ বাউলের যোগে স্বকীয় আশ্চর্য সৃষ্টি। আর এই চরিত্রটি প্রায় অবিকলভাবে বহুপরবর্তী 'মুক্তধারা' নাটকে গৃহীত হ'লেও এবং 'রক্তকরবী'তে আংশিকভাবে অনুসৃত হ'লেও প্রায়শ্চিত্তের অব্যবহিত পরেই 'ঠাকুরদা'র মধ্যে ইনি সত্যাগ্রহী মূর্তি ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ নবকলেবর ধারণ করেছেন।

দেখতে হবে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কবি কোনো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি এবং সত্যাগ্রহী ও বাউল 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'ও সে সমস্যার সমাধান করছেন না। এ বৈরাগীর অর্ধেক মহাত্মা গান্ধীর চিত্র, বাকি অর্ধেক কবির স্বকীয় এবং সব মিলে কার্যতঃ কবিকল্পলোকের বস্তু।

প্রতিভার বিকাশ

চতুর্থ পর্যায়

অরূপানুভূতির পূর্ণতা

'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতালি'

খেয়া ও শারদোৎসবে যে-অরূপ প্রকৃতিগত বিস্ময়-ব্যাকুলতার মধ্যে কবির চোখে ধরা দিলেন তিনি গীতাঞ্জলিতে কবির হৃদয় জুড়ে বসেছেন দেখা যায়। গীতাঞ্জলির মত বহুজ্ঞাত, বহুপঠিত ও বহু-আলোচিত রচনার নৈপুণ্য ও বস্তু-বিশ্লেষণে আমরা কালক্ষেপ করতে চাইনা, শুধু পৌর্বাপর্যের দিক দিয়ে এই উপলব্ধির প্রকার. স্বরূপ .ও পরবর্তী কাব্যস্তরে এর প্রভাব ইত্যাদি বর্তমানে প্রয়োজনীয় বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। গীতাঞ্জলির সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরের রচনা রাজা (১৩১৭), অচলায়তন (১৩১৮), ডাকঘর (১৩১৮) এই নাটকত্রয় এবং গীতিমাল্য ও কতকাংশে গীতালি এই স্তরে আমাদের একত্র বিচার্য হবে।

শারদোৎসবের পর গীতাঞ্জলির গানগুলির রচনার সময় লীলাময়ের প্রকাশ দৃঢ়ত্বে ও ধ্রুবত্বে উপনীত হয়েছে, এবং কবির চিত্তে তাঁর সঙ্গে একটি হার্দ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অরূপের পশ্চাতের প্রকৃতি-লীলার ভূমিকা অপসারিত তো হয়ই নাই বরঞ্চ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এবং পরবর্তীকালের ঋতুনাট্যগুলির রচনা পর্যন্ত সর্বত্র প্রকৃতি-লীলা-নির্ভর অসীমের উপলব্ধিই বহুতরভাবে চিত্রিত হয়েছে। গীতাঞ্জলির রচনাবলীতে মুদ্রিত একশ সাতান্নটি গীতের মধ্যে (শারদোৎসবের কয়েকটি গান সমেত) অন্ততঃ

পঁচিশটিতে অরূপানুরাগের ভূমিকারূপে প্রকৃতির বিশেষভাবে আবির্ভাব হয়েছে দেখা যায়। যেমন, 'আজ ধানের খেতে রৌদ্র-ছায়ায়,' 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ', 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে,' 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,' 'শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে,' 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,' 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,' 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর,' 'এসহে এস, সজল ঘন, বাদল-বরিষনে,' 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,' ইত্যাদি। এ সকলের মধ্যে শারদোৎ-সবে দৃষ্ট অরূপের আকস্মিক আবির্ভাবে উচ্ছ্বসিত চিত্তের পর্যাকুল অবস্থাও লক্ষিত হয়, যেমন—

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
নবতৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
এসেছে এসেছে এই কথা বলে প্রাণ,
এসেছে এসেছে উঠিতেছে এই গান,

এই মনোভাবের দিক থেকে গীতাঞ্জলির সঙ্গে গীতিমাল্য এবং গীতালির কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। গীতিমাল্যে অরূপ-উপলব্ধিতে সিদ্ধ, রসমুগ্ধ কবি-আত্মার বৈচিত্র্য এবং বিস্তারের দিকটিই বিশেষভাবে প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট দেখা যায়, কবি প্রকৃতি-গত অরূপ-চেতনার বিস্ময়-ব্যাকুলতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিবিড় আনন্দ-চৈতন্যময় রাজ্যে উপস্থিত হচ্ছেন, অরূপতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং গীতালিতে অরূপের আলোকে জীবন ও গতিকে দেখছেন। গীতালিতে এসে এইটুকু বোঝা যায় যে অতঃপর অরূপ-রস-চর্বণায় সমাহিত চিত্তেই কবি অবস্থান করবেন না, জীবন ও অরূপের সমন্বয় সাধন ক'রেই তাঁর মানস পরিতৃপ্ত হবে। কবির বর্তমান প্রজ্ঞালোকিত চিত্তের দুঃখবরণের দিকটি যে শারদোৎসব এবং খেয়ায় খুব গৌণ স্থান পায়নি

তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। গীতাঞ্জলির 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান' অথবা 'চিরজনমের বেদনা' প্রভৃতি গানগুলিতে এই দুঃখানন্দ উপলব্ধির কথা বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত দ্বিতীয় সংগীতটির শেষে দুঃখবোধ কিভাবে আনন্দে উত্তীর্ণ হচ্ছে তার আভাস দেওয়া রয়েছে, যা থেকে রসজ্ঞ পাঠক অরূপাভিমুখী কবিমানসের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন—

গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া জাগুক তীব্র চেতনা।

অন্যত্র কয়েক স্থানেই বর্ষাঘন দুর্যোগময় রাত্রির মধ্যে কবিচিত্তের অরূপ-ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে, যেমন—

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।

এই সুখদুঃখাতীত বিহ্বলাবস্থা (তু° গীতালি—দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে) আরো স্পষ্টভাবে কবি নিচের পঙ্ক্তি-গুলিতে জানাচ্ছেন—

অন্তরে আজ কী কলরোল
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয়মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।

ঠিক এই অবস্থাতেই কবির অরূপের উপলব্ধি ঘটল—

আজ এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।

কিন্তু এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গান হ'ল—

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।'

বর্ষাপ্রকৃতি কবির অরূপ-উপলব্ধির যেমন সহায়ক হয়েছে এমন বসন্ত বা শরৎ হয়নি এই ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টিগোচর হবে।

আশা করি, কবির অরূপোপলব্ধির এই বিশিষ্ট মনোভাব সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। এইভাবে প্রকৃতিলীলার মধ্যে লীলাময়ের আগমনসংকেত অন্য কোনো দেশীয় কি বিদেশী কবির অনুভূতিতে এমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ব'লে আমরা জানি না। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই একান্ত মৌলিক স্থির-পরিণামী সত্তাটি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকলে তাঁর কাব্যের স্বরূপও আমাদের অনধিগত থাকবে।

গীতাঞ্জলির এই অরূপানুভূতির পর কবির সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরীয় লীলারসের যে আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যগুলি পরিস্ফুট হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হ'ল নিখিল-মানবের মধ্যে নরদেবতারূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ, অনুরাগ-সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উপাসকের ন্যায় সংযত, শুভ্র ও ভক্তি-বিগলিত ভাবের প্রকাশ এবং অসীমের লীলায় নিশ্চিত বিশ্বাসী কবিমানসের মৃত্যু-অস্বীকার।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বিশাল ভবে', 'একা আমি ফিরব না আর এমন ক'রে', 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো', 'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে', 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন', 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' এবং 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' ও 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' প্রভৃতি কবির মানব-প্রীতি সম্পর্কিত বহুপরিচিত কবিতা-

গুলিকে গ্রহণ করা যায়। এগুলি থেকে নিশ্চিত ভাবে এই অতি সংগত অনুমানে আসতে হয় যে কবির মানব-প্রীতি অরূপানুরাগের দ্বারা গভীরতর হয়ে উঠেছে। পূর্বজীবনের রোম্যান্টিক বিশ্বাত্মবোধ, এমন কি 'এবার ফিরাও মোরে'র বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহও বিশেষভাবে কবি-কল্পনার বস্তুরূপেই অবস্থিত ছিল এমন বিতর্ক শোভন ও সংগত। অধুনা অরূপানুপ্রাণিত স্থির সমাহিত চিত্তে কবি মানুষকে যে-আদর্শের সঙ্গে হৃদয়ে গ্রহণ করলেন তার আন্তরিকতায় আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

আমরা ক্রমশঃ দেখতে পাব অরূপ-বোধের সঙ্গে মিশ্রিত এই উদার মানবীয়তা, দুঃখ ও মৃত্যুকে অস্বীকার প্রভৃতি কবিকে ক্ষণিকের জন্যে গতিলোকে উধাও ক'রে একটি ধ্রুব আদর্শে জীবনকে দেখায় অনুপ্রাণিত করেছে। যেহেতু কবির বিশিষ্ট অরূপানুভূতিই এরূপ জীবনদর্শনের মূলে সেইহেতু অরূপ-সম্পর্কের এই অধ্যায়টি আমরা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই মনে করি।

সৃষ্টির সত্যতা সম্পর্কে স্থির ধারণায় উপনীত কবির নিবিড় মানবানুরাগের পরিচয় এর পর থেকে তাঁর রচনায় বিশেষভাবে ফুটে উঠতে লাগল। 'অচলায়তন' নাটকে কবি এদেশের বর্তমান অমানবীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, বলাকা ও ফাল্গুনীতে দুঃখতাপজর্জর মানুষের মহিমা কীর্তন ক'রে তাকে অগ্রগতিতে উৎসাহিত করলেন, মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও যান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার ক'রে তার স্বরূপে অবস্থিত দেখতে চাইলেন। কাব্য-জীবনের সায়াহ্নেও কবি বাস্তব মানবপ্রীতির বাণীতেই নিজ কাব্যকে চরিতার্থ করতে চাইলেন। কবির এই একান্ত মানবানুরাগের কথা আত্মজীবনবিবৃতির সঙ্গে

Religion of Man এবং 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়েছে। এ দুটি গ্রন্থে তাঁর জীবনদর্শনের প্রায় সম্যক পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'পত্রপুট' কাব্যের একটি কবিতায় কবি আত্মস্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্যে নরদেবতার কাছে নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে,—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙালির ভাবসাধনার মধ্যে মানুষ-জীবনের মহিমা যদিও নানাভাবে লক্ষিত হয়েছে (যেমন বৈষ্ণবদের 'দুর্লভ মানব জনম', সহজ সাধকদের 'সবার উপরে মানুষ সত্য', রামপ্রসাদের 'এমন মানব-জমিন রইল পতিত'), তথাপি ঠিক মানুষকেই অরূপ বা ঈশ্বর ব'লে ধারণা করা হয়নি। মানুষ-জীবন সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। আধুনিক কবি-দার্শনিকের এই ভাববাদী অথচ জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নবতম এবং তাঁর স্বকীয়। এ বিষয়ে বাউল-সাধকদের থেকেও তিনি একপদ অগ্রসর এবং যথার্থভাবে সাধারণ মানুষের আধুনিক কবি।

উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের গীতগুলিতে ভক্তিস্নাত শুভ্র জীবনের প্রতি আকর্ষণ লক্ষণীয়। অরূপ-সমাহিত কবিচিত্তের বিগলন যদ্যপি 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' অথবা 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়' কি 'অন্তর মম বিকশিত কর' ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, তথাপি সাধকের স্বাভাবিক আদর্শপ্রবণতার জন্যে—

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে,
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।

প্রভৃতি এই শ্রেণীর কয়েকটি গান অনেকটা নীতিমূলক হয়ে পড়েছে। উপরিউক্ত কবিতাগুলির কলেবরে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র, অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় এ সম্পর্ক কবিকর্তৃক আরোপিত। কবির অরূপও নরবপু দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ভগবান নন এবং কবিও কোনো বিশেষ স্তরের ভক্ত নন। বস্তুতঃ হার্দ্য সম্পর্কের বলেই কাব্যে এহেন অনুরাগ কল্পিত হয়েছে। এমন কি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির কৃপাভিক্ষারও আত্যন্তিক কোনো মূল্য নেই বা এর মধ্যে বৈষ্ণবীয় কৃপাবাদের ব্যঞ্জনা নেই, বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্পর্ক স্থাপনই এবংবিধ বৈলক্ষণ্যের কারণ। নিম্ন দৃষ্টান্তে 'সাধনা' শব্দে ভজনপুজনাদি শাস্ত্রবিহিত পন্থার প্রতি কবি লক্ষ্য ক'রে বলছেন—

জানি আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল,
চকিতে ফল ফলবে না।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবাদী হ'লেও জীবনবর্জিত বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রকাশভঙ্গির সহায়তার জন্যে কাব্যে পদাবলীর রূপকল্প গ্রহণ করেছিলেন মাত্র।

উল্লিখিত তৃতীয় প্রকারের কবিতায় দেখা যায় সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু কবির কাছে এক হয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ অনুভূতির দ্বারা বহির্বিশ্বে ঈশ্বরীয় লীলা প্রত্যক্ষ করলে স্বার্থময় সুখদুঃখাদির বোধ তিরোহিত হয় এবং মৃত্যুভয় থাকে না। গীতাঞ্জলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, মৃত্যু সম্পর্কে একটি সুনিশ্চিত ধারণায় কবি একালে উপনীত হয়েছেন। ইতিপূর্বে নৈবেদ্যে 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' প্রভৃতির মধ্যে মৃতুকে অস্বীকার করার কথা থাকলেও তা বহুলাংশে উপ-নিষদের ভাবাদর্শ-জাত এমন সংশয় স্বাভাবিক। স্বকীয় উপলব্ধির পথে অরূপকে প্রত্যক্ষ করার পরই মৃত্যুর অবাস্তবতা সম্পর্কে কবির ধারণা জন্মেছে। গীতাঞ্জলি-পূর্ব কাব্যজীবনে কবি যদিও কয়েকবারই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার বা আত্মবিসর্জনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়েই করেছেন। যেমন উৎসর্গের 'অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ' প্রভৃতিতে কল্পনায় বিহ্বল হয়ে কবি মৃত্যু বরণ করতে চাইছেন, সত্যোপলব্ধির মর্মে নয়। এ সম্পর্কে কবির ধারণার ক্রমবিকাশ আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

মৃত্যু সম্পর্কে লেখা পূর্বেকার কবিতাগুলিতে যদি উচ্ছ্বসিত ভাববিলাস দেখা যায়, গীতাঞ্জলি থেকে স্থির উপলব্ধিই অনুভূত হয়। গীতাঞ্জলির কবি যদিও সেই আগেকার রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসী কবিই, তথাপি অধুনা অসীমের ধারণায় উপনীত হয়ে যেন যথার্থতর প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করছেন এমন মনে হয়।

মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে এই জীবনের যাবতীয় উপলব্ধির পূর্ণতা, অথবা কবিকৃত উপনিষদ-ব্যাখ্যার অনুসরণে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে অমৃত, তা যেন এই দার্শনিক কবির একটি বিশেষ সত্যোপলব্ধি। নিম্নলিখিত গানগুলির মধ্যে এই উপলব্ধি বিবৃত হয়েছে—

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।"

"কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে।
জীবনে তুই যা নিয়েছিস
মরণে সব নিতে হবে।"

"মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে।

*　　*　　*

যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে" —ইত্যাদি।

জীবনের যা-কিছু আনন্দের আয়োজন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পূর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করছে একথা রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রথম শোনা গেল। জীবন ও মৃত্যুকে এখানে এক ক'রে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজকে বোধ থেকে বোধান্তরের মধ্য দিয়ে গতিশীল যাত্রী ব'লে মনে করলেন। এখন থেকে বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক দুঃখের রূপ, মৃত্যু, এবং জীবন ও মৃত্যুর একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের ধারণা কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। এর পর থেকে স্পষ্টই দেখা যায় কবি কেবল অরূপ-ভাবনিমগ্ন থাকতে পারেন নি। অরূপ-সমাহিত চিত্তে জীবনকেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং

জীবন ও অরূপের একটা সমন্বয় করেছেন। গীতাঞ্জলির 'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়', 'ঐ যে তরী দিল খুলে', 'যাত্রী আমি ওরে', প্রভৃতি গানগুলি এই সত্যোপলব্ধিজাত প্রাথমিক গতিমুখিতার পরিচয় বহন করছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যসাধারণ স্বকীয় বিকাশের দিক থেকে এগুলির মূল্য অল্প নয়।

গীতাঞ্জলি থেকে গীতিমাল্যে মোটামুটি কবির অরূপ-বিহারী মানসের বিচিত্র সূক্ষ্ম ভাবাবেশ ও ঐ অরূপের স্বরূপ বিবৃত হয়েছে। গীতিমাল্যের অনেকগুলি গান 'রাজা' নাটকের রচনার সমসাময়িক। 'রাজা'য় যেমন এখানেও তেমনি অরূপের একান্ত রহস্যময় স্বরূপ নির্ণয়ে কবিমানস ব্যাপৃত আছে দেখতে পাই। যেমন—

কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।

অথবা—

ডুবিয়ে দিয়ে সূর্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।

এরকম কয়েকটি গানের মধ্যে 'রাজা' নাটকের বিভিন্ন স্থানের প্রতি-ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। অন্য কয়েকটি স্থানে চকিতে বা গোপনে আনন্দ-চৈতন্যের মধ্যে এই রহস্যময় অরূপকে যে-ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তার প্রকার বিবৃত করা হয়েছে। এই উপলব্ধির মুহূর্তগুলি যেমন

তত্ত্বসংকেতে গভীর, তেমনি কবিমানসের বিশিষ্ট অরূপ-মুহূর্তের পরিচয়-বহনে বিস্ময়কর, যেমন—

ভোরের বেলায় কখন এসে পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে।

অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এই রহস্যময়ের স্পর্শ যে কিরূপ ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে তা পরবর্তী 'গীতালি'তেও অনুরূপভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যেমন—

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চ'লে যাবার শব্দ শুনে ভাঙ্‌ল রে ঘুম
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।

গীতিমাল্যের চেয়ে গীতালির গানগুলি আরো অধিক ব্যঞ্জনাধর্মী, এর মধ্যে অরূপ ও তার সঙ্গে কবির ভাবসম্মিলন অধিকতর স্পষ্টরেখায় অঙ্কিত এবং মোটের উপর এগুলি অধিকতর কবিত্বগুণমণ্ডিত। কিন্তু গীতালিতে যদ্যপি একান্ত সমাহিত চিত্তের নিবিড় রসোপভোগের প্রকার বা তত্ত্বসংকেতময়তার বর্ণনা সুলভ, এমনকি প্রথমাগত অরূপচেতনার নিসর্গময়তার পুনঃপ্রকাশও দুষ্প্রাপ্য নয়, যেমন, 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি, ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি' প্রভৃতি, তবু গীতালির স্বরূপ-লক্ষণ হ'ল অরূপের উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত কবি-মানসের বাস্তব জীবন ও জীবনের অনুভূতিগুলিকে নূতন ভাবসংকেতে গ্রহণ করা। এ হ'ল জীবনের গতিশীলতার সংকেত। অতঃপর কবি কেবল অরূপ-বিলাসে নিমগ্ন রইলেন না, জীবনাতিশায়ী অরূপানুভূতির সঙ্গে জীবনের একান্ত মিশ্রণ ঘটালেন। গীতালিতে অরূপানুভূতির

এই দিক্‌পরিবর্তন যে সম্ভব হ'ল তার কারণ নিহিত রয়েছে এই অনুভূতির বিশিষ্ট প্রকারের উপর, পূর্ববর্ণিত দুর্যোগদুঃখের প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপর, যা আবার প্রকৃতি ও জীবনের উপর নির্ভরশীল রোম্যান্‌টিক কবিধর্মের পরিণাম।

'গীতালি'র এই অভিনব কাব্য-স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে আছে (১) গীতিমাল্য-গীতাঞ্জলি-খেয়া সুরের মতই প্রবল দুঃখানুভূতির মধ্যে অরূপ-চেতনার আগ্রহ, (২) অসীমের উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত মানসের জন্মমৃত্যুময় বিশ্বসৃষ্টিরহস্যের একত্ব ও অনন্তত্ব উপলব্ধি, (৩) উভয়ের সম্মিলনে বিশ্বের গতিশীলতা সম্পর্কে ধারণা ও নিজকে অজানা পথের যাত্রী ব'লে বিশেষিত করা। গীতালির অধিকাংশ গানই উপরিউক্ত দুঃখের, গতির ও যাত্রার সুরে স্পন্দিত। তারিখ মিলিয়ে দেখলে, গীতালির গানগুলি ১৩২১এর ভাদ্র থেকে কার্তিক মধ্যে রচিত, 'ফাল্গুনী' ঐ ফাল্গুন মাসে এবং 'বলাকা' গোটা ১৩২১ এবং ১৩২২এর লেখা কতকগুলি কবিতার সংকলন। এইজন্যে গীতালির সঙ্গে বলাকার ও ফাল্গুনীর মূলসুরের সাদৃশ্য এত অধিক। বলাকার কয়েকটি সংস্কারমুক্তিবিষয়ক কবিতা গীতালিরও কিছু পূর্ববর্তী, কেবল যে-কবিতাগুলিতে বিশ্বের গতিশীলতার চরমরূপ প্রকটিত হয়েছে তা পরের বৎসরের। গীতালির পূর্বে গীতাঞ্জলির দুএকটি গানে এবং গীতিমাল্যের 'অনেক কালের যাত্রা আমার অনেক দূরের পথে' অথবা 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' প্রভৃতিতে এই যাত্রা জীবনবোধের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে তবেই গীতালিতে 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার' অথবা 'বুঝি বা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা কবে, কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি', অথবা 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,

পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া' প্রভৃতি নূতন ধরণের গানগুলির জন্ম দিয়েছে। সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করবেন, বিশ্বের দুঃখরূপ, যাত্রী, পথ ও পথিক ইত্যাদির ধারণা নিয়ে লেখা এতগুলি গান বা কবিতা একসঙ্গে ইতিপূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। কবির নিজস্ব যাত্রাবোধ এবং বিশ্বগত দুঃখের রূপ সংযুক্ত হওয়ার ফলে গতির অনুভূতি এই সময়কার প্রধান কাব্য-বিষয় হয়ে পড়েছে। বলাকা-স্তরের আলোচনায় পুনরায় গীতাঞ্জলির এই বৈশিষ্ট্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

রাজা-অচলায়তন-ডাকঘর—অরূপ-সাধনার যুগের এই তিনটি সাংকেতিক নাট্যে কবি তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে পাঠকের নিকট এই অরূপকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। অন্তরের গোপন কক্ষে অনির্বচনীয় রসাস্বাদরূপে যিনি অবস্থান করছেন পার্থিব লীলায় তাঁর কী দান, মানুষের মধ্যেই বা কিরূপে তিনি নিজকে প্রকাশিত ও উপলব্ধ করেন তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এই তিনটি নাট্যে আলোকপাত করা হয়েছে। এই নাটকত্রয় গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য রচনার সমসাময়িক এবং কবির দিক থেকে তাঁর অন্তর্গূঢ় মানসের কথা—যা ভাষায় ব্যক্ত করার যোগ্যতা রাখেনা—তাকে পরিস্ফুট করার অভিনব প্রয়াসের দৃষ্টান্ত। এগুলির মধ্যে কোথাও সংকেত ও ব্যঞ্জনা, কোথাও ক্ষীণ রূপকের অন্তরালে অরূপ-লীলার আভাস, সর্বত্র সংগীতে ও উক্তিভঙ্গিতে জগন্ময়ের চকিত রসস্পর্শে দর্শক ও পাঠকের হৃদয়ে রোমাঞ্চের সঞ্চার করা হয়েছে।

অচলায়তনে প্রাচীন কুসংস্কারের ধ্বংসকারী ও নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিসাধকরূপে অরূপের আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে। 'রাজা' নাটকে

এই অরূপের প্রায় সম্পূর্ণ একটি রূপ কবি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। 'রাজায়' প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে তিনি কেবল মনোহর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর নন, তিনি ভয়ংকর-সুন্দর এবং এই দুইরূপে যিনি তাঁকে জানেন তাঁরই অন্তরের সেই গোপনকক্ষে তিনি আস্বাদনযোগ্য—যে কক্ষে পার্থিব বুদ্ধি প্রবেশ করতে পারে না, বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হোক না কেন। ডাকঘরে অচলায়তনেরই ধারা অনুবর্তন ক'রে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক আকুতির স্বরূপ ও রাজার আগমনের প্রকার বর্ণিত হয়েছে।

'রাজা'য় রানী সুদর্শনার উপলব্ধির ভুল দিয়ে নাটক আরম্ভ হয়েছে, ভ্রমনিরসনে নাটকের শেষ। এইটি যদ্যপি এই নাট্যরচনার মূল প্রেরণা, নাটকীয় প্রয়োজনে এবং অরূপের প্রকার বিশ্লেষণে বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে—যেমন সুরঙ্গমা, কাঞ্চীরাজ ঠাকুরদা প্রভৃতি, এবং সমস্ত মিলে অরূপের যে বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়েছে তা এই নাট্যরচনা ছাড়া অন্য কোথাও হয়নি। 'খেয়া' থেকে আরম্ভ ক'রে অরূপ-উপলব্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে যে নিসর্গের দ্বৈতরূপের মধ্যে লীলাময়ের আত্মপ্রকাশ বর্ণিত হয়েছে সেকথা ইতিপূর্বে বারবার বলা হয়েছে, এবং ঐ দ্বৈতলীলার মধ্যে করুণ-কমনীয় শান্ত-সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দরের আগমনের প্রকার অপেক্ষা দুর্যোগময় বর্ষণমুখর রুদ্র পরিবেশে আগমনই যে কবির কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় সেকথাও বিবৃত হয়েছে। আসলে ঐ দুইরূপের মধ্যে সদৃশভাবে অরূপ উপলব্ধিই কবির মতে যথার্থ উপলব্ধি। যার কাছে অরূপ কেবল বাহ্য সৌন্দর্যেরই প্রতীক তিনি অরূপকে ঠিক জানতে পারেন না। কারণ, কেবল ইন্দ্রিয়সুখকর বস্তু সুন্দরের ভ্রান্তি জন্মাতে সক্ষম; অপরপক্ষে ইন্দ্রিয়ের অপ্রীতিকর ভয়ংকরতা ও দুঃখের মূর্তি অনিন্দ্রিয় বিজ্ঞান-আনন্দময়

চিত্তধর্মে গভীরভাবেই মুদ্রিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং অরূপের এই যে আপাত-বিরুদ্ধ ভীষণ-মধুর রূপ, তা বহির্দৃষ্টিতে অথবা পার্থিব বিচার দৃষ্টিতে উপলব্ধির যোগ্য নয়। অন্তরের গোপনতম কক্ষে উক্ত আনন্দ-সম্বিৎময় রসরূপে একে প্রত্যক্ষ করলে তবেই ঐ বিরুদ্ধতার সমাধান সম্ভব। দুই বিরুদ্ধতার মধ্যে লীলাময় একরূপে অরূপের বিহারের তত্ত্বই এর পরমাশ্চর্যস্বরূপ, তাই অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অনুভবগম্য, লৌকিক দৃষ্টির অনধিগম্য। গীতায় উক্ত আত্মস্বরূপের মত এর সম্পর্কেও বলা যায়—

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

সুদর্শনা সেই নিভৃতে এ দুয়ের মিলিতরূপে তাঁকে দেখতে পায়নি, এবং কেবল সুন্দর বা ইন্দ্রিয়মনোহর রূপে দেখতে চেয়েছিল ব'লেই তাঁর রহস্যাবৃত রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। অথচ কেন অরূপ তাকে আলোকে সুন্দররূপে দেখা দেবেন না তার সে অভিমান ছিল তীব্র।

নাটকের আরম্ভেই দেখতে পাই সুদর্শনা সুরঙ্গমাকে সাধারণ সংসারী মানুষের মত প্রশ্ন করছে—"কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।" এবং আলোর জন্যে (অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতিগম্য প্রত্যক্ষতার জন্যে) অস্থির হয়ে উঠেছে—"না, না, আমি আলো চাই" ইত্যাদি। অথচ তারই দাসী সুরঙ্গমা দুঃখানলে দগ্ধ হয়ে দুঃখের মধ্যে (যেহেতু দুঃখেই অন্তরতম উপলব্ধি সম্ভব) রাজাকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করেছে। আবার ঠাকুরদা ইন্দ্রিয়মাত্রসুখকর বিষয়ানন্দ ত্যাগ ক'রে আত্মত্যাগ-ময় নিষ্কাম আনন্দে অধিষ্ঠিত হয়েই রাজার প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছেন। যাই হোক, সুদর্শনার সমস্ত স্বার্থলাভেচ্ছা ও

আত্মাভিমান নিঃশেষে দগ্ধ হ'লে অপরিসীম দুঃখভোগের পর সে যখন পথে বেরিয়েছে তখনই 'অন্ধকার কক্ষে' অন্তরঙ্গ রাজার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্ভব হ'ল। এই সাংকেতিকতা কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন। তার পুনরাবৃত্তি না ক'রে এই অরূপের যে রূপ এবং উপলব্ধির প্রকার কবি অভাসিত করতে চান সে সম্পর্কে আর দুএকটি কথা বলব। এই নাটকে দৃশ্যতঃ না হোক কথোপকথনের মধ্যে রাজাকে অবতীর্ণ করানো হয়েছে, আর পাঠক বা দর্শকের অরূপ-রসানুভূতির সহায়ক কয়েকটি বিশিষ্ট গানের সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এই ঈশ্বর বা অরূপ সম্পর্কে সুরঙ্গমার উপরিউক্ত অন্ধকার গৃহে উপলব্ধি ও ঠাকুরদার আলোকের মধ্যে প্রাপ্তির স্বরূপ প্রথমে বুঝতে হবে। বলা বাহুল্য, উভয়েই 'রাজা'র উক্ত দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বরূপের অন্তর্নিহিত ঐক্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ফলে একজন ভাবানুভূতির মধ্যে সততই অরূপের স্পর্শলাভ করছেন, ইন্দ্রিয়াতীত প্রজ্ঞালোকে অরূপের সাক্ষাতে তাঁর ইন্দ্রিয়-মন সমস্তই রস-তন্ময়তার মধ্যে নিবিড়ভাবে নিমজ্জিত হচ্ছে—ইনি হলেন সুরঙ্গমা। আবার প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে লীলাময় অরূপের যে লীলা চলেছে সেইখানে তাঁর লীলা-সহচর হয়ে জীবনের মধ্যে অরূপকে বা অরূপের মধ্যে জীবনকে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি উপলব্ধি করেছেন—তিনি হলেন ঠাকুরদা। সুদর্শনার এই দুরকম উপলব্ধির কোনোটাতেই অধিকার ছিল না, কারণ তিনি রাজার রহস্যময় ভয়ংকর-সুন্দর রূপ অনুভব করতে পারেন নি ; আলোর মধ্যে দৃশ্যতঃ সুন্দর রূপেই দেখতে চেয়েছেন।

এই সব প্রধান চরিত্রের মধ্যে রাজার যে-প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে তাতেই রাজার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছে ব'লে অরূপ-রসিক কবি মনে

করেন নি। তাই অরূপ সম্পর্কে লৌকিক ধারণার বিভিন্ন দিকগুলি পরিস্ফুট ক'রে ভিন্নভাবে রাজার স্বরূপ অবগত করাতে চান। ঠাকুরদার সঙ্গে পথিক ও নাগরিকদের আলাপের মধ্যে রাজা সম্পর্কে মূঢ় সাধারণ লোকদের হাস্যকর লৌকিক ধারণা বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ঠাকুরদার মুখ দিয়ে রাজার স্বরূপও বিবৃত হয়েছে। এই সকল লোক রাজার নাম শুনেই রাজাকে মানে, ভুল দেবতাকে রাজার প্রাপ্য অর্ঘ্য দেয়, তাঁর কাছে সাংসারিক অভাব-অনটন দূর করার প্রার্থনা জানায়, আবার চোখে না দেখতে পেলে রাজার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা এদের মধ্যে এমন নাস্তিক লোকও আছে। ঠাকুরদার সঙ্গে এদের কথাবার্তার অংশবিশেষ উদ্ধার করছি :

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় না কি রে।

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না, দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তায় লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। * * *

কুম্ভ। লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বইকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিচ্ছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা। সে যে কিছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। * * * *

নিম্নলিখিত অংশে লৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের দৃষ্টান্তে রাজার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব স্থির করার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

নাগরিক ১ম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই একথা দু'শ'বার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দু'শ'বার। এত কঠিন সংযমের দরকার কী —পাঁচশ' বার বলো না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বৎসরের ছেলেটা সাতদিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে তবু তো এখনো তোর দু ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। ছেলে তো গেলই তাই বলে কি ঝগড়া ক'রে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা !

প্রথম। যাদের ঘরে অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর্। ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিষয়টা কীরকম দেখো না। ওই আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে কিন্তু তার ঘরের এমনি দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্ না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি, আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে। তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয় ?

উপরিউক্ত কথোপকথন থেকে বোঝা গেল যে কবির উপলব্ধ রাজা লৌকিক প্রয়োজন ও প্রার্থনার সম্পর্কের উর্ধ্বে, মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, অরসিক সাধারণের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে তিনি অনধিগম্য। বিশ্বলীলায় বিরুদ্ধভাবে তিনি বর্তমান আছেন, যিনি দেখেন তিনিই দেখেন। বিশ্বের নিয়মের রাজত্বে মানুষ ও অন্য জীবকে তিনি স্বচ্ছন্দ বিচরণের অবকাশ দিয়েছেন, তাঁর বাহ্য শাসনদণ্ড কিছু নেই। নিয়মের কঠোরতার অন্তর্ভূত হয়ে চলাতেই আনন্দ, নিয়মলঙ্ঘনেই দুঃখ। তাঁর রাজত্বে যেমন সৎ আছে তেমনি অসৎও আছে, অনুকূল আছে, প্রতিকূলও আছে। এই বহুধা বিচিত্র পার্থক্য নিয়েই তিনি পূর্ণ একরূপে বিরাজ করছেন। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বর সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ একটি দার্শনিক ধারণা কবি-প্রবর এই নাট্যের মধ্যে দিয়ে জানতে চান। বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে বোঝা যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বরীয় লীলার ধারণার সঙ্গে কবির ধারণার অনেকটা মিল রয়েছে। কবি বিশ্বকে স্বীকার ক'রেও, এর বিষয়সুখাদির সত্যতা অনুভব ক'রেও জৈবতা থেকে মুক্ত হতে চান। তিনি স্থূল প্রয়োজন সাধনের হেতুরূপে সৃষ্টিকে দেখেন নি। পার্থিব ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে আনন্দ-সম্বিৎরূপে যাঁকে তিনি পেতে চান তিনি বহু বিচিত্র লৌকিক অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র এবং অদ্বৈতও বটেন। অথচ রসিকচিত্তের বিশ্বগত অনুভূতিই যেহেতু ঐ উপলব্ধির একমাত্র উপায় সেইহেতু তিনি সৃষ্টিকে সত্য মনে করেন। সুতরাং তিনি না অদ্বৈতবাদী না দ্বৈতবাদী। তিনি বৈষ্ণবীয় দ্বৈতবাদী ভাবসাধনার তথা বিশ্বত্যাগী বৈরাগ্যসাধনার অপক্ষপাতী।

এই নাটকে কাঞ্চীরাজের চরিত্রেও অরূপ উপলব্ধির একটি বিশিষ্ট প্রকার প্রদর্শিত হয়েছে। রানী সুদর্শনার রাজাকে বাইরে প্রত্যক্ষ

সুন্দররূপে দেখার ভ্রমের সুযোগ নিয়ে এবং জনসাধারণের অজ্ঞতার সদ্ব্যবহার ক'রে তিনি রূপবান্ সুবর্ণরাজের সহায়তায় নিজকে রাজা ব'লে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সুদর্শনা ভ্রান্তিবশতঃ সুবর্ণরাজের কাছে ফুল পাঠিয়ে ছিলেন এবং বাধ্য হয়েই কাঞ্চীরাজের দেওয়া সুবর্ণরাজের মালা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তারপর সুদর্শনাকে পাবার জন্যে কাঞ্চীরাজ প্রাসাদের চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিলে এবং পিতৃকুলগতা সুদর্শনার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে সেখানে কান্যকুব্জরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। প্রবল নাস্তিকতা এবং শক্তিমত্তাই কাঞ্চীরাজের চরিত্রের অসামান্য গুণ। তিনি নিজেকে রাজা ব'লে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হবার পুর্ব পর্যন্ত অটল আছেন। কঠিন দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি পরিশেষে রাজাকে বিশ্বাস করলেন। এই বীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে মুহূর্তে তিনি প্রমাণ পান যে ঈশ্বর আছেন সেই মূহূর্তে সর্বস্বত্যাগ ক'রে অধ্যাত্মপথে ধাবিত হন। তিনি শেষে তাই সুদর্শনার সঙ্গে পথে বেরিয়েছেন। কঠোরতম দুঃখকে অনায়াসে বরণ করার যে বীরত্ব রাজা তার মূল্যেই নাস্তিক বীরকে অভ্যর্থিত করেছেন। অথচ দেখা যায়, কাঞ্চীরাজের দলে অন্যান্য যে সব রাজা ছিলেন তাঁদের উপলব্ধি ঘটল না। তাঁরা ছিলেন দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংস্কার ও সংশয়ে পুর্ণ। তাঁরা বীরত্বময় নাস্তিকতার অধিকারী ছিলেন না। কবির অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে সোজাসুজি নাস্তিকের অরূপানুভূতি আসতে পারে, কিন্তু ঐ প্রকারের দুর্বলচিত্তদের কদাপি নয়।

বস্তুতঃ কাঞ্চীরাজকে কম দুখঃভোগ করতে হয়নি। মরণপণ ক'রেই তাকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। কবির আদর্শে তাই সে সহজেই পুরস্কৃত হয়েছে। আমাদের আরো মনে হয়, পাপপুণ্যের বিচার

সম্পর্কে কবির একটি স্বতন্ত্র ধারণাও এক্ষেত্রে কাঞ্চীরাজের চরিত্রকে অপ্রত্যাশিত হ'লেও ধ্রুব পরিণামের মুখে নিয়ে গেছে। পাপপুণ্যের বোধ এবং তার দণ্ড-পুরস্কার সম্বন্ধে আমরা যে লৌকিক ধারণা পোষণ করি কবি তা অপ্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ব্যবহারিক জগতে নানা প্রয়োজন সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষের ধারণাগুলি লৌকিকেই প্রযোজ্য, অনন্ত বা পূর্ণের ব্যবহার সম্পর্কে নয়। তাঁর বিচারের স্বরূপ আমাদের আয়ত্তে নয়। ফলে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, পুণ্যবানও লৌকিক মতে শাস্তি পায়, পাপীও করুণা লাভ করে। এই ধারণাটি কবি তাঁর একটি কবিতায় (বলাকা—'বিচার' দ্রঃ) ব্যক্ত করেছেন—

তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার।

*　　*　　*

তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি—
খড়্গ ধরো প্রেমিক আমার
কর গো বিচার।
তার পরে দেখি
এ কী
কোথা তব বিচার-আগার।
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা 'পরে।

লৌকিক ভাবে আমরা যাদের মার্জনীয় ব'লে মনে করি সেখানে কবি উপলব্ধি করেন—

চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
ঝড়ের প্রচণ্ড বেশে ;
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহার পড়ে ;

সুতরাং লৌকিক ধারণা অনুসারে কাঞ্চীরাজের চরিত্রের এই পরিণাম আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু কাঞ্চীরাজ বৈষ্ণবীয় শত্রুভাবের সাধক নন, কারণ প্রারম্ভ থেকেই তাঁর সে ধরণের ভক্তিভাবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না এবং রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণবীয় ভক্তি-সাধক নন। শক্তিমত্তার প্রতি এই সহানুভূতির পরিচয় অচলায়তনের 'মহাপঞ্চকে'র চরিত্র বর্ণনাতেও আমরা দেখতে পাই।

প্রসঙ্গক্রমে কবির এই অরূপ-সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত ধারণার তুলনা ক'রে দেখতে ইচ্ছা হয়। সাহিত্য-বিচারে কবি রসবাদী। রস রূপের মধ্যেই যদিচ আপনাকে প্রকাশ করে, অন্তরাত্মার আনন্দ-সম্বিতেই তার স্থিতি। সেই গোপন রহস্যময় বুদ্ধির আলোকের অতীত আনন্দময় কক্ষেই ব্যক্তি-কর্তৃক এই রসের উপলব্ধি। (তু০—'সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত, সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—রসো বৈ সঃ। রসোহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'—সৌন্দর্যবোধ। 'আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।'—সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য।) আনন্দ-সত্যরূপ এই রস কেবল রূপের আধারেই বিচার্য নয়। রূপের যে ইন্দ্রিয়মোহকর গুণ আছে রসে তাকে অতিক্রম ক'রে একটি সুষমাময় ঐক্যে ও ধ্রুবত্বে পৌঁছাতে

হয়। সুতরাং কঠোর সাধনার দ্বারাই এই কঠোর রসরূপ বস্তু আয়ত্ত-গম্য; ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সুখকর উপভোগের মধ্যে নয়, অর্থাৎ কেবল ভাষার সৌন্দর্য, কেবল রচনার নৈপুণ্য, অলংকারের পারিপাট্য বা ছন্দের ঝংকারে মুগ্ধ হওয়াতেই রসোপলব্ধি হয় না। সাহিত্য আলোচনার প্রসঙ্গে রস বিষয়ে স্রষ্টার অন্তরতম কঠোর সাধনার দিকটি কবি বহুবার উল্লেখ করেছেন, যেমন—"অনেক গুণী দেখা যায়, বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না; তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই।" কলাসৃষ্টিতে বা কলা-আলোচনায় বাহ্যরূপের উপর আসক্তি কবি ত্যাগ করতে বলছেন—"সাহিত্য-কলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে—তাদের মুক্তি নেই। ....কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে—রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দেখা, ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখা এবং মা গৃধঃ—লোভ করোনা,—এই অনুশাসন গ্রহণ করা" (সৃষ্টি)। রসোপলব্ধির অন্তরগত অলোলুপতা, সামঞ্জস্য, একত্ব, সত্যতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে কবি অসংযত রূপলালসা থেকে রসাস্বাদের নিম্নলিখিত ভাবে পার্থক্য করছেন—'ভিতমাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না।............জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তো সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত; আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তাহা নিতান্তই পাগলামি মাতলামি হইয়া উঠিত।......সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না......প্রবৃত্তিকে

যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে-সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে………' (সৌন্দর্যবোধ)।

কবির এই রসোপলব্ধির এবং ঐ অরূপোপলব্ধির রীতি বিশ্লেষণ ক'রে সাদৃশ্য দেখা যাক। প্রথমতঃ সত্য ও সুষমাময় ঐক্যস্বরূপ রস যেমন অন্তরের গোপন কক্ষে উপলব্ধির যোগ্য, ভয়ংকর ও সুন্দরের সামঞ্জস্যরূপ রাজাও তেমনি আমন্দময় সম্বিৎরূপেই আস্বাদ্য। রূপের মধ্যে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলার মধ্যেই যদিচ 'রাজা'র প্রকাশ, রূপসর্বস্বতার দ্বারা তিনি গ্রহণীয় নন। কারণ, যাকে ঠিক ইন্দ্রিয়মনোহর সুন্দর বলা যায় না এমন দুর্যোগদুঃখের মধ্যেও তাঁকে চেনা প্রয়োজন। সুদর্শনা কেবল সুন্দররূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়ে ভুল করেছিল। সুতরাং তার চারদিকে লোভের আগুন জ্বলল। 'তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন জ্বলিল……সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল' তা-ই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। রসের দিক থেকে বলা যেতে পারে, সুদর্শনা (অর্থাৎ রসান্বেষী পাঠক) সুবর্ণের বা ছন্দঃ-অলংকার-বচন-কৌশলের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাকেই বরণ করলে বা কাব্য ব'লে গ্রহণ করলে। কাঞ্চীরাজ যেন বচন-রচন-পটু চতুর কাব্য-ব্যবসায়ী। যথার্থ কাব্যের অভাবে কেবল বাহ্যরূপের দ্বারা সুদর্শনার ভ্রান্তি জন্মানো এবং সুদর্শনাকে দলে পাওয়ার জন্য তার চেষ্টা। সেও তাই রূপলোভের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এরকম কাব্য-সমালোচক আবার নিজ মতে স্থির বিশ্বাসী ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁকেও ভ্রান্তিমুক্ত হতে হয়।

বলা বাহুল্য, 'রাজা'কে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির প্রকার সম্পর্কিত

সাংকেতিক নাটক ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করার ইঙ্গিত আমার এই আলোচনার তাৎপর্য নয়। আমি শুধু কবির কাব্যোপলব্ধি এবং অরূপ-উপলব্ধির সাদৃশ্য দেখাতে চাই; এবং ব্যঞ্জনাক্রমে এটুকু জানাতে চাই যে কবির ঈশ্বরোপলব্ধি তাঁর কাব্যোপলব্ধিরই প্রকার-বিশেষ, তা স্বকীয়, এবং পূর্বনির্দিষ্ট শাস্ত্র বা ধর্মমতের দ্বারা অপ্রভাবিত।

অচলায়তনে এই ভয়ংকর-সুন্দরের রুদ্ররূপের আর একটি দিক চোখে পড়ে। তা হ'ল—গতানুগতিক অন্ধতা, আচার পালনের নির্জীব দাসত্ব ও শাস্ত্রের বা মন্ত্রতন্ত্রাদির কুহক যেখানে মানবাত্মাকে নিপীড়িত ক'রে তার সহজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে সেখানে ধ্বংসের দেবতা ও নূতনের প্রতিষ্ঠাতা রূপে 'গুরু'র (বা 'রাজা'র শক্তির) প্রকাশ ঘটেছে। এই নাটকটির রচনার পশ্চাতে কবির বাস্তব সমাজ বোধ ও মানবীয়তা বোধ বিশেষ ভাবে কাজ করেছে এবং কবি যেহেতু অরূপাদর্শে সমাজের গতিশীলতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন সেইহেতু এখন থেকেই এই অনুমান করা যায় যে কবি শুধু অরূপ-সাধনাতেই সমাহিত থাকবেন না, বাস্তব জীবনের মধ্যে অরূপকে এবং অরূপের মধ্যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করবেন। কবি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে গুরুর এই যোদ্ধবেশে ধ্বংসের মধ্যে আগমনের সংকেত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> 'যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই ক'রে তবে তাকে স্বীকার

করতে হয়, কেন না নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে……আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন ব'লে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর মানের প্রাচীর অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে।'

(আত্মপরিচয় দ্রঃ)

এই নাটকে গুরুর আবির্ভাব ঘটেছে দাদাঠাকুরের মধ্য দিয়ে। কবি বলছেন 'যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।' সমস্ত রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্লবের মূলে যে গুরুর নির্দেশ রয়েছে এবং 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায়' তাঁর আবির্ভাব ঘটে এই তত্ত্বটিই যুগন্ধর মহাকবি নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠা করলেন। মানবীয় কল্যাণের বিরোধী, মধ্যযুগের কুসংস্কার ও প্রথার বাহক 'অচলায়তন'ই ভারতবর্ষের ধর্মের গ্লানির প্রতিভূ। স্পষ্টই দেখা যায় যে গীতাঞ্জলির অরূপ-সিদ্ধ কবি তৎকালে সৃষ্টির মধ্যে জন্মমৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য ক'রে জীবন সম্বন্ধে যে গতির ধারণায় এসে পৌঁছেচেন তা-ই তাঁকে সমাজবোধে ও বৃহত্তর জীবনবোধে ধীরে ধীরে উদ্দীপিত ক'রে তুলছে। সংস্কারমুক্তি সম্পর্কে চেতনা এর একটা অংশ মাত্র। ইতিপুর্বে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ও 'মালিনী' নাট্যে কবির প্রথম মানবীয়তাবোধের স্ফুরণে এহেন সমাজচেতনা ও সর্বসংস্কারমুক্ত মানবধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও তা বহুল পরিমাণে রোম্যান্টিক ভাববিহ্বলতা-প্রসূত, বর্তমানের মত স্থির আদর্শপ্রেরণা-সঞ্জাত নয়। দাদাঠাকুরের মুখে সংস্কারমুক্তি সম্বন্ধে চরম কথা শোনা গেল—'যে-চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের ক'রে

সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।' কিন্তু যে-বিপ্লবমূলক পন্থায় নূতনের আবির্ভাব ঘটল কবি তাকে হিংসাহীন বিপ্লবের আকার দেন নি। যুদ্ধের মধ্যেই কবি অমানবীয় জাতিবিচারের সমস্যার সমাধান করেছেন—স্থবিরক ও শোণপাংশুর রক্ত মিশ্রিত ক'রে দিয়েছেন।

নূতন এবং উন্নততর জীবনের প্রতি আগ্রহবশতঃ কবি গ্লানির ক্ষয়কর যুদ্ধকে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং আমাদের শ্রেয়ের পন্থা ব'লেই নির্দেশ করেছেন। আবার মৃত্যুকেও যে-কবি অস্বীকার করেছেন তাঁর কাছে শ্রেয়ের জন্যে জীবনদান আদর্শের দিক থেকে কর্তব্য ব'লেই মনে হয়েছে। ভারতীয় বৈদান্তিক জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দও নিষ্ক্রিয় কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিয়ে আত্মবলিদানের জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে লেখা 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি এইরূপ যুদ্ধকে আনন্দে বরণ করতে চেয়েছেন দেখেছি। দেশ ও জাতির অর্থাৎ বৃহৎ মানবের অভ্যুদয়কে যে-যুদ্ধবিগ্রহ নিয়মিত করে সেই ধর্মযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ হিংসার ব্যাপার ব'লে গ্রহণ করেন নি, ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনকেই হিংসা ব'লে মনে করেছেন এবং সেক্ষেত্রে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার কথা বলেছেন।

দাদাঠাকুরের মুখ দিয়ে কবি মানবাত্মার নিপীড়নের বিরুদ্ধে চিরন্তন বিদ্রোহের কথাই আমাদের শোনালেন—'না যদি কুলোয় তাহ'লে এমনি ক'রে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো—।' কবির অরূপ 'নরদেবতা' ব'লেই ভারতের অমানবীয় জাতিভেদ প্রথার সমূলে বিনাশ সাধনও তাঁর কর্তব্য হয়েছে—'ওই ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।' এই ভাবে এই নাটকটির মধ্যে কবি সামাজিক

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করলেন এবং এই প্রকারে অরূপের স্বরূপ এবং কার্যকারিতা আর এক দিক থেকে বিবৃত করলেন। পূর্ণ জীবনবোধ এবং সংগ্রামের দিকটি 'বলাকা'য় এবং অমানবীয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকটি 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা আমরা পরে দেখব এবং কবির কাব্যজীবনে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত অরূপোপলব্ধির ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এই বাস্তব মানবীয়তার চিহ্ন দেখে কবিপ্রতিভার ঐক্য অনুধাবন ক'রে বিস্ময় বোধ করব।

অচলায়তনে আরো দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় বস্তু রয়েছে। একটি কবির তীব্র বিদ্রূপপরায়ণতা, আর একটি তাঁর অরূপদর্শনের বৈশিষ্ট্য—পূর্বদৃষ্ট বর্ষণমুখর দুর্যোগময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গুরুর আগমনসূচনা। 'রাজা' নাটকে ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে যোদ্ধবেশে তিনি এসেছেন, এখানে এসেছেন বর্ষার দুর্যোগের আনন্দে—

> 'বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক—আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না— আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।'

ডাকঘরেও এই ভাঙনের শক্তি দ্বার ভেঙে ফেলে অমলের সঙ্গে সকলকেই অসীমের মুখোমুখি ক'রে দিয়েছে। 'খেয়া'র সুর থেকে আরম্ভ ক'রে অরূপের আগমনের এই বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পটভূমিকা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকের যেমন বিচার্য, তেমনি এর সঙ্গে 'বলাকা' কাব্যের উদ্দাম গতির ও ভাঙনের সুর মিলিয়ে দেখা কর্তব্য ; কারণ, বলাকার—

জানি জানি তন্দ্রা মম
 রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারাসম
 বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে সুপ্তির পর্যঙ্ক।

প্রভৃতির মধ্যে ব্যঞ্জিত বাস্তব দুঃখকে গ্রহণের আনন্দ তার পূর্বেই দুর্যোগের মধ্যে অরূপাভিসারে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
 আঙিনা তোর সাজা—
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
 দুঃখরাতের রাজা।

(খেয়া—'আগমন')

কবির এই অরূপানুভূতি এবং প্রাসঙ্গিক জীবনবোধ কিভাবে কবিকে জীবন ও অরূপের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে প্রবর্তিত করেছে সে ইতিবৃত্ত রসিকচিত্তের কাছে যথার্থই কৌতূহলজনক।

প্রকৃতি-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে অরূপানুভূতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র এই যুগের 'ডাকঘর' নাটকে পাওয়া যায়। কবি শারদোৎসব ও গীতা-গুলির মধ্যে প্রকৃতি থেকে সুতরাং অরূপানুভূতি থেকে বঞ্চিত মানবাত্মার করুণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেও তা এরকম পরিস্ফুট ক'রে তুলতে

পারেন নি। 'ডাকঘর' নাটকে এই চিত্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। প্রথম স্তরে তার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আগ্রহ, দ্বিতীয় স্তরে রাজার বা অরূপের জন্যে উদ্বেগ। দ্বিতীয়টি যে প্রথমটিরই পরিণাম তা কবি নাটকের মধ্যেই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অমলের প্রকৃতি-ব্যাকুলতা অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতায় এবং পরিশেষে অরূপ-সিদ্ধিতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন ঠাকুরদা-শ্রেণীর চরিত্রে তেমনি অমলের চরিত্রেও কবি স্বয়ং প্রতিফলিত হয়েছেন। প্রকৃতি থেকে কবি নিজে কী প্রকারে অধ্যাত্মে উপনীত হয়েছেন তা Religion of Man গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেছেন—

'During the discussion of my own religious experience I have expressed my belief that the first stage of my realisation was through my feeling of intimacy with Nature.......'

এই কবির কাব্যানুভূতি যে তাঁর অগোচরে অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তিনি জানিয়েছেন—

'.... it is evident that my religion is a poet's religion, and neither that of an orthodox man of piety, nor that of a theologian. It's touch comes to me through the same unseen and trackless channel as does the inspiration of my songs. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Somehow they are wedded to each other and though their betrothal had a long period of ceremony it was kept secret to me.'

প্রকৃতির সঙ্গে অধ্যাত্মের যে-সম্পর্কের বিষয় কবি ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, একদিকে Beautiful আর একদিকে Sublime এর মধ্যে অরূপ-দর্শনের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে বার বার উল্লেখ করেছি তা-ও কবি উক্ত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন—

'When I look back upon those days, it seems to me that unconsciously I followed the path of my Vedic ancestors, and was inspired by the tropical sky with its suggestion of an uttermost Beyond, The wonder of the gathering clouds hanging heavy with the unshed rain, of the sudden sweep of storms arousing vehement gestures along the line of cocoanut trees, the fierce loneliness of the blazing summer noon, the silent sun-rise behind the dewy veil of autumn morning kept my mind filled with the intimacy of a pervasive com-panionship.

'খেয়া' থেকে প্রারব্ধ, শারদোৎসব ও গীতাঞ্জলিতে উপলব্ধ এবং ডাকঘরে পরিস্ফুট কবির উপলব্ধির স্বকীয় পরিণামের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে অতঃপর যেন সংশয়াতীত হতে পারি।

মানবচিত্তের এই প্রকৃতি-মুখীনতাকে কবিকল্পনায় গৃহীত অরূপানু-ভূতির ভূমিকা হিসেবে না দেখে একটু জীবনদর্শন মিশিয়ে দেখলে আমরা একদিকে যেমন রুশো, ফিকটে, শেলিং প্রভৃতি মনীষীদের প্রকৃতিবাদের তত্ত্বে এসে পড়ি আর একদিকে তেমনি ভারতীয় মধ্যযুগের সুফী সাধকদের বন্ধনহীন মানবাত্মার স্বাধীন মার্গে বিচরণের ধারণার সঙ্গে এর সংগতি দেখতে পাই। শাস্ত্রনির্দেশশূন্য স্বাভাবিক পরিণামের

পথই যে মানুষের ঈশ্বরাভিমুখিতার একমাত্র পথ এই বলিষ্ঠ ধারণা প্রকাশ ক'রে সুফী সাধকেরা এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সহজিয়া মতাবলম্বী ও বাউলেরা ভারতের ধর্মসাধনপন্থায় যুগান্তর এনেছেন। কবীর শাস্ত্রনির্দেশ বা পুঁথির মত অগ্রাহ্য ক'রে অন্তরকেই শ্রেষ্ঠ গুরুর মর্যাদা দিয়ে বলছেন—পঢ়ী পঢ়ীকে পথর হুএ, প'ড়ে প'ড়ে শুধু পাথর হয়। পুঁথি-আগত বিদ্যা বিদ্যাই নয়। দাদূ বলছেন—পঢ়ি পঢ়ি থাকে পংডিতা কিনহূঁ ন পায়া পার, অর্থাৎ পণ্ডিতেরা শুধু পড়েই যায়, পারে যেতে পারে না। + ডাকঘরের অমলের চরিত্রেও গৃহত্যাগ ও প্রকৃতি-অনুরাগের সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির উপর ঐকান্তিক বিরাগ দেখা যায়। অমল এবং তার আচারপন্থী প্রাচীন অভিভাবক মাধব দত্তের সংলাপে কবি কারুণ্যের সঙ্গেই পুঁথির পাণ্ডিত্যের অত্যাচার এবং তা থেকে মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক মুক্তির আগ্রহ বর্ণনা করেছেন--

'অমল। পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে।

মাধব দত্ত। বেশ! তাও বুঝি জান না।

অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়িনি—তাই জানি নে।

মাধব দত্ত। দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো—তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল। বেরোয় না।

মাধব দত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা ব'সে ব'সে কেবল পুঁথি পড়ে—আর কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড় হ'লে পণ্ডিত হবে—ব'সে ব'সে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

+ দাদূ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

অমল। না না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না, পিসেমশায় আমি পণ্ডিত হব না।' —ইত্যাদি

শিক্ষণ-পদ্ধতির সংস্কারক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি কোন্ গভীরে তা-ও এসকল দৃষ্টান্ত থেকে অনুমিত হতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুমনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার যে আয়োজন চলেছে তা 'লিপিকা'র তোতা-কাহিনী নামক করুণরসাত্মক রূপকটির মধ্যেও কবি ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি যে কোনো বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁর অন্তরের সহজ উপলব্ধিরই নৈতিক প্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ অন্তরের দিক থেকে তাঁর প্রতিভার মর্মে যেমন স্বভাব-পরিণামের অধিকারী হয়েছেন, তেমনি বাইরে সর্বমানবের ক্ষেত্রেও ঐ স্বভাব-পরিণামধর্মের প্রতিফলন দেখতে চান। আর রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধি সহজ স্বকীয় উপলব্ধি ব'লেই এদেশীয় মরমী সাধকের সঙ্গে তাঁর এত মিল দেখতে পাওয়া যায়। অমল চরিত্রের দ্বিতীয়াংশে রাজার চিঠির জন্যে প্রতীক্ষমাণ অমল, খেয়া-শারদোৎসব-গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গেই তুলনীয়—যিনি বিস্ময়-ব্যাকুলতাসহকারে প্রকৃতির মধ্যে অরূপের আগমন-সংকেত লাভ করছেন। যে-অমল রাজার কাছে কোনো প্রয়োজনের প্রার্থনা করে না, কেবল দেশে দেশে চিঠি বিলি করার দায়িত্ব নেয়, সে আর কেউ নয়, কবি স্বয়ং।

রাজা, অচলায়তন এবং ডাকঘর, ভাবের দিক থেকে এই তিনটি নাটকের ঐক্য অনুধাবন করবার বিষয়। তিনটি নাটকেই অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে ; প্রথমটিতে ভ্রান্ত সুদর্শনার, দ্বিতীয়টিতে সংস্কারে অবরুদ্ধ পঞ্চকের, এবং তৃতীয়টিতে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন অমলের। অমল পঞ্চকেরই স্ফুটতর সংস্করণ, অধিকতর করুণ। তিনটিতেই নাট্যের শেষের দিকে রাজা আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রাকৃতিক

দুর্যোগের পরিবেশে। তিনটিতেই দাদাঠাকুর বা ঠাকুরদা ঈশ্বরের প্রতিভূরূপে এসেছেন।

বস্তুতঃ এই 'ঠাকুরদা' চরিত্রটির মাধ্যমেই ঈশ্বর সম্পর্কে কবির উপলব্ধি ও বক্তব্য নানাভাবে বিবৃত হয়েছে। ঋতু-উৎসব সম্পর্কিত এবং প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক নাটকগুলির মধ্যেই এই চরিত্রের আবির্ভাব ও পূর্ণতা, যদিও পূর্বলিখিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকের নিঃস্পৃহ তেজস্বী ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ঠাকুরদার আংশিক প্রকাশ ঘটেছে। অধ্যাত্ম-পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে রাজা নাটকেই ঠাকুরদার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকে ঠাকুরদা ঈশ্বরের স্বরূপকেও প্রকাশ করছেন আবার নিজকেও প্রকাশ করছেন। শারদোৎসবে যেমন ঠাকুরদা 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে, আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে' ইত্যাদির মধ্যে বিস্ময়সহকারে অরূপকে প্রত্যক্ষ করছেন তেমনি এখানেও নিসর্গরসের ধারায় তাঁর আগমন হয়েছে। সেখানে শরৎ, এখানে বসন্ত—

আজ দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

ঠাকুরদা গৃহত্যাগী, বিশ্বের সঙ্গে যেখানে ঈশ্বরের যোগ ('নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয় আমাদের আপন মনে') সেখানে বিশ্বোপলব্ধির উদার ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের যোগ সাধন করেন। সুতরাং বাইরের প্রকৃতি এবং মানবই তাঁর সর্বস্ব, সংকীর্ণ গৃহের কোনো বন্ধন তাঁর নেই। বিশ্বাত্মবোধের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে অনায়াস যোগস্থাপনের ফল একদিকে যেমন প্রত্যক্ষতার আনন্দ, আর একদিকে তেমনি সুবিপুল দুঃখ, কারণ, কবির উপলব্ধি অনুসারে ধ্বংস এবং সৃষ্টি, মৃত্যু এবং

জীবন উভয়ই বিশ্বের রূপ—একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে গ্রহণ করা যায় না। তার উপর গৃহে লালিত আরামের শয্যাতল শূন্য হ'লে পথের দুঃখই প্রধান হয়ে ওঠে। কবি ঠাকুরদার চরিত্রে এই দুঃখকে আনন্দরূপে বরণ করার আগ্রহ নিম্নলিখিত অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রকটিত করেছেন—

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

সর্বনাশকে সানন্দে বরণ করার এই যে উৎসাহ এ ঠাকুরদা-শ্রেণীর চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং কবির উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তধারায় 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' এবং রক্তকরবীতে 'বিশু পাগল' নিবিড় আনন্দের সঙ্গেই বন্দীত্বের দুঃখ গ্রহণ করেছে। মহাকবির কাব্যজীবনের প্রথম থেকে যদিচ আত্মবিসর্জনের উচ্ছ্বাসময় তীব্রতা ও আত্মবিস্মৃতির অলৌকিক আনন্দ তাঁর চিত্তে বার বার সঞ্চারিত হয়েছে (সোনার তরীর 'ঝুলন', চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে', কল্পনার 'বর্ষশেষ' ও 'বিদায়,' উৎসর্গের 'মরণমিলন' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য,) তথাপি অরূপ-উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত এবং জন্মমৃত্যুর প্রাতিভাসিক অস্তিত্বে বিশ্বাসী কবি যে-ঐকান্তিকতার সঙ্গে জীবনের এই লৌকিকভাবে অবাঞ্ছিত দিককে এখন বরণ ক'রে নিচ্ছেন, তা অবশ্যই পূর্বেকার রোম্যান্‌টিক চেতনা থেকে পৃথক, পরিণাম হ'লেও স্বতন্ত্র। বর্তমানে কবি বলছেন 'আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়', এবং এই ভালো-বাসায় নিমগ্ন হয়েই অর্থাৎ, ভয়ংকর ও সুন্দরের মিলিতরূপে যিনি রহস্য-ময় ও আনন্দ-সম্বিৎময় গোপন কক্ষে উপলব্ধির যোগ্য, তাঁকে উপলব্ধি

ক'রে তবেই কবি তথা ঠাকুরদা সর্বনাশের পথে অগ্রসর হতে পারছেন। অন্তরের মধ্যে যার আবির্ভাবে ঘরবাহির একাকার হয়ে যায়, পার্থিব সুখদুঃখবোধ, লাভক্ষতির হিসাব থাকে না, মানসলোকে যার নৃত্যচ্ছন্দে—

কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে

এবং অপার্থিব আনন্দরূপ অমৃতে চিত্ত পূর্ণ হয়ে যায়, তাকে প্রাপ্তির অবস্থায় পার্থিব স্বার্থবোধ তিরোহিত হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার মাধ্যমে একজন জীবন্মুক্ত যোগীর চিত্রই অঙ্কিত করেছেন † এবং জীবনের সঙ্গে অরূপের যোগসাধনে একপ্রকার অভিনব বৈরাগ্যের পন্থা নির্দেশ করেছেন। এ বৈরাগ্য বিশ্বত্যাগের নয়, বিশ্বকে সম্পূর্ণ গ্রহণ ক'রে পার্থিব আরাম ও ভোগসুখের অতীত হয়ে নিষ্কাম

† তুং গীতা—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
... ...
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
(দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ)
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
... ...

আনন্দে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বানুরাগীর বৈরাগ্য। ঠাকুরদার চরিত্রে একদিকে যেমন গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষির আদর্শ অন্যদিকে তেমনি বাউলদের জীবনাদর্শের মিল দ্রষ্টব্য। জীবনকে গ্রহণ ক'রে জীবনের কেন্দ্রবর্তী অন্তরতম মানুষের অনুসন্ধান এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট মার্গ পরিত্যাগ ক'রে অন্তর্মুখী নিষ্কাম সাধনার দ্বারা সেই আদর্শে নিজকে উন্নয়ন বাউল-সাধনার মূল কথা; মরমী রবীন্দ্রনাথের এই স্বরূপ সুধীপ্রবর ক্ষিতিমোহন সেন আলোচনা করেছেন।

ঠাকুরদা চরিত্রের অনৈহিকতার দিকটি ইতিপূর্বে আমরা উদাহরণ সহকারে দেখিয়েছি। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্রীড়া-রসিকতা। শারদোৎসবে ছেলের দল নিয়ে তিনি পথে বেরিয়েছেন, 'রাজা'য় বসন্তোৎসবে তিনি সকলের আনন্দের সাথী, অচলায়তনে শোণপাংশুর সঙ্গে বনভোজনে ব্যস্ত, ডাকঘরেও তিনি ছেলে খেপাবার সর্দার—'ছেলে-গুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা।' অথচ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
(পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥
(ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ)

এই বালকস্বভাব চরিত্রের উপর যোদ্ধার তেজ ও সংস্কারকের নৈপুণ্যও কবি আরোপ করেছেন। এখানে তিনি কঠোর-কোমল অরূপের যোগ্য প্রতিনিধি—গুরু এবং অবতারস্বরূপ। মনে হয় শারদোৎসবের ঠাকুরদা ও সন্ন্যাসী মিশ্রিত হয়ে পরে ঠাকুরদার একটি সম্পূর্ণ মূর্তি গ'ড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত না হ'লেও ভারতীয় ধর্মাদর্শের গুরুবাদ ও অবতারবাদ তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শে একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে এমন ধারণা অযৌক্তিক হবে না; আর এই চরিত্রে মরমী কবি যে যথাসম্ভব নিজকেই প্রতিফলিত করেছেন সহৃদয় পাঠক তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন।

আমরা আলোচ্য পর্যায়ে এসে দেখলাম রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি দার্শনিক গঠন রয়েছে, যদিও কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ স্থাপন করা কবির অভিপ্রায় নয়। আর পূর্ণতম রসাস্বাদের প্রয়োজনবশেই পাঠকদের এই দর্শনস্বরূপ হৃদয়ংগম করা অবশ্য কর্তব্য।

রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার স্বকীয় কোনো দার্শনিক সত্তা আছে একথা অনেক পাঠকের কাছেই অস্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সকলের অস্বীকারের মূলে সমান যুক্তি বিদ্যমান নেই। কেউ কেউ মনে করেন, কবিঁরা যেহেতু কল্পনাময় ভাববিলাসের সুতরাং মিথ্যার স্রষ্টা, সে মিথ্যা যতই উন্নত ও সুন্দর হোক না কেন, তাঁরা দ্রষ্টা হতে পারেন না। তাঁদের মতে কাব্যে মননের স্থান নেই ব'লে বস্তু ও বিশ্ব-সম্পর্কে সম্যগ্‌জ্ঞান কবিদের আয়ত্তে নেই। কেউ রবীন্দ্রনাথে, সাধারণ কবিদের মত কেবল প্রেম, স্নেহ, প্রকৃতি-প্রীতিই নিরীক্ষণ করেছেন, তদতিরিক্ত অরূপানুভূতির কোন মূল্য

দেন নি। আবার কেউ কেউ তাঁর বিপুল কাব্যসৃষ্টিতে উপনিষদাদির প্রভাব ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি। সুতরাং এ প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে, রবীন্দ্রনাথে দার্শনিকতা কেন অনুসন্ধান করব তার উত্তর দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আমরা অবশ্য এরকম প্রশ্নের জবাব কতক পরিমাণে প্রস্তাবনায় ও অন্যত্র দিয়েছি। তথাপি এখানে সংক্ষেপে কারণগুলি বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করছি।

রবীন্দ্রনাথ যদিচ অতুলনীয় কবিস্বভাবের অধিকারী ছিলেন, তথাপি কতকগুলি সাধারণ প্রেম, প্রকৃতি বা জাতীয় ভাবমূলক কাব্যসৃষ্টিতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই অসাধারণত্বে মণ্ডিত এবং তাঁর কাব্যধারার একটি ক্রমবিকাশ আছে। এই ক্রমবিকাশের সূত্রে অতিশয় প্রবল ও সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক আনন্দ-চৈতন্য ধীরে ধীরে অনির্বচনীয় ঈশ্বরানুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার ফলে ধ্যান-দৃষ্টিতে যথার্থভাবে জীবন-দর্শন কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে। মনে হয় যেন পূর্বপরিকল্পিত একটি নির্দিষ্ট ঐক্যমূলক পরিণামের সূত্রে কবির গতিশীল কাব্য-ধারার বিকাশ ঘটেছে—যা অন্য কোনো কবির প্রতিভায় দুর্লভ-দর্শন। যুগের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় এই প্রতিভার আবির্ভাবের পশ্চাতে রয়েছে পাশ্চাত্যের এবং সংস্কৃতের জীবনমুখী রোম্যান্টিক কাব্য-ধারা এবং এদেশীয় জীবনাতীত অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা। এ দুয়ের প্রথমটি দার্শনিক-স্বভাব-সম্পন্ন এবং দ্বিতীয়টি পরিস্ফুট ভাবে দার্শনিক। যথার্থ কবি এবং সাধকের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য নেই তা রবীন্দ্রকাব্য-পাঠে আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছি। সর্বসংস্কারমুক্ত নির্মল কবি-স্বভাব যে স্বতই সাধকদের অভিলষিত

তুরীয় অবস্থার প্রায় অধিকারী হতে সক্ষম তা রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশেষ ভাবে দেখিয়েছেন। বোধ হয় তিনি গীতি-কবি ব'লেই সাধক-সুলভ আত্মদর্শনশক্তি সহজেই তাঁর আয়ত্তে ছিল। যথার্থ কবি ও ধ্যানী সাধকের মানসিক সাধর্ম্যের স্বরূপ 'ডাকঘর' নাটকে কতকটা বিবৃত আছে। ঐ নাটক আলোচনার প্রসঙ্গে Religion of Man বক্তৃতার সাক্ষ্য নিয়ে কবির কাব্যে সহজ অধ্যাত্মদর্শন কী প্রকারে সম্ভব হয়েছে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র-নাথের গদ্যপদ্য যাবতীয় সৃষ্টির পশ্চাতে স্বকীয় উপলব্ধিবিশিষ্ট একক কবিমানস বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল চিন্তাশীল মনীষী নন, তাঁর বিভিন্ন চিন্তাশীলতার মূলে যে বিশেষ একটি ঐক্যের উপলব্ধি রয়েছে, তা তাঁর কাব্য-নাটক ছাড়া অন্যবিধ রচনাও প্রমাণ করে। অবশ্য আমরা তাঁর আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শনের বিচারকালে যথাসম্ভব তাঁর কাব্যসৃষ্টির উপরেই নির্ভর করেছি। খেয়া, শারদোৎসব, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির আলোচনায় কবির অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বরূপ আমরা উদাহরণ সহকারে বিশ্লেষণ করেছি এবং সংক্ষেপে নির্দেশ করেছি যে, অদ্বৈত উপলব্ধিই কবির কাম্য বটে, কিন্তু তিনি সৃষ্টির নানাত্বকে স্বপ্নবৎ অলীক এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মায়া ব'লে পরিত্যাগ করতে চান না। এসকলকে তিনি পারমার্থিক সত্য ব'লেই মনে করেন এবং এর মধ্যেই অদ্বৈতের বিহারলীলা অনুভব করেন। এতাবৎ তাঁর কাব্যপাঠে আমরা যে সিদ্ধান্তগুলিতে এসে পৌঁছাই, কোথাও কোথাও পুনরুল্লেখ হ'লেও সেগুলির বিবৃতি এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন হবে না:

প্রাকৃতিক রমণীয়তার মধ্যে কবি বিশেষ কোনো একটি সত্তার আবির্ভাব লক্ষ্য করেন।

কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই সত্তার উপলব্ধিতে কবির অন্তরে একটি আনন্দ-চৈতন্যময় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যাকে আমরা সাধারণভাবে সৌন্দর্য বা রমণীয়তা ব'লে মনে করি, যেমন ফুল, শরৎ-প্রভাত, নীল আকাশে ভাসমান সাদা মেঘ প্রভৃতি—কেবল তা-ই যে কবির চিত্তে এই সত্তার অনুভূতি জাগরিত করে তা নয়, এর বিপরীত যে প্রাকৃতিক ভাব, যেমন দুর্যোগময়ী কৃষ্ণা রজনী, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ প্রভৃতি, তা-ও অবিকৃতভাবে ঐ সুন্দরের অনুভূতি দেয়। 'খেয়া' থেকে আরম্ভ ক'রে এযাবৎ আমাদের আলোচনায় এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

প্রকৃতিগত এই দুই বিপরীত অনুভূতির মাধ্যমে আগত একের লীলা সম্পর্কে সচেতনতা ঋতুপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েও কবির মনে উদ্ভূত হয়েছে। বিশেষতঃ পৌষের রিক্ততা ও বসন্তের পূর্ণতা তাঁর অন্তর্লোকে পার্থিব ধ্বংস ও সৃষ্টির পর্যায়ক্রমে আবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং কবি এর থেকে ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলায় মত্ত রুদ্রের অনুভূতিতে এসেছেন। ঋতুনাট্যগুলিতে বা নটরাজ-ঋতুরঙ্গে কবির এই অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিচয় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়।

এই অদ্বৈতদৃষ্টিসম্পন্ন কবি প্রকৃতি-জগৎ থেকে মানুষের জগতে, ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে, অনায়াসে পদক্ষেপ করেছেন এবং আমাদের প্রেম স্নেহাদি পার্থিব আনন্দ-অনুভূতিতে তো বটেই, বিপদ, বাধা, মৃত্যু প্রভৃতির দুঃখানুভূতির মধ্যেও ঐ একেরই উদ্দেশ্যমূলক সঞ্চরণ লক্ষ্য করেছেন। সংঘাতমুখর দুঃখের জীবনের প্রতি যৌবন থেকেই কবির যে একটি রোম্যান্টিক আকর্ষণ ছিল তা তাঁর অদ্বয়দৃষ্টির উন্মেষে সার্থক হয়ে উঠেছে এবং একটি সত্যোপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। কবির বৈশিষ্ট্য এই যে, যাকে

স্থূল বিষয়ানন্দ বলা যায় তা থেকে তিনি যেমন আনন্দরসে উত্তীর্ণ হতে পারেন, প্রাণীর স্বাভাবিক ভাবে অনভিলষিত দুঃখ থেকেও তেমনি। বরঞ্চ তীব্র দুঃখবোধ থেকেই কবির গভীরতর আনন্দোপলব্ধি ঘটে। দুঃখকে আনন্দরূপে উপলব্ধি করার কথা গীতাঞ্জলির 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা' প্রভৃতি মৃত্যু-উত্তরণের গানগুলি, 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান' প্রভৃতি, গীতিমাল্যের 'নয় এ মধুর খেলা' প্রভৃতি, গীতালির 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার' 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' প্রভৃতি অসংখ্য গান এবং বলাকার যাত্রা বা গতির ও মৃত্যুবরণের কবিতাগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

এই যে অরূপের উপলব্ধিতে কবি এলেন তা কবির কাছে বিশ্ববহির্ভূত বা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো তত্ত্ব নয়। বিশ্ব ছাড়া অরূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কবি স্বীকার করেন না, আর তিনি মনে করেন যে মানুষের উপলব্ধির বাইরে কোনো তত্ত্ব নেই। মানবীয় চিন্তার বা ধারণার অতীত কোনো সত্যবস্তু যে থাকতে পারে না একথা Einstein এর সঙ্গে তাঁর আলাপের কিয়দংশে তিনি পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

E. The problem begins whether Truth is independent of our consciousness... We attribute to Truth a superhuman objectivity ; it is indispensable for us, this reality which is independent of our existence and our experience and our mind—though we cannot say what it means......

T...... Science has proved that the table as a solid object is an appearance, and therefore that which the human mind perceives as a table would not exist if that mind is naught. At the same time it must be admitted that the fact, that the ultimate physical reality of the table is nothing but a multitude of separate revolving centres of electric forces, also belongs to the human mind .... if there be any truth absolutely unrelated to humanity then for us it is non-existing .... if there be some truth which has no sensous or rational relation to the human mind it will ever remain as nothing so long as we remain human beings.

('The Religion of man' — পরিশিষ্ট দ্রঃ)

(বলা বাহুল্য, কবি প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্বকীয় অনুভূতি ছাড়া শাব্দপ্রমাণে বিশ্বাসী নন।)

এই জন্যে, নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্ম মানুষের তথা কবির ধারণার বাইরে ব'লে, কবির উপাস্য নয়। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলছেন, 'But as our religion can only have its significance in its phenomenal world comprehended by our human self, this absolute conception of Brahman is outside the subject of my discussion.' অন্যকথায়, ঈশ্বর বা অনন্ত সান্তের মধ্য দিয়েই আপনাকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করছেন, বিশ্বের অন্তর্বর্তী না হ'লে এই সত্তা মিথ্যা ('আমায় নইলে

ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম যে হ'ত মিছে')। এই লীলাময় অরূপ সত্তাই বিশ্বভুবনে প্রবেশ ক'রে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিশেষ ক'রে মানুষের মধ্যে নিজকে প্রকাশিত করছেন।

সুতরাং মানুষী প্রেম, স্নেহ, প্রকৃতিপ্রীতি এসকল কিছুই ব্যর্থ নয়। এমনকি, কাব্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি যাবতীয় মানুষী সৃষ্টি সবই অর্থপূর্ণ। এসকলকে গ্রহণ ক'রেই অরূপ-উপলব্ধিতে জীবন্মুক্তি।

কবি তাঁর এই দার্শনিক উপলব্ধির Ethics এর দিকও নানা জায়গায় বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে করণীয় হ'ল জীবনকে বাস্তব ভাবে গ্রহণ ক'রে অরূপানুভূতিকে জাগিয়ে তোলা, এবং এর জন্যে সংকীর্ণ স্থূলবাসনাময় জৈব জীবনের বিষয়সুখ বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে কামনা পরিত্যাগ করতে হবে, প্রকৃতি-প্রীতিতে বা মানব-প্রীতিতে প্রয়োজনের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। এইভাবে নিষ্কাম হয়ে রসাবিষ্ট চিত্তে যে অবস্থা অনুভব করা যায় তা-ই মর্তজীবনে স্বার্থবিসর্জনময় অরূপোপলব্ধি।

এই আদর্শের বাস্তব চিত্র কবি এঁকেছেন ঠাকুরদা চরিত্রের মধ্যে। ঠাকুরদা স্বার্থত্যাগী নিষ্কাম বৈরাগী (পুর্ব-আলোচনা দ্রঃ)। অরূপের সঙ্গে জীবনের সমন্বয় রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর চরিত্রে করেছেন এবং সর্বদাই অঙ্গুলিসংকেতে এই ঈশ্বরসেবক আনন্দের উপাসক বৈরাগীকে দেখিয়েছেন। এই চরিত্রে অরূপ-সাধনায় সিদ্ধিলাভের দ্বারা জীবনকে ও বিশ্বকে সর্বতোভাবে বরণের যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা কবির একালের পরিণত প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। অতঃপর আনন্দের তুল্যভাবে বিপদকে বরণ ক'রে

বিশ্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলার কথা ফাল্গুনী, বলাকা প্রভৃতির মধ্যে প্রধান ভাবে দেখা দিয়েছে।

দেখা যায়, বিশ্বের দুঃখরূপ সম্পর্কে কবির স্বকীয় বিশিষ্ট উপলব্ধি তাঁর সমূহ দার্শনিকতা ও ধর্মভাবের মূলে। তাঁর কৈশোরের কাব্যগুরু সৌন্দর্য-সাধক বিহারীলাল সৃষ্টির এই দুই আপাতবিরুদ্ধ রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কিন্তু দুঃখরূপকে আত্মস্থ করতে পারেন নি। তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যে এসম্পর্কে স্বীয় মনোভাব নিবেদন করতে গিয়ে কবি প্রথমে সৌন্দর্যের দিক উপলব্ধি ক'রে বলছেন—

> অহো! বিশ্ব-পরকাশী উদার সৌন্দর্যরাশি
> জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত;
> যেদিকে ফিরিয়া চাই সৌন্দর্যে ডুবিয়া যাই,
> অত্যুল্লাসকরী অয়ি, পরম আনন্দময়ী!
> কে তুমি মা! কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাসিত?

কবির প্রত্যক্ষানুভূতি থেকে যেহেতু বিশ্বের দুঃখময় দিক আবৃত থাকতে পারে না, সেইহেতু সজ্ঞানেই এই কবি বলছেন—

> কেন এর অন্যদিকে যেন কিছু নাই ঠিকে,
> পাপতাপ হাহাকার, ঘোর ধুন্ধুমার?
> কত গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য পড়ে অহরহ
> কতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার?
> হয়তো এদিক হবে প্রলয়-প্রবণ,
> এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন।
> উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে,
> জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।

যে মুহূর্তে কবির প্রলয় সম্পর্কে চিন্তা এল এবং একদেশদর্শী সৌন্দর্য-অনুভূতি অন্তর থেকে বিলীন হ'ল, কবি আক্ষেপ ক'রে ব'লে উঠলেন—

কোথা? কোথা? কোথা তুমি বিশ্ববিকাশিনি?
এস মা! ঘোরান্ধকারে তিষ্ঠিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্বরূপিণী।

অবশেষে রহস্যের সমাধান করতে না পেরে কবি সৌন্দর্যময়ীর অঞ্চলতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন—

হও অবোধের প্রতি প্রসন্না প্রকৃতি-সতী!
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভাল, বুঝিলেই নেবে আলো।
সে মহাপ্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব না।

অথচ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তুলনা ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে সৃষ্টির দুঃখমৃত্যুর দিকটিকে এই দার্শনিক কবি সদ্ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এরকম ক্ষেত্রে উপলব্ধি হ'ল—

আমার সকল নিয়ে ব'সে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে-জন ভাসায়।

অথবা,— কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

অথবা,— প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,

অথবা,— ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদ-মন্দ্র হে।

যে বিশ্বপুরুষের নৃত্যচ্ছন্দে ধ্বংস-সৃষ্টি জন্ম-মৃত্যু এক হ'য়ে প্রতিভাত হচ্ছে 'সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়' নিমগ্ন হয়েই এই কবি সব কিছুকে আনন্দরূপ ব'লে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

দেখা গেল, কবি বিশ্বের মধ্যেই ঈশ্বরের লীলার অভিব্যক্তি নির্দেশ করেছেন এবং বিশ্বের বাইরে, মানুষের উপলব্ধির বাইরে কোনো তত্ত্বকে স্বীকার করেন নি। এই ঈশ্বর নিজকে নিয়ত প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল, মানুষী প্রেমের জন্যে অধীর, আবার মানুষও অনুরূপ ভাবে অরূপানুভূতি লাভের জন্যে ব্যগ্র। দ্বৈতের মধ্যবর্তী অদ্বৈত প্রেমলীলাতত্ত্বই পরিণামমুখী রবীন্দ্রকাব্যের যা কিছু তত্ত্ব। আমরা প্রস্তাবনায় নির্দেশ করেছি যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মজীবন নানা আকারে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করছিল, আবার উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জীবনাশ্রয়ী রোম্যান্টিক ভাবধারাও ভারতে প্রবেশ ক'রে পূর্ণতা লাভ করতে চেয়েছিল। উভয়ের মিলন ঘটল রবীন্দ্রনাথে। সে মিলনে কোনো ফাঁক রইল না, যেহেতু, একটি ব্যাপক ও স্বয়ম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদের মধ্যে তা বিধৃত হ'ল— যাকে নিঃসন্দেহে ধর্মমূলক বিশিষ্টাদ্বৈত মত বলা চলতে পারে। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা বিশ্বব্রহ্মবাদ তত্ত্ব কবির উপরিউক্ত উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে অক্ষম, কারণ, ব্রহ্মের লীলাময়ত্বের দিক বিশ্বব্রহ্মবাদে পরিস্ফুট নয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র Hegelএর সঙ্গেই কবির বহুলপরিমাণে মিল দেখা যায়। Hegelএর মতই কবির অরূপ

কেবল Absolute Being বা নির্গুণ সত্তা নয়, Becoming অর্থাৎ প্রকাশশীল। Hegel ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শংকরের অনুযায়ী ঈশ্বরকে শুদ্ধ সাক্ষী মনে করেন না, বিশ্বের মধ্যে স্বয়ং নিযুক্ত ব'লে মনে করেন। Hegelএর সঙ্গে কবির উপলব্ধির রীতিরও মিল রয়েছে। Hegelএর মতে বৈচিত্র্য থেকে এবং প্রাথমিক ঐক্যানুভূতি থেকে বিরোধের মধ্য দিয়ে সমাধান রূপ একত্বে গিয়ে উপনীত হই। কবি গীতাঞ্জলির যুগে যে অরূপ-উপলব্ধিতে এসে পৌছেচেন তার পশ্চাতে তিনটি স্তর আমরা লক্ষ্য করেছি: (১) প্রকৃতির শান্তসুন্দর অবস্থার সঙ্গে কবিহৃদয়ের মিলন, (২) প্রকৃতির দুর্যোগময় রূপ ও বাস্তব জীবনের দুঃখবিপদের সঙ্গে ঐ শান্তাবস্থার বিরোধ, (৩) অরূপ-কল্পনায় এর সমাধান। এই ধারাগুলি ইতিপূর্বেই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবি স্বয়ং 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তাঁর উপলব্ধির পশ্চাতের দ্বান্দ্বিক গতিশীলতার কথা ব্যক্ত করেছেন (আত্ম-পরিচয় দ্রঃ)—'যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেন না, এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। .... কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেন না, আমাদের চিত্ত আছে সে-ও আপনার একটা বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। .... যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি

চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। ...... এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানব-লোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। ......তারপর আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখবিপদ বিরোধ-মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।'

কবির দ্বন্দ্বময় উপলব্ধির বিস্তৃত বিবরণই ঐ প্রবন্ধের মূলকথা। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটিতে কবি স্বীয় কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যেরূপ ব্যক্ত হয়েছে অন্য কোথাও তেমন হয়নি। কিন্তু কবির হেগেলীয় চিন্তাধারার উন্মুক্ত প্রকাশ কেবল এখানেই নয়। দর্শন বা ধর্মবোধ যে বিচিত্রের মধ্যে বিরোধ থেকে সামঞ্জস্যে উপস্থিতি তা-ও কবি নানাভাবে বিবৃত করেছেন, যেমন—

> 'এই যে দ্বন্দ্ব — মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়—যে-সমাধানে পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বারবার আমি বলেছি।'

অথবা— 'এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে।'

এ সমস্তই হেগেলীয় চিন্তাধারার কথা। হেগেলের মতই তিনি সাধারণত্বকে বিশেষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দেখতে চান, অনন্তকে সান্তের বাইরে দেখতে চান না, অরূপকে দৃশ্যমান বস্তু বা বিশ্বের

অতিরিক্ত ভিন্নলোকের সত্তা ব'লে মনে করেন না, প্রকৃতি-ব্যাকুলতা থেকে অরূপ-ব্যাকুলতার পরিণাম নির্দেশ করেন। আর কবি ব'লেই Concrete Conceptএরও তিনি অধিকারী। কিন্তু Hegel এর সঙ্গে তাঁর যেখানে অমিল তা হচ্ছে Hegel তাঁর Absolute কে পরিণামমুখী পরিবর্তনরূপে ছাড়া স্বতঃ-পূর্ণসত্তা (Perfection)রূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। অথচ রবীন্দ্রনাথের ধারণা অনুসারে তিনি শান্ত, শিব এবং অদ্বৈত। উপনিষদের কথায়—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। আমরা পরে দেখব Bergson এর সঙ্গে অন্য বহু বিষয়ে মিল থাকলেও কবির এবিষয়ে গরমিল আছে। Bergson পরিবর্তনরূপে ছাড়া ঐক্যতত্ত্বকে দেখতেই পারেন নি, অথচ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের পরিবর্তন-রূপ উপলব্ধি করেন, কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যেই সমূহ বিরোধের সামঞ্জস্য দেখেন। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ তাঁতেই বিধৃত এবং পরিসমাপ্ত। যদিও, লীলার দিক থেকে কবি মানুষের পূর্ণতার পথে যাত্রার কথা বলেছেন এবং তার নৈতিক ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এইখানেই Hegel এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এবং রামানুজাচার্যের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক সাদৃশ্য। রবীন্দ্রনাথ রামানুজাচার্যের মতই সৎ-চিৎ-আনন্দ ও সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ ও ধর্ম ব'লে মনে করেন। পার্থিব বৈচিত্র্যকে স্বীকার ক'রেও অদ্বৈতানুভূতির দিকে ধাবমান হন এবং চিৎ ও অচিৎ এর পরিবর্তনশীলতার মূলাধার অপরিবর্তন সত্তা রূপে নটরাজ (বা ব্রহ্মকে) দেখেন। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির সাময়িক বিরামরূপ প্রলয়ের এবং তারপর আবার নূতন সৃষ্টির ধারণা ব্যক্ত করেন নি সত্য, কিন্তু সৃষ্টির প্রবাহকে অনাদি ও অনন্ত ব'লেই ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে Bergson এর সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের মিল আমরা বলাকা-পর্যায়ে দেখব। রামানুজাচার্যের মত কবি অবশ্য কর্মবাদ মানেন না, আবার দুঃখ বিপদ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তিই সৃষ্টির লীলারহস্য ব'লে মনে করেন, এবং স্বার্থময় সংকীর্ণতা থেকে বা অহংবোধ থেকে ঈশ্বরীয় আনন্দের মধ্যে মুক্তিকেই জীবন্মুক্তি ব'লে মনে করেন ('ঠাকুরদা' আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

খেয়া, শারদোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে কবির অরূপ-উপলব্ধির যে প্রকার আমরা বিবৃত করেছি এবং বলাকা থেকে আরম্ভ ক'রে ঋতুনাট্য ও নটরাজ প্রভৃতির মধ্যে যে ঐক্যলীলাতত্ত্ব প্রকটিত হয়েছে তা-থেকে এই অনুমানে আসা সংগত হবে না যে কবি বিশ্বকে অরূপ থেকে স্বতন্ত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তা ব'লে মনে করেন এবং দ্বৈততত্ত্ব কবির উপলব্ধির বিষয়। শব্দস্পর্শাদির মাধ্যমে কবির যে রসানুভূতি ঘটছে—যাতে বিষয়ের প্রায় বিলোপ ঘটে, তাতে বিষয়কে স্বতন্ত্র সত্তারূপে গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুতঃ বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীর প্রকাশ ঘটলেও বিষয় বিষয়ীকে কবির উপলব্ধি অনুসারে সীমাবদ্ধ করছে না। 'চিত্রা' কবিতায় কবি সৌন্দর্য উপলব্ধি বিষয়ে যে তত্ত্ব বিবৃত করেছেন তাকে একটু প্রসারিত ক'রে অরূপরসোপলব্ধিতেও ঐ উক্তির যথার্থ্য বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে; তা হ'ল এই—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

*　　*　　*

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

দ্বৈতের বা বহুত্বের মধ্যে একত্ব উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের পূর্বে অর্থাৎ তাঁর মানসের একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক গঠন লাভের পূর্বে তাঁর বহু রচনায় প্রকৃতি বা বিশ্বকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলে গ্রহণ করার কথা অবশ্যই আছে কিন্তু তা কবি-সাধারণ মনোবৃত্তি হিসেবেই আছে, যদিও প্রকৃতিকে গ্রহণ বা উপলব্ধির দিক থেকে একটি ঐক্যব্যাকুলতা তখনকার রচনাতেও নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু যাই হোক, তিনি ঐ পর্যায়েই থাকতে পারেন নি এবং যেহেতু তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে, — অরূপ-উপলব্ধিতে এবং তা থেকে অরূপ-জীবনের সমন্বয়ে পরিণাম ঘটেছে, সেইহেতুই তাঁর প্রতিভার অন্তর্নিহিত দার্শনিক সম্ভাব্যতার বিষয়ে আলোচনা চলছে। আর পরিণাম-প্রাপ্ত উপলব্ধিতেও কবি যে দুএকটি ক্ষেত্রে বিশ্বকে স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে তাঁর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন (যেমন 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী' কবিতায়) সেখানে তাঁর উক্ত আচরণ কবি-ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। তা ছাড়া সেখানে তিনি বিশ্ব ও ঈশ্বর উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা মনে ক'রে কবিতা লিখছেন না বা এদের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুভবও ব্যক্ত করছেন না। আমরা কাব্যের মধ্যে কবির ঐক্যরসানুভূতির আগ্রহের স্বরূপ সম্পর্কে খেয়া-স্তরে পূর্বেই আলোচনা করেছি। বৈষ্ণবীয় দ্বৈতের সঙ্গে রবীন্দ্র-উপলব্ধির বিরোধ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। বলা বাহুল্য, ধর্মপ্রেরণামূলক ব্যাপক বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদের সঙ্গেই কবির উপলব্ধির অধিক সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে না। আধুনিক বাউল-সম্প্রদায়ের সাধনার সঙ্গেও বিশিষ্টাদ্বৈতের নানান্ শাখার সাধনমার্গের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রকাব্যে স্বার্থবাসনাময় লৌকিক জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের

সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভার বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় 'এবার ফিরাও মোরে' অথবা 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি দুএকটি জীবন-প্রেরণামূলক কবিতায় স্থূল বাসনাময় জীবন থেকে উত্তরণের প্রবল আগ্রহ কবি প্রকাশ করেছেন, যেমন—

মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

অথবা,—

শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥

কিন্তু অরূপানুভূতি লাভের পরই এই বৈরাগ্য দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত হয়েছে। ঠাকুরদা চরিত্রে এবং ফাল্গুনী, বলাকা প্রভৃতি রচনায় এই ক্ষুদ্রজীবন-বৈরাগ্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কবির প্রত্যক্ষ দার্শনিক অনুভূতিই তাঁর এই স্থির বৈরাগ্যের কারণ। তাঁর নীতিমূলক কবিতাগুলির উৎপত্তি এই বৈরাগ্যবাদ থেকেই। এই বৈরাগ্য আকারে নূতন হ'লেও কার্যতঃ বৈদান্তিক বৈরাগ্যেরই মত। অবশ্য মায়াত্যাগ নয়, মায়াকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল্য দিয়ে জৈবতা থেকে মুক্তি পাওয়ার তত্ত্ব। অথবা লোভ,

বাসনা, স্বার্থ থেকে মুক্ত অবস্থায় বিশ্বকে গ্রহণ করা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা কিন্তু লিপ্ত না হওয়া। কী ভাবে তা সম্ভব? কবি বলছেন, ঠিক বাউলের মত অন্তরের ভোগকামনাহীন, পার্থিবতা-বিনির্মুক্ত মন নিয়ে রসাস্বাদন করতে হবে। তিনি বলেন, ভোগের মধ্যেই বৈরাগী তার একতারা নিয়ে ব'সে আছে। প্রশ্ন হ'তে পারে পার্থিব সুখসম্পর্কগুলি গ্রহণ করলে বৈরাগ্য লাভ করা কি সম্ভব? যেমন, গীতায় বলা হয়েছে, 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' ইত্যাদি? কবি বলেন, নিশ্চয়ই সম্ভব, কারণ পৃথিবীকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করছি। কেবল সুখ নয়, দুঃখকেও গ্রহণ করতে হবে—আনন্দময় চিত্তবৃত্তির বিশেষ অবস্থার সাহায্যে। বলা বাহুল্য, উদাসীন, রসাভিলাষী, কঠিন কবিচিত্ত না থাকলে সুখদুঃখ সম্বন্ধে নির্বিকার আনন্দানুভব আসে না। আসুক বা নাই আসুক, তা অসম্ভব নয়। ঠাকুরদার চরিত্র-আলোচনায় এই বৈরাগ্যের দিক সম্পর্কে বলেছি, এবং বাউলশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে ঐ ভোগমুক্ত সর্বনাশের পথিকের মধ্যে আদর্শ মানুষ কল্পনা করেছেন তা-ও দেখিয়েছি। গীতাঞ্জলি থেকে আরম্ভ ক'রে এই পর্যায়ের বহু গানের মধ্যে, 'অসংখ্য-বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ' প্রভৃতির মধ্যে কবি যে-মুক্তি চান তার নৈতিক জীবনের দিক ফুটে উঠেছে। আমি শুধু 'গীতাঞ্জলি' থেকে তাঁর ভোগবাসনা পরিত্যাগের পরিস্ফুট-ভাবে সমর্থক কতকগুলি স্থান উদ্ধার করছি:

(১) এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।

(২) বাসনা মোর যারেই পরশ
করে সে,
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে
নিমেষে।

(৩) রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন হার—
খেলাধুলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।

(৪) নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে।

(৫) আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ,
রাজসমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র-আলোকে এসো।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে ভোগ করতে চাইলেই ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় না। বিশ্বের প্রকৃতি তা নয়। বস্তুতঃ অবিমিশ্র সুখ বিশ্বে হয় না, দুঃখও আছে। বিশ্বের এই দুঃখরূপকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই স্বীকার করেছেন। আয়োজন যে ভোগের নয় তা বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন—

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিবল বাতি
গ'র্জে এল ঝড়ের রাতি
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।

* * *

ওগো রুদ্র দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইক অবহেলা।

সুতরাং দুঃখ ও সুখ মিশ্রিত বিশ্বের চরমতত্ত্বকে জানলে অতঃপর সংসারে আবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই তিরোহিত হয়ে যায়। তখন নিরাসক্ত চিত্তে দুঃখকে আলিঙ্গন করতেই ইচ্ছা করে। সমগ্র 'গীতাঞ্জলি' কাব্য এই দুঃখবরণের উৎসাহবাণীতে পূর্ণ—

এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—

ঈশ্বরের উপর যে বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বৈরাগী মনে দুঃখকে আনন্দরূপে গ্রহণ করার শ্রেষ্ঠ সহায় তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ববর্তী বহু সাধকের মতই ঐকান্তিক অনুরাগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। 'রাজা' নাটকের সেই—

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি একত্র পাঠ করলেই কবিচিত্তে দুঃখবাদ, বৈরাগ্য ও ভগবদুপলব্ধির একত্রাবস্থানের স্বরূপ বোঝা যাবে—

ওরে ভীরু, তোমার হাতে
নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়।
আসুক নাকো গহন রাতি
হোক না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

ভারতীয় ভাব-সাধনার এই শেষ কথা। ঈশ্বর-বিশ্বাস-রূপ অঞ্জন অনুলেপন ক'রে সেই দৃষ্টিতে জীবনকে যথার্থভাবে দেখা এবং জীবন্মুক্তির সাধনা করা ভারতীয় জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং এই পর্যায়ে তা রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিপাদ্য।

এর পরে যখন 'বলাকা'য় কবির জীবন-দর্শন অরূপ-সমাহিত দৃষ্টিতে

কী আকার লাভ করেছে দেখব তখন গীতালির সঙ্গে (সুতরাং তার পূর্ববর্তী অরূপ-দর্শনমূলক কাব্য বা নাট্যকাব্য গুলির সঙ্গেও) ভাবের দিক থেকে বলাকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাটি প্রথমে স্মরণ করব।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের দার্শনিক পটভূমি বিচার করতে গিয়ে আর একটি বহু-কথিত এবং সাধারণ্যে প্রায় স্বীকৃত তথ্যের মীমাংসা করা প্রয়োজন বোধ করি। তা হ'ল রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের উপর উপনিষদের প্রভাব। আমরা পূর্বে রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের স্বাতন্ত্র্য ও পরিণামের পথে যাত্রার কথা বারংবার উল্লেখ করেছি এবং কাব্য-আলোচনার মূলে তা প্রমাণ করতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আর সেই সঙ্গে এই কথাও নিবেদন করতে চেয়েছি যে কোনো ধর্ম, শাস্ত্র বা তত্ত্বকে রবীন্দ্র-কবিমানসের পূর্বে স্থাপন করলে এই কবি-স্বভাবকে বোঝার পক্ষে বাধা হবে এবং কবিকৃতির প্রাপ্য ন্যায্য মর্যাদা থেকেও কবিকে বঞ্চিত করা হবে। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-কবিমানস যে পরিমাণে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন তা না ক'রে আজ পর্যন্ত আমরা তার স্থানে উপনিষদের আলোচনাই বেশী পরিমাণে করেছি। অথচ কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিমানসের সাধর্ম্যের দিকটি প্রায় অবহেলিত রেখে দিয়েছি। যাই হোক, প্রভাবই বলা যাক বা অজ্ঞাতসারে স্বচ্ছন্দ অনুসরণ করাই বলা যাক এসকলকে যথাযোগ্য স্থানে মিলিত ক'রে একটি পূর্ণ কবিপ্রতিভার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা প্রায়শই হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম ও উপনিষদ চর্চার পরিবেশ এবং কবির পিতার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অবশ্য লক্ষণীয়। কবির কৈশোরে ও যৌবনে রচিত ব্রাহ্মসংগীতগুলি, যেমন, 'নয়ন

তোমারে পায় না দেখিতে', কি 'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি' প্রভৃতি এই প্রকার প্রভাবের নিদর্শন। কবির তপোবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ, এবং নৈবেদ্য কাব্য বা জাতীয়তামূলক প্রবন্ধাবলীর মূলেও হয়ত উক্ত পারিবারিক পরিবেশ সূক্ষ্মসূত্রে যৎসামান্য ক্রিয়া করেছে। কিন্তু উপনিষদের বাণীই যে তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের মূলে রয়েছে এরূপ ধারণা অকর্তব্য ব'লেই মনে করি, কারণ, তাতে অসাধারণতাসম্পন্ন রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের উপর দোষারোপ করা হয়। অর্থাৎ যদি বলা যায় যে 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥' ইত্যাদিরূপ মন্ত্র বসুন্ধরার ন্যায় অতি সুন্দর কবিতার ও অদৃষ্টপূর্ব রোম্যান্‌টিক সর্বাত্মক অনুভূতির পশ্চাতে রয়েছে, অথবা, যেমন মনে করা হয়েছে যে 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে' ইত্যাদি 'দুই পাখি' শীর্ষক নিসর্গ-ব্যাকুলতার কবিতায় মুণ্ডকোপনিষদের 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি মন্ত্রে কথিত বদ্ধ ও মুক্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে, ইত্যাদি, তাহ'লে কবির স্বকীয়তা সম্পর্কে বিশ্বাস হারাতে হয়। এযুগের অন্য উত্তম কবিতাগুলিতে, যথা, সুরদাসের প্রার্থনা, মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, সোনার তরী, মানস-সুন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, উর্বশী, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতির মধ্যে যেমন উপনিষদের তত্ত্বের অনুসরণ নেই, তেমনি উপরি-উক্ত দুটি কবিতাতেও নেই। আমাদের ধারণায় রবীন্দ্র কবি-প্রতিভা মৌলিকতাধর্মী। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো বচনের অনুসরণে কবিতা এত উত্তম হতে পারে তার দৃষ্টান্ত নেই, আর ঐ কবিতাগুলি পাঠ করতে গিয়ে পাঠকের তা মনেও হয় না। ওগুলি স্বকীয় কাব্য-গৌরবেই প্রতিষ্ঠিত, উপনিষদের গৌরবে নয়। তবে

রবীন্দ্রকাব্যের স্থানবিশেষের সঙ্গে উপনিষদ বা বেদের স্থানবিশেষের যে মিল থাকতে না পারে একথা আমরা মনে করি না, যেমন অন্য বহু কবির সঙ্গেও তাঁর রচনার কোনো কোনো স্থানের মিল থাকতে পারে। আর যদি একথা বলা যায় যে কবি-প্রতিভা তার নিগূঢ় ধর্মবশে অতীতের যা কিছু আত্মসাৎ করতে চায় তাহ'লে সেরকম ক্ষেত্রেও 'প্রভাব' শব্দটির ব্যবহার অসমীচীন হবে। কারণ, এই প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। প্রস্তাবনায় আমরা সংক্ষেপে নির্দেশ করতে চেয়েছি যে মহৎ কবিপ্রতিভা অতীত ও বর্তমানকে এমনকি ভবিষ্যৎকেও একসূত্রে গ্রথিত ক'রে মৌলিক স্বভাবসম্পন্ন হয়।

আর এক কথা। কবি রবীন্দ্রের কৈশোরের পরিবেশ আলোচনা কালে যেমন ব্রাহ্মধর্ম ও মহর্ষির কথা মনে করা হয়েছে, তেমনি ভুলে গেলে চলবে না যে ঐ পরিবারেরই দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-অকৃত্রিম বিশুদ্ধ সাহিত্যের হাওয়া বইয়েছিলেন এবং অক্ষয়চৌধুরী ও বিহারীলাল যে-রোম্যান্টিক সংগীত-সুধা পরিবেশন করেছিলেন কিশোর কবি তা-ই সর্বতোভাবে গ্রহণ ও আকণ্ঠ পান করেছিলেন। এঁদের মধ্যস্থতায় একদিকে ইংরেজি রোম্যান্টিক কাব্য এবং অপরদিকে সংস্কৃত রোম্যান্টিক সাহিত্যের সঙ্গে কবির গভীর পরিচয় হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম ও উপনিষদ নিয়ে মহর্ষি বরং দূরে থাকতেন, এবং তিনি পুত্রের কল্পনালোকে স্বেচ্ছাবিহার নিয়ন্ত্রিত করেছেন এমন কোনো প্রমাণ তো নেইই, বরঞ্চ বিরুদ্ধ প্রমাণই আছে। (জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয় প্রভৃতি দ্রঃ) উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র আবাল্য উচ্চারণ করতে কবি অভ্যস্ত থাকলেও সেগুলি সেকালে তাঁর একেবারে আত্মস্থ হয়ে স্বকীয় হয়ে পড়েছিল এমন ধারণা অযৌক্তিক। কবির চিত্তে তখন রোম্যান্টিক

নিসর্গ-প্রীতি, রোম্যান্‌টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা। কবি তখন নূতন কল্পলোকে ধাবমান, উপনিষদ কাকে প্রভাবিত করবে? তাই উপনিষদ সেই সময় যদি কোনো প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে বলা যায়, বা কবি যদি কোথাও উপনিষদের অনুকরণ করেছিলেন, তা কবির প্রতিভার অপরিচায়ক ঐকালের কতকগুলি প্রায় ফরমায়েশি ব্রাহ্ম-সংগীতে। কবির নিজের উক্তি থেকে এ সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহ করতে চাইলে দেখা যায় 'জীবনস্মৃতি' নামক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে উপনিষদ সম্পর্কে কবি অত্যন্ত নীরব। অন্যত্র নানা উক্তির মধ্যে কবি আমাদের জানিয়েছেন যে এযুগে প্রকৃতি-ব্যাকুলতাই তাঁর প্রধান অনুভূতি, উপনিষদের মন্ত্রের জীবাত্মা-পরমাত্মাসম্পর্ক বা ঈশ্বরতত্ত্ব নয়। তাঁর Religion of Man গ্রন্থে তিনি শুধু গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাবের (তা-ও অস্পষ্ট অনির্বচনীয়-ভাবে অনুভূত) কথা উল্লেখ করেছেন এবং সর্বত্র নিসর্গ-ব্যাকুলতা-জাত অরূপ-উপলব্ধির স্বকীয়তার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। পূর্বে খেয়া-শারদোৎসব প্রভৃতি আলোচনার প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে প্রমাণ উদ্ধার করেছি। এ বিষয়ে 'জন্মদিনে' প্রবন্ধে (আত্মপরিচয় দ্রঃ) কবি যা বলছেন তা আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখবার বিষয়: "জন্মকাল থেকে আমার যে-প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিপথে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয়নি। এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে, চারিদিকেই আছে অনির্বচনীয়তা, তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে নি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, বিশেষ পার্বণ-বিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হতে পেরেছে বিশ্বদৃশ্যে.........."—ইত্যাদি।

'পথে ও পথের প্রান্তে'র চিঠিতে কবি এক জায়গায় লিখছেন—

"ঐ প্রতিদিন প্রভাতের কাঁচা সোনাকে কিছুতেই একটুও ম্লান করতে পারে নি, আর আমার দ্বারের কাছে নীলমণিলতা যে-উচ্ছ্বসিত বাণী আকাশে প্রচার করছে আজ পর্যন্ত সে একটুও ক্লান্ত হতে জানল না। আমি ঐখান থেকে আমার জীবনের মন্ত্র নিতে চাই, কোনো গুরুভার গুরুবাক্য থেকে নয়…………"

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছাড়া শাব্দ প্রমাণে কবি বিশ্বাস করেন না। বাল্যজীবন সম্পর্কে কবি যেখানেই উল্লেখ করেছেন সেখানেই প্রকৃতির সঙ্গে স্বকীয়ভাবে গঠিত নিজ আত্মিক যোগের কথা বলেছেন। উপনিষদ সম্পর্কে কবি যেখানে উল্লেখ করেছেন সেখানেই তার স্বর ও ধ্বনিমন্ত্রের কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। প্রাচীন ভারতের যে তপোবনাদর্শে কবি উদ্বুদ্ধ হয়ে পরে ধর্মাদর্শ তথা উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করেন সে তপোবনাদর্শ তিনি কালিদাসের কাব্য থেকেই পেয়েছিলেন, উপনিষদ থেকে নয় (উক্ত 'আত্মপরিচয়' দ্রঃ)। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা জীবনাশ্রয়ী ব'লেই উপনিষদের তাত্ত্বিকতা থেকে কালিদাসের কাব্য তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উপনিষদ বা বেদ থেকে কোনো কোনো কল্পনা বা তত্ত্ব গ্রহণ করলেও, তাঁর কবিমানসের মূলে সমগ্রভাবে উপনিষদের বা বেদের প্রভাব স্বীকার করা যায় না, এবিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য মানতেই হয়।

আমরা মনে করি, উপনিষদকে যদি রবীন্দ্রনাথ কখনো আত্মীয়-ভাবে গ্রহণ ক'রে থাকেন তা 'নৈবেদ্যে'র পূর্বে নয়। তার পূর্বে বরঞ্চ 'চৈতালি'তে কালিদাসের তপোবনাদর্শ এবং 'কল্পনা' কাব্যে প্রাচ্যকাব্যাদর্শ অনুসরণের স্পৃহা দেখা যায়। 'নৈবেদ্য' রচনার

পূর্বে ‘ঔপনিষদ ব্রহ্ম’ (পরে ‘ব্রহ্মমন্ত্র’) রচনার মধ্যেই কবিকে প্রথম স্বকীয়ভাবে উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এইজন্যে নৈবেদ্যের মধ্যেই উপনিষদের ভাবাদর্শের প্রথম ও স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। নৈবেদ্যের মধ্যে উপনিষদের বহু মন্ত্রের ভাব ইতস্ততঃ নানা আকারে বিক্ষিপ্তও দেখা যায়, যদিও এদের সমঞ্জসীকরণের ধারাটি কবির নিজের। আমরা এ সকল কথা পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম থেকেই উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের বিবেচনার জন্যে আরো দুটি কথা আমরা বলতে চাই। একটি হ’ল এই যে, উপনিষদ কোনো পরিস্ফুট দার্শনিক মতবাদ নিয়ে রচিত হয়নি। বিভিন্ন ঋষি তাঁদের উপলব্ধি বিভিন্নভাবে বিবৃত করে গেছেন, একে সমঞ্জসীভূত যুক্তিতর্কপ্রতিষ্ঠ কোনো দার্শনিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ তাঁরা করেন নি। পরবর্তীকালে এর উপর নির্ভর ক’রেই বহু যথার্থ দার্শনিক মতবাদ গ’ড়ে উঠেছে। এই সকল মতবাদে উপনিষদের বহু বচন নানা দার্শনিকের স্বকীয় মতানুসারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অতএব যাবতীয় দর্শনের বীজরূপ উপনিষদের সঙ্গে সেই উপনিষদের উপর নির্ভরশীল কোনো একটি দার্শনিক মতের দাতা-গ্রহীতারূপ সম্পর্ক স্থাপন অনুচিত। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা প্রভাবান্বিত এমন কথা অত্যন্ত ব্যাপক কথা মাত্র, এবং তাঁর কাব্যের বিশেষ আলোচনায় এমন ব্যাপক উক্তিও অযৌক্তিক। কারণ, তখনই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে উপনিষদের পরস্পরবিরুদ্ধ নানা উক্তির মধ্যে এবং তা নিয়ে গঠিত নানা মতবাদের মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত ?

এইরূপ যুক্তিসংগত প্রশ্ন থেকে আমরা আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্যটির মধ্যে উপনীত হচ্ছি। তা হ'ল এই যে উপনিষদের মন্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বকীয়ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, যেমন হয়েছে পূর্বেকার বিভিন্ন মনীষীদের দ্বারা। কবি আপনার কাব্য ব্যাখ্যাকালে অথবা ধর্ম ও আদর্শ-সম্পর্কে ভাষণের কালে, উপনিষদের বহু বাণী যদ্যপি উদ্ধার করেছেন, সেগুলির স্বকীয় উপলব্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেগুলিকে স্বকীয় উপলব্ধির সমর্থক হিসাবেই অন্তরে গ্রহণ করেছেন। তা যদি না হ'ত অর্থাৎ কবি যদি উপনিষদকে স্বীয় মনের অনুকূল-ভাবে গ্রহণ না করতে পারতেন তাহ'লে গ্রহণ করতেনই না; কারণ, পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কতকগুলি বিশেষ মন্ত্র কতক-গুলি বিশেষ অর্থেই কবির প্রিয়, উপনিষদের সব বচন নয় এবং পূর্বসূরিদের অর্থে নয়।

মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠে জানা যায় যে ধর্ম নামক বস্তুটি তিনি প্রথমে স্বকীয়ভাবে হৃদয়ে লাভ করেছিলেন (তু°—হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ—মনু) এবং পরে উপনিষদের সঙ্গে স্বীয় উপলব্ধি মিলিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ আত্মজীবনীতে তিনি বিবৃত করেছেন যে অসংখ্য উপনিষদের কণ্টকারণ্যে পরস্পরবিরোধী অগণিত মতবাদের ভিড়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের (যা তাঁর হৃদয়ে উপলব্ধ) জন্য কোন্ কোন্ উপনিষদ ও কোন্ কোন্ মন্ত্র গ্রহণীয় তা তাঁকে বিচার করতে হয়েছে। এবিষয়ে তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ প্রণিধানযোগ্য—"দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর

হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক মহর্ষির ধর্মের সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্কের চেয়েও অধিকতর সুদূর বই আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ কবি স্বীয় কাব্যজগতের উপলব্ধিকে পরবর্তী কোনো না কোনো সময় উপনিষদের বাণীর সঙ্গে স্বকৃতভাবে মিলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্টি বোধ করেছেন মাত্র; ধর্ম, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি বক্তৃতামালায় বা প্রবন্ধে স্বীয় ধর্মবোধ বা জীবনদর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপনিষদ থেকে তাঁর উপলব্ধির সমর্থক মন্ত্র মাত্র উদ্ধার করেছেন। অথচ পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিকৃতির পশ্চাতে উপনিষদ খোঁজবারই চেষ্টা করেছেন। এ কথা ভেবে দেখেন নি যে কবি যে-অর্থে উপনিষদ গ্রহণ করলেন সেই অর্থ নিয়েই আবার তাঁকে প্রভাবিত বলা যুক্তির দিক থেকে ভ্রান্তিময়। আমরা উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়ভাবে উপনিষদকে গ্রহণের নিদর্শন দেখাতে চাই:

ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' মন্ত্রটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন যে এই মন্ত্রটি বার বার তাঁর কাছে নূতন নূতন অর্থ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। 'তেন ত্যক্তেন (ভুঞ্জীথাঃ)' এর অর্থ করেছেন 'তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন' (ঔপনিষদ ব্রহ্ম)। এই ব্যাখ্যা মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মসম্মত এবং শাংকর ভাষ্যের অনুকূল। এই' অংশের রামানুজাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন 'তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন অর্থাৎ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে। এই ব্যাখ্যাই রবীন্দ্রনাথ পরে গ্রহণ করেছেন।

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক:' প্রভৃতি মন্ত্রে 'স্তব্ধ' শব্দকে

রবীন্দ্রনাথ স্থির, ধ্রুব, অপরিবর্তিত অর্থে গ্রহণ করেছেন (প্রাচীন ভারতের একঃ—ধর্ম)। অথচ শ্রীরামানুজের ব্যাখ্যায় দেখছি 'স্তব্ধ' অর্থাৎ যিনি কারো কাছে প্রণত হন না।

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ শব্দের অর্থ শংকর-রামানুজ মতে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, অন্যত্র 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' ইত্যাদি 'ব্রহ্মের উপাসনরূপ আনন্দ'। মহর্ষি মোটামুটি এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দ' বলতে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ রূপরসাদির অনুভবের পরিণামাবস্থাকেই নির্দেশ করছেন। কবির মতে এই অনুভবই সত্যবস্তু। 'সাহিত্যের পথে' নামক সমালোচনা পুস্তকের 'কবির কৈফিয়ৎ' থেকে কবির ব্যাখ্যা দেখা যাক—

> 'আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে। এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলতে চান জগতে পাপ নাই দুঃখ নাই রেষারেষি নাই।..................... কিন্তু কবির বীণায় বরাবর বাজিবে— আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে................সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে আলোক-বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে—আনন্দং সম্প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি—যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার জন্য নহে।'

'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যাও কবি

স্বীয় কাব্যস্বভাবের অনুকূলভাবেই করেছেন। 'শুক্লসন্ধ্যায় আকাশ জ্যোৎস্নায় উপচে পড়েছে.............. ...বলি, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সেই যে যৎ, আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ।' অমৃত শব্দের শংকর ও রামানুজ মতে ব্যাখ্যা 'দেবতাত্মভাবম্' বা 'দেবতাত্মগমনম্'। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> 'অমৃতের দুটি অর্থ—একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হ'ল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় মাত্র। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন—অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে।' 'আবিঃ' শব্দকেও রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ আনন্দরূপে প্রকাশের অর্থে গ্রহণ করেছেন—'কিন্তু যিনি আবিঃ যিনি প্রকাশরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন।' ('সাহিত্য'—সাহিত্যের পথে)

এখানে আবার মহর্ষির সঙ্গে কবির মতৈক্য দেখতে পাই—'যখন সেই সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভাসৌন্দর্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।' 'আনন্দং ব্রহ্মণো' ইত্যাদিকে কিন্তু মহর্ষি 'ব্রহ্মের আনন্দ' ব'লে অভিহিত করেছেন।

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' এ অংশের 'তপোঽতপ্যত' ইত্যাদির অর্থ শংকর ও রামানুজ উভয়েই একভাবে করেছেন—'তপ ইতি জ্ঞানমুচ্যতে। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ........................স তপোঽতপ্যত তপ্তবান্ সৃজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়াম্ আলোচনামকরোৎ'—অর্থাৎ, তপঃ

শব্দের অর্থ জ্ঞান ; অন্য এক মন্ত্রে আছে যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ; তিনি তপ করলেন অর্থে জগৎসৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করলেন। মহর্ষিও এঁদের অনুসরণ করেছেন—"তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয়ে আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন' (আত্মজীবনী)। রবীন্দ্রনাথ এই 'তপস্যা' করার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দিচ্ছেন। আমাদের পার্থিব দুঃখানুভূতির সাদৃশ্যে তিনি ঈশ্বরেও ঐ প্রকার দুঃখানুভূতি কল্পনা করেছেন। নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাংশ দ্রষ্টব্য :—

'সেই তাঁর তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি'। (দুঃখ—ধর্ম)

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় পথ অর্থে শংকরাচার্য আত্মজ্ঞান বা মুক্তির পথ মনে করেছেন—'পথঃ পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং..................জ্ঞেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পথই পথ ; জ্ঞেয় বিষয়ের অতিসূক্ষ্মত্বের জন্যে জ্ঞানমার্গ দুঃখকর। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে, লৌকিক বিঘ্নবিপৎ-সংকুল পতন-উত্থান-বন্ধুর পন্থা। বাস্তব জীবন-সংগ্রামের গৌরব কবি এইভাবে বিবৃত করেছেন—"অতএব প্রভাতে যখন বনে উপবনে পুষ্পপল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজশোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন

বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না?........................সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র, সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়-চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ—'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' (মনুষ্যত্ব—ধর্ম)।

'ভয়াদগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ' ইত্যাদির ব্যাখ্যায় শংকর এবং রামানুজ 'ভয়াৎ' শব্দে 'তাঁর শাসনের নিয়মানুবর্তী হয়ে' এরূপ অর্থ করেছেন। মহর্ষিও তাঁদের অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভয় শব্দের প্রয়োগকে বিশেষণে আরোপিত ক'রে তিনি ভয়ানক, তিনি গুহাহিত, তিনি জগতের দুঃখরূপ, এরূপ অর্থ করেছেন।

এই আলোচনায় আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র করতে পারলাম। বিষয়টি বিস্তৃততর আলোচনা ও গভীরতর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে, রবীন্দ্রনাথের মুক্ত কবিস্বভাব তত্ত্বের চাপে কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়নি ব'লেই আমরা মনে করেছি। তা নানাভাবে একটি স্বকীয় পরিণামের পথেই ধাবমান হয়েছে। সেই পরিণামের পথে কিভাবে আপনা থেকেই আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ, পদাবলীর ভাষাভঙ্গি, সংস্কৃত রীতি ও সাহিত্যাদর্শ, কালিদাসের তপোবন, উপনিষদ এবং মরমী বাউলদের জীবন-সাধনা সমন্বয়ধর্মী ও যুগোপযোগী মৌলিক রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভায় মিশে গেছে তারই ইতিহাস আমরা চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তত্ত্বের

অনুসরণে মহৎকাব্যসৃষ্টি হয় না, এই অতি মূল্যবান ধারণা স্মরণে রেখে পূর্বনির্দিষ্ট শাস্ত্র বা তত্ত্ব দিয়ে কবিকে দেখার চেষ্টা করিনি। কবি নিজেও যে এরূপ দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না সে সম্বন্ধে তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু আত্ম-আলোচনামূলক উক্তি আছে। পূর্বপূর্ব আলোচনায় এরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধারও করা গেছে। সুপরিণত বয়সে লেখা চিত্রা কাব্যের ভূমিকার (রচনাবলী দ্রঃ) শেষ কয় পঙ্‌ক্তিতে বেদনার সঙ্গে কবি যেখানে তাত্ত্বিক সমালোচকদের বিচারের প্রতিবাদ করছেন, সেখানে তিনি এই কথাই জানিয়েছেন যে কেবল উপনিষদের অনুসরণে কাব্য হয় না:

'লোক-জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা ক'রে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং উপনিষদিক মোহ বিস্তার ক'রে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি—এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা ক'রে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন।'

প্রয়োজনবশে তিনি কাব্যরচনাতেও নানাস্থানে পূর্বনির্দিষ্ট তাত্ত্বিকতার ও তাত্ত্বিক পারিপার্শ্বিকের অনুসরণের প্রতিবাদ করেছেন এবং পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্তি থেকে সাবধান হওয়ার জন্য অনুনয় করেছেন, যেমন উৎসর্গের—'বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে দেখো না আমায় বাহিরে' ইত্যাদিতে। ঐ কাব্যেই চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির একটি কবিতায় কবি বলছেন যে কোনো কবি তাঁর অপার বিস্ময়দৃষ্টি তাত্ত্বিকদের কাছে পেতে পারেন না—

'আছি আর আছে'
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে

শুধাইব অর্থ এর ? তত্ত্ববিদ তাই
কহিতেছে 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া॥

'গীতিমাল্যে'র একটি গানের মধ্যে কবি দৃঢ়ভাবে বহিঃপ্রভাবকে অস্বীকার করলেন এবং স্বতোবিকাশশীল আত্মসচেতন কবিধর্ম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নিজ ধারণা ব্যক্ত করলেন—

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার।
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে,
কথার কি তার অন্ত আছে—
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার।

কবি তাঁর এই সর্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীন মনোধর্মের বৈশিষ্ট্য সায়াহ্নের রচনা 'পত্রপুটে'র পনেরো সংখ্যক কবিতায় বিশেষ জোরের সঙ্গেই জানাতে চেয়েছেন। তিনি যে কোনো বাঁধাধরা ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁর মানস যে সহজভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং তাঁর সাধনা যে মধ্যযুগের কবীর, দাদূ, ও মরমিয়া বাউল

সম্প্রদায়ের সাধনার সগোত্র তা এই কবিতাটিতে তিনি যেমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন এমন আর কোথাও নয়, যেমন—

কবি আমি ওদের দলে,—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পুজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে ?"
আমি বলি, "না।"
অবাক হয়ে শুনে, বলে "জানা নেই পথ ?"
আমি বলি, "না।"

* * *

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাইরে আমার আত্মবিস্মৃত পুজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারিনি।

অতএব রবীন্দ্র-রহস্যলোকের দীপবর্তিকা কবি স্বয়ং। কবিকে বুঝতে উপনিষদ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও তা গৌণ। কবি ব'লেই একমাত্র কালিদাসের বিশিষ্ট কল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মিল কোথাও কোথাও দেখা গেছে এবং তাকে প্রভাব বললেও রবীন্দ্র-প্রতিভা কতকাংশে কালিদাসের সমধর্মী ব'লেই তা ঘটতে পেরেছে এমন ধারণা করাই সমীচীন। অন্যথায়, বিভিন্ন আদর্শের বশবর্তী হ'য়ে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে কবি কাব্যরচনা করেছেন, এমন অযৌক্তিক ধারণায় আসতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির তাত্ত্বিকতা বিশ্লেষণে কবিকে যদি মোটামুটি ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈত শ্রেণীর ভাব-সাধকদের পর্যায়ভুক্ত করা যায় এবং একান্ত দ্বৈতবাদী ধারণা থেকে তাঁকে মুক্ত ক'রে দেখা যায় তাহ'লেও একটা অপেক্ষিত প্রশ্ন আলোচনা করতেই হয় তা এই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তদের সম্বন্ধ কী? রবীন্দ্রনাথ কি বৈষ্ণব কবি? বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে যে রবীন্দ্রনাথে অনেকেই বৈষ্ণবধর্মেরও প্রভাব দেখেছেন, এবং ভাষায় ও ভঙ্গিতে তাঁর কাব্যে ও নাট্যে বৈষ্ণবীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বেকার তত্ত্বালোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে যে-দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ধ'রে দেখবার চেষ্টা করেছি তাতে বৈষ্ণব ধর্মোপলব্ধির সঙ্গে কবির উপলব্ধির ঠিক পার্থক্যের দিকটি দেখানো হয়নি।

রবীন্দ্রনাথে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবদর্শন মূলতঃ বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা ও ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-কাব্যে ভাষা ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ প্রকাশ পেয়েছে ব'লেই তাঁর আন্তর ধর্মের দিকে লক্ষ্য না রেখে তাঁকে বৈষ্ণব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ গীতিকবি, দ্বিতীয়তঃ বাঙালি কবি এবং তৃতীয়তঃ অরূপ-সাধনার ধর্মভাবুক কবি ব'লেই বৈষ্ণব ভাব-ভঙ্গি অনায়াসেই তাঁর কাব্যে সংক্রমিত হতে পেরেছে। কারণ, এ ছাড়া কবির আত্ম-প্রকাশের কোনো উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এবং পদাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য স্বাদে বিভিন্ন হ'লেও অনেক সময় রূপে এক হ'য়ে পড়েছে। তাঁর কাব্যে পদাবলী-সাহিত্যের রূপকৌশলের বা ভঙ্গির অস্তিত্বই কোনো কোনো রসজ্ঞ পাঠককেও বিভ্রান্ত করেছে, যার ফলে কবির অরূপকে বৈষ্ণবীয় ঈশ্বররূপে অভিহিত করতে তাঁদের বাধে নি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'জীবন-দেবতা' যদিও ঈশ্বর নন, কবির অন্তরস্থিত চালকশক্তি বা অহং মাত্র, তথাপি তার বর্ণনায় এবং স্তুতিবাদে কবি কল্পিত মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং বৈষ্ণবীয় ভঙ্গি সম্পূর্ণ আরোপ করেছেন, যার ফলে ব্যক্তিগত জীবন-দেবতা ঈশ্বর-ভ্রান্তি ঘটাতে যথেষ্ট সমর্থ হয়েছে। পদসাহিত্যের অভিসারিকা; বাসকসজ্জা প্রভৃতির বাকৃচিত্রও সেখানে বাদ যায় নি। গীতাঞ্জলি প্রভৃতি অরূপানুভূতিপ্রধান কাব্যেও অনির্বচনীয় অরূপের সঙ্গে কবি প্রভু-ভক্ত বা প্রিয়-প্রেমিক সম্পর্ক আরোপ করেছেন ব'লে এবং পূজা, আরতি প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ব'লে, কবির সঙ্গে অরূপের সম্পর্ক তত্ত্বতঃ পৃথক হ'লেও দৃশ্যতঃ বৈষ্ণবীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। রাজা নাটকে কবি যেন এইভাবে চূড়ান্ত ভ্রান্তি উৎপন্ন করেছেন। সেখানে তিনি সুদর্শনার 'স্বামী', 'পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই', রাজার হৃদয়ে সুদর্শনা তাঁর 'দ্বিতীয়'। রাজা সুদর্শনার যে ভাবমূর্তি দেখতে চান তা বৈষ্ণবীয় বাসকসজ্জারই নামান্তর—

ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে।
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।

আবার ঠাকুরদা রাজার 'বন্ধু' বা 'সখা', আর সুরঙ্গমা—

'আমি কেবল তোমার দাসী।...
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।'

এই রাজা অরূপ, অথচ তাঁর হাতে বাঁশি বাজে—

'আমার রাজাটির নিজের নাকি কোন রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো

এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে। এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার……আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।'

অরূপানুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিকে এই যে বৈষ্ণবীয় ভাব-মণ্ডনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে তার অভ্যন্তরে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ঈশ্বর কিন্তু আবৃত হয়ে পড়েন নি। তাঁর যে কোনো রূপ নেই, বিশ্বের বিচিত্র রূপের মধ্যেই অরূপভাবে তিনি যে প্রকাশমান, তিনি যে ভয়ংকর-সুন্দর, সুতরাং কবির ভাষায় অনুপম—তা নাট্যের মধ্যে সংলাপে গানে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। ঐ নাটকে সুদর্শনাকে রাজা যখন প্রশ্ন করলেন 'আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না' এবং সুদর্শনা তার উত্তরে যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের—বর্ণগন্ধগীতের অপূর্ব মোহের কথা উল্লেখ করলেন তখন রাজা পুনরায় প্রশ্ন করলেন—'এত বিচিত্র রূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ?' বস্তুতঃ কবির এই ভয়ংকর-সুন্দর অতি গভীর, সুদুর্দর্শ; অন্ধকারে অর্থাৎ গভীরতম দুঃখোপলব্ধির মধ্যে তিনি যেমন অনুভবগম্য, তেমনি সৌন্দর্যের সুখকর বৈচিত্র্যের মধ্যেও। তিনি সুন্দর, অথচ তিনি অন্ধকারের প্রভু, তিনি নিষ্ঠুর, তিনি ভয়ানক। এইজন্যেই তিনি অনুপম। তিনি রসিক-শেখর সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ নরবপু শ্রীকৃষ্ণ নন।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালিতে দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় নিসর্গ-সৌন্দর্যেই অরূপের আবির্ভাব ঘটছে। সজল ঘন বাদল বরিষনে তাঁকে আহ্বান করা হচ্ছে, শেফালিকা-বিকীর্ণ শিশির-সিক্ত পথে তিনি হেঁটে আসছেন, ঝড়ের রাত্রে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। কখনো যদি বা তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়, তাঁকে চোখে দেখা যায় না, কারণ

বহিঃপ্রকৃতিজাত অনুভূতির মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায় মাত্র। অপিচ তিনি নরদেবতা, পথের সাথী, ব্যথাপথের পথিক। তিনি কোনো মন্দিরে আবদ্ধ নন ; তিনি শুধু মনের মানুষ, তরীর মাঝি ; তাঁর হাতে বাঁশি যদিও বাজে, তা বজ্রের মৃধ্যে বাজে। বৈষ্ণবদের ঈশ্বরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অরূপের একমাত্র অতি ব্যাপক মিল এই যে উভয়েই হৃদয়ানুভবগম্য। বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাউলদেরও এই একমাত্র সাদৃশ্য।

বৈষ্ণবদের ঈশ্বর মানবীয় বিভিন্ন অনুভবের দৃষ্টান্তে কল্পনীয়, কিন্তু মানবীয় সম্পর্কের দ্বারা বেদ্য নন ; তিনি প্রকৃতিতেও নেই, তিনি সমস্ত লৌকিকতা-মুক্ত অলৌকিক সত্তা। বৈষ্ণব মতে মানবীয় প্রেম যত উচ্চস্তরেরই হোক না কেন তা স্বার্থমলিন, অথচ ঈশ্বরীয় প্রেম 'শুদ্ধ গঙ্গাজল' 'নিকষিত হেম' 'কামগন্ধহীন'—'হেন প্রেমা নৃলোকে না হয়।' শান্তাদি যে পঞ্চরসে তিনি আরাধ্য তা-ও দিব্য। তিনি মূর্তিমান শৃঙ্গার, সর্বগুণাধার, সর্বরূপাশ্রয়। কৃষ্ণনাম ছাড়া নাম নেই, কৃষ্ণরূপ ছাড়া রূপ নেই, কৃষ্ণগুণ ছাড়া জগতে কোনো গুণেরই অস্তিত্ব নেই। শোভা-সৌন্দর্য, পুত্র-কন্যা, ভাই-বন্ধু সব কৃষ্ণময়—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' সুতরাং তিনি মূলে একমেবাদ্বিতীয়ম্, লীলারসবৈচিত্র্যের জন্য দ্বৈতভাবাপন্ন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে যদি বিশ্ব নেই তাহ'লে কিছুই নেই। বিশ্ব ছাড়া ঈশ্বরের প্রকাশ নেই। বিশ্ব তাঁকে ধ'রে রেখেছে, তিনি বিশ্বকে আবৃত ক'রে নিজে প্রকাশমান নন। দৃশ্যগন্ধগান হ'ল তাঁর প্রকাশের মাধ্যম। ঐ সকলের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে চিত্তে যে রসসঞ্চার হয়, তাতে স্থূল প্রয়োজনের জৈব জীবন পরিত্যক্ত হয় এবং রসপিপাসু আনন্দচৈতন্যময় অবস্থায় বিরাজ করতে থাকেন, আর তাতেই অরূপের স্পর্শ লাগে। তিনি কৃপা ক'রে মানবদেহ ধারণ করছেন না, বাস্তব

মানবদেহে, মানবীয় সুখদুঃখের মধ্যেই তিনি লভ্য হচ্ছেন। তবে স্থূল প্রয়োজন-সম্পর্কে নয়, তার অতীত বাস্তব তুরীয়াবস্থায়। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে পান, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাধনমার্গ বৈষ্ণবের বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত। একমাত্র বাউলদের সঙ্গেই তা কতক পরিমাণে তুলনার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সৃষ্টির বাইরে নন, স্বয়ং মায়াময়, লীলাময়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈষ্ণব ঈশ্বরের এই বিশ্ববহির্ভূত অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রথম আক্ষেপ শোনা গেল 'বৈষ্ণব কবিতা' নামে সোনার তরীর একটি কবিতায়। বৈষ্ণব পদাবলী কাব্য-সৌন্দর্যে অপরূপ, এর মানবীয় প্রেমসম্পর্কের চিত্র অদ্ভুত সুন্দর, অথচ লৌকিকভাবে, মানবপ্রেমের কাব্যরূপে এর রসগ্রহণ বৈষ্ণবধর্মসম্মত নয়। ঈশ্বরীয় ভাবে অনুপ্রেরিত হয়েই পদাবলী আস্বাদন করতে হবে, কারণ, এর রাধাও মানবী নন, কৃষ্ণও মানব নন, কেবল আরোপিত প্রেমসম্পর্কে আবদ্ধ। আধুনিক কবি, যিনি বিশ্বের অতিরিক্ত ঐশ্বরিক সত্তা মানেন না, যিনি মানুষী প্রেমকেই ঈশ্বরীয় মনে করেন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় প্রকাশ করলেন,—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?'—

এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।

কবি বোঝেন না যে যা দেবতাকে দিতে হয় তা প্রিয়জনকে দিতে নেই, যা প্রিয়জনের উপহার তা দেবতার পুজায় অচল।

প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ঈশ্বরকে তাঁর মহিমময় উচ্চাসন থেকে মানুষের দ্বারে নামিয়ে এনেছিল মাত্র, একেবারে মানুষ ক'রে

গ'ড়ে তোলে নি। জীবের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ যদি বা করেছে, জীবকে দেবতারূপে দেখেনি। বাউলেরা বৈষ্ণবদের থেকে ভিন্নপথে আর একপদ অগ্রসর হয়েছিলেন মানবীয় সম্পর্কের মাধ্যমে দেবতাকে দেখতে চেয়ে, মানবের বাইরে নয়। মনের মানুষের অনুসন্ধান এবং পার্থিব আনন্দসম্পর্কের শ্রেষ্ঠ বস্তু যে প্রেম তারই দেহবাসনামুক্ত ঘনীভূত রসাস্বাদ তাঁদের লক্ষ্য। বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবসাধনার এ এক অভিনব পন্থা। বাউলদের গানে যা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তা-ই রবীন্দ্রনাথে একটি সমঞ্জসীভূত পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই মানুষী প্রেমবাদকে একটি বহুব্যাপক পটভূমিকার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে প্রকৃতি, সৌন্দর্য, স্নেহ, প্রীতি সব একাকার হয়ে পড়েছে, এক আনন্দরসাস্বাদের ঐক্যসূত্রে সকলই একত্র স্থানলাভ করেছে। অনাসক্ত ভোগবাদ, ত্যাগের দ্বারা চরিতার্থ ভোগস্পৃহা, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আগত বিষয়ানন্দকে ইন্দ্রিয়োত্তীর্ণ বিশুদ্ধ আনন্দে রূপান্তর করা—এই আর্টের মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কাম্য। এই হ'ল তাঁর অরূপানুভবের স্বরূপ এবং এইখানে তিনি সকলের থেকেই পৃথক। এই অভিনব মুক্তিবাদ তিনি তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে পান নি; তাঁর অন্তরে আপনা থেকেই এই চরম তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে—

> মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস তত্ত্ব-শিরোমণির পিছে?
> হায়রে মিছে, হায়রে মিছে!

সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করলে দেখবেন 'মুক্তি' কথাটি এই নূতন অর্থেই কবি সর্বত্র প্রয়োগ করছেন।

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

এখানে ব্যবহৃত প্রথম 'মুক্তি' শব্দটি বিষয়কে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে চিরাচরিত বৈদান্তিক মুক্তি নির্দেশ করছে। দ্বিতীয় 'মুক্তি' কবির স্বকীয় উপলব্ধিগত অর্থযুক্ত। বিষয়কে গ্রহণ ক'রেই বাসনা থেকে আনন্দে উত্তরণের মুক্তি। সহজানন্দ। এই মুক্তি দুঃখেও সুখেও। কবির কাম্য এই মুক্তির স্বরূপ অন্যত্রও একই ভাবে বিবৃত হয়েছে—

এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—

কবি যে মুক্তিই পেতে চান, স্বার্থজড়িত গতিহীন অবস্থায় বেঁচে থাকতে চান না তা নিম্নলিখিত গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে—

এই কথাটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে,
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।

পুরবীর 'মুক্তি' কবিতায় কবির অভিপ্রায় আরো স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হয়েছে এবং সেখানেও রসগত মুক্তির প্রতিই কবি নির্দেশ করেছেন—

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,

সেথা আমি খেলা-খেপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।

কবির রচনার বহুস্থলেই বৈষ্ণবতার প্রতিবাদ স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরকৃপা প্রার্থনা করেছেন। ঈশ্বরকৃপা ছাড়া ভক্তির উদয় হয় না, আত্মজ্ঞানও জন্মে না। 'জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্না।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

কবি বড় জোর বীর্যের সঙ্গে সুকঠোর সাধনপথে চলবার সাহস প্রার্থনা করতে পারেন—

ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল,

এইজন্য জ্ঞানহীন অ-সাধনলব্ধ 'উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা' কবির অভিলষিত নয়। যে জীবনভাবুকতা বা প্রকৃতিভাবুকতার উপর কবির ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা তা পুরবীর 'ভাঙা মন্দির' কবিতাটিতে চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতাটি দেবতা সম্পর্কে লৌকিক ধারণা ও কবির ধারণা এ দুয়ের বৈপরীত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই লেখা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সুন্দর আপনা থেকে ধরা দিচ্ছেন, ভাঙা মন্দিরে নাই বা দেবতা থাকল। অতিথি-সজ্জনের আগমন নেই, কিন্তু তাদের স্থান পূর্ণ করেছে বিহঙ্গেরা—

পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।

নিত্যসেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্ত পরাণে করিছে কূজন
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎস-তীরে।

গীতাঞ্জলির 'ভজন পুজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে, অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে, কাহারে তুই পুজিস সংগোপনে নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে' প্রভৃতির মধ্যে এই অরূপ-তত্ত্ব পুরবীর বহুপূর্বেই পরিস্ফুট হয়েছে। কবির এই অরূপ-তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে উপলব্ধ অন্তরতম সত্য। তা অভিনব এবং উনিশ শতকের পার্থিবতা-কলুষিত জীবন-কোলাহলের মধ্যে যুগোচিত জীবনাশ্রিত মুক্তির বাণীতে সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের অরূপ-দর্শনের সঙ্গে মৃত্যু-সম্পর্কে তাঁর ধারণা অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত। মৃত্যু সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন যে ধারণা ব্যক্ত করেছে রবীন্দ্রনাথও সেই সত্যে উপনীত হয়েছেন। তা এই যে, দৃশ্যতঃ মৃত্যু আছে, কার্যতঃ নেই। আমরা রূপ-রূপান্তর এবং জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। মৃত্যুর মধ্যেই একটা জীবনের পূর্ণতা, এবং এইভাবে নানা রূপের মধ্য দিয়ে আমরা পরিণামের পথে এগিয়ে চলেছি। সুতরাং মৃত্যুভয় অকর্তব্য। কিন্তু এই পরিণাম মুক্তি অথবা নির্বাণ, সালোক্য না সাযুজ্য ? বলা বাহুল্য, এ-রকম কোনো ভাষাতেই কবি তাঁর উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেন নি। রাজা ও ডাকঘর নাটকের মধ্যে এ-সম্পর্কে তিনি আভাসে মাত্র জানিয়েছেন। তা ভাষায় ব্যক্ত করলে বলা চলতে পারে অরূপ-সাক্ষাৎকার বা দৃশ্য-গন্ধ-গানের মাধ্যমে রস-স্বরূপ সত্তার সঙ্গে যে সম্মিলন তাতেই জীবনের পরিণাম। 'রাজা' নাটকে ভয়ানক-সুন্দর জীবনের মধ্যেই ধরা দিয়েছেন যাঁরা জীবন্মুক্ত

হয়েছেন তাঁদের কাছে, আর 'ডাকঘরে' অমল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অরূপরহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'ফাল্গুনী' নাটক এবং বলাকা ও পুরবীতে যেখানে জীবনকে অরূপসমৃদ্ধ দৃষ্টিতে বৃহত্তর ভাবে দেখা হয়েছে সেখানেও কবি জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণামের কথা ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। যাই হোক, মৃত্যু সম্পর্কে কবির ধারণা তাঁর অরূপ দর্শনের মধ্যেই একটি পূর্ণ সংগতি লাভ করেছে। কিন্তু অরূপানুভূতির মত এই উপলব্ধিও কবি-মানসে প্রথম থেকেই ঘটেনি, এরও একটা ইতিহাস আছে।

কবির প্রতিভা বিকাশের প্রথম স্তরে মানসী-সোনারতরী-চিত্রার যুগে মৃত্যু-সম্পর্কে কবির কল্পনাময় উচ্ছ্বাস-মিশ্রিত রোম্যান্টিক মনোভাব দেখা যায়। এ হ'ল আধুনিক গীতিকবিদের প্রিয় মনোভাব,—সৌন্দর্যবিহ্বলতায় মরবার আগ্রহ প্রকাশ করা, অথবা তীব্র আত্মসচেতনতার মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছা, যেমন—

দীঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

অথবা—

শোয়াও যতনে
মরণস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে।

অথবা—

মরণ-দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা।

এই সময়কার 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় (চিত্রা দ্রঃ) মৃত্যু সম্বন্ধে কবির স্বকীয় কোনো উপলব্ধি নেই। কবি সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য কবিদের অনুসরণে মৃত্যুর পর অন্যত্র জীবনের পূর্ণতা আছে কিনা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন—

হেথায় যে অসম্পূর্ণ, সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি॥

অথবা মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে এরকম ধারণা পোষণ করছেন—

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া;

এই যুগের 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি বিশ্বাত্মবোধমূলক কবিতায় যদিও কবি জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে নানারূপে পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন ব'লে উল্লেখ করেছেন, তথাপি ঠিক মৃত্যু সম্পর্কে কোনো ধারণায় উপনীত হন নি বা হবার প্রয়াসও করেন নি। কারণ ঐ কবিতায় কবি নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্ন করছেন মাত্র, এর উত্তর সম্পর্কে দৃঢ় ধারণায় এখনো আসেন নি—

আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে

কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসার খেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ?.........
.....................ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগ-যুগান্তের মহা-মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?

এর সঙ্গে পরিণত উপলব্ধির বলাকা ও ফাল্গুনীর মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা অবশ্য তুলনা ক'রে দেখবার যোগ্য। দুই-ই কাব্য, কিন্তু কী পার্থক্য !

চিত্রা পর্যায়ের জীবনদেবতা-শ্রেণীর দুটি প্রধান কবিতার মধ্যে জন্ম জন্মান্তর বা মৃত্যু সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয় নি। একমাত্র 'সিন্ধু-পারে' কবিতায় অপ্রাকৃত শিহরণের মধ্যে রহস্যময় পরলোকের একটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাত্র। এই কবিতাটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অলৌকিক স্বপ্নাবেশের উপর কল্পিত ব'লেই মনে হয়। মহর্ষির আত্মজীবনীতে ঐরূপ একটি ঘটনা বিবৃত আছে।

এই পর্যায়ের কল্পনামূলক ধারণার পর একেবারে নৈবেদ্যে এসে মৃত্যু-সম্পর্কিত প্রায় নিশ্চিত ধারণার পরিচয় লাভ করা গেল। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি যে নৈবেদ্য রচনার কালে কবি ভারতীয় ভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যু জীবনের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাওয়ায় মধ্যেকার একটা বিরাম, এই রকম পরিণত ধারণা নৈবেদ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই ধারণা কী পরিমাণে উপনিষদের থেকে গৃহীত, বা কী পরিমাণে অন্তর থেকে উৎসারিত তা বিচারের দ্বারা

নির্ধারণ করার উপায় নেই। কিন্তু এমন অনুমান অসংগত হবে না যে এই সময়কার অরূপানুভবের প্রতি আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কেও একটি স্থির ধারণার দিকে কবি আপনা থেকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ বিষয়ে লেখা নৈবেদ্যের নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠক-সাধারণের সুপরিচিত :

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়॥
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥

নৈবেদ্যের পর মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কবিতা উৎসর্গের 'মরণ' (অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ)। কবির যে স্বকীয় অরূপানুভূতি বিশ্বের সৌন্দর্যরূপ এবং দুঃখরূপের মিলিত বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত, উৎসর্গে তার প্রারম্ভ একথা আমরা আগেই বলেছি। ঐ দুঃখরূপেরই একটি বিশিষ্ট অনুভূতি এই 'মরণ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুই মানবীয় দুঃখের চরম রূপ। সেই দিক থেকেই এই কবিতাটিতে মৃত্যুকে ভয়ানক রূপে বরণ করার আগ্রহ পরিস্ফুট। মৃত্যুর নীরব শান্ত মূর্তিতে কবির কোনো আকর্ষণ নেই, ভয়ংকরতাতেই তাঁর পরিতৃপ্তি—

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ শয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরূক নয়নে—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

* * *

যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎ-ফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি নীরবে করিব তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

প্রথম জীবনের মৃত্যু সম্পর্কিত নিছক কল্পনাবিলাসের সঙ্গে এখানকার বরণ করার আগ্রহের দিকটি একটু পৃথক, তথাপি উৎসর্গেও কবি আবেগময় উৎসাহের বশীভূত, মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর প্রজ্ঞাময় উপলব্ধি এখনো

আসেনি একথা বলা যেতে পারে। যাই হোক, অতঃপর জীবন থেকে জীবনান্তরে যাওয়ার কথা মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে লাগল। একমাত্র গীতাঞ্জলিতে অরূপদর্শনের ফলে মৃত্যুকে কবি অনন্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, এবং এই মৃত্যু যে তাঁর কাছে কত বরণীয় তা কারণ সহ স্পষ্টাক্ষরে জানালেন—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
ওগো মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

মৃত্যু এবং জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। মৃত্যুতেই যেহেতু এক জীবনের পূর্ণতা, সেইহেতু মৃত্যু বরণীয়, ভয়ানক নয়। গীতাঞ্জলিতে এই স্থির উপলব্ধির ফলে অতঃপর কবি নিজকে বার বার যাত্রী বা পথিকরূপে অভিহিত করতে লাগলেন। আবার মৃত্যুর পথ দিয়েই যে অরূপের আবির্ভাব তাও প্রবলতার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন—

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আসছে জীবনমাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে। (গীতালি)

এবং দুঃখকে গ্রহণ ক'রেই দুঃখমুক্তি ঘটবে, মৃত্যুকে বরণ ক'রে মৃত্যুভয় ঘুচবে, কবি এই অমৃতবাণী অতঃপর বিতরণ করতে লাগলেন—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে। (ঐ)

কবির এই মৃত্যু সম্পর্কে ধারণার প্রসঙ্গে আর একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় চোখে পড়ে। তা হ'ল এই। কবির কাব্য যে অরূপ-উপলব্ধিতেই পরিসমাপ্ত হয়নি তার কারণ কবি জীবন ও

বিশ্বকে কখনো অরূপানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেন নি। তাঁর অরূপানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের দুঃখরূপের উপর, মৃত্যু যার চরমাবস্থা। এই জন্মে গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্যের পর অরূপপ্রসঙ্গ ধীরে ধীরে কমে গিয়ে জীবনের যাত্রার কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছে। গীতালিতে একাধারে দুঃখবোধ, মৃত্যু ও যাত্রার কথা প্রবলতা সহকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় পরবর্তী বলাকা-ফাল্গুনী-পুরবীর বলিষ্ঠ জীবনবাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী অরূপ-উপলব্ধির যোগ স্থাপন করেছে কবির এই দুঃখ ও মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা। তাই বলাকায় যেখানে কবি বিশ্বের ও মানবের গতির কথা বললেন সেখানে 'মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন'কে শুচি ক'রে তোলার কথা বললেন এবং 'যুগে যুগে এসেছি চলিয়া স্খলিয়া স্খলিয়া' ইত্যাদিরূপ জন্মমৃত্যুর ক্রমপর্যায় সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করলেন।

'ফাল্গুনী' নাটক যথার্থভাবে মৃত্যু ও জীবনের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রে জীবন প্রকাশ পাচ্ছে, ধ্বংসকে অতিক্রম ক'রে সৃষ্টি, বার্ধক্যকে পরাভূত ক'রে যৌবন, এই ভাবটিই ফাল্গুনীর মূলকথা। 'ফাল্গুনী'তে বালকদলের প্রশ্নের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে লৌকিক ভয়ের ভাবটি কবি বিবৃত করেছেন। বালকেরা 'চন্দ্রহাস'কে প্রশ্ন করছে—

> কাকে তুমি ধরেচো তাও কি বুঝতে পারলেনা ?
> জগতের সেই বুড়োটাকে ?
> যে বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায় ?
> সেই যে ভয়ংকর ? যে অন্ধকারের মতো ? যার বুকে দুটো চোখ ?
> যার পা উল্টো দিকে ? যে পিছনে হেঁটে চলে ?
> নরমুণ্ড যার গলায় ? শ্মশানে যার বাস ?

মৃত্যুর ধারণার সঙ্গে কবির জন্মান্তরের ধারণাও বহুস্থানে প্রকাশলাভ করেছে। প্রথম কাব্যজীবনের রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার মধ্যেকার জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের স্পর্শ ('সোনার তরী' 'মানসী' আলোচনা দ্রঃ), অথবা 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' ইত্যাদির কল্পনাবিহ্বল পৃথিবী-প্রীতির সঙ্গে বিজড়িত রূপ-রূপান্তর এবং 'ক্ষণিকা'র 'পরজন্ম সত্য হলে কী ঘটে মোর সেটা জানি' ইত্যাদির হাস্যরসালাপে জন্মান্তর সম্পর্কে কবির ধারণা অপরিণত ও অপরিস্ফুট এমন মনে করা গেলেও গীতাঞ্জলি, গীতালি প্রভৃতির উপলব্ধি যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সময় থেকে বলাকা-ফাল্গুনী-পুরবীর প্রতিভার পরিণামের কাল পর্যন্ত জন্মান্তর ও অনন্ত জীবন সম্পর্কে কবি স্বকীয় উপলব্ধি স্ফুটতর ক'রেই চলেছেন এবং শেষের দিকে জীবন-সায়াহ্নের রচনাগুলিতেও আত্মবিবৃতি-প্রসঙ্গে এজন্ম থেকে জন্মান্তরে যাত্রার ঐ উপলব্ধ তত্ত্বটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে 'গীতালি'র 'এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা', অথবা ফাল্গুনীর 'তুমি আমার চিরকালের। ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন', অথবা, পুরবীর 'জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন ক'রে তোলা ; ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা' প্রভৃতি উক্তি প্রামাণিক ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে কবি জীবনের অতীত অর্থাৎ নামরূপের অতীত কোনো পরিণামকে দেখেন নি। তাঁর ধারণায় অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত জীবন, এবং জীবনেই মুক্তির স্বাদ। সুতরাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন, বলাকার 'মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত-সীমা, তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা' প্রভৃতি স্থলে পরিণামের কথা কবি বললেও এ পরিণামকে নির্বাণাবস্থা ব'লে নিশ্চয়ই কল্পনা করেন নি। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'

ইত্যাদির মধ্যে জন্মান্তরগামী অনন্ত জীবনই কল্পনা করেছেন। তা ছাড়া এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে বসুন্ধরা কবিতায়, ছিন্নপত্রে, কি পরবর্তী 'প্রবাসী' কবিতার—'হই যদি মাটি, হই যদি জল, হই যদি তৃণ, যদি ফুল ফল, জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল' প্রভৃতির মধ্যে বিশ্বে বিভিন্নরূপে নিজকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা জানালেও এমনতর পৌরাণিক মনোভাবের সূচক কথা কবি বলেন নি যে মানুষ কর্মফল অনুযায়ী যে-কোনো জীবদেহ পরিগ্রহ করতে পারে।

বলাকা-পূরবী-ফাল্গুনী-মহুয়া নবজীবনবাদের বাণীতে মুখর, এবং সেখানে জীবনের পশ্চাতে এই তত্ত্বটিই রয়েছে যে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনকে পেতে হবে। অতঃপর বলাকা থেকে কবির জীবন-দর্শনের নূতন অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করছি।

প্রতিভার পরিণাম

জীবন ও অরূপের সমন্বয়

গীতালি-বলাকা-ফাল্গুনী-পূরবী-মুক্তধারা-রক্তকরবী-মহুয়া

বলাকার কয়েকটি কবিতা পদ্মাতীরে লেখা। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতির কতকগুলি বিশিষ্ট কবিতার প্রেরণা ও রচনার পশ্চাতে স্থান হিসাবে পদ্মা ও পদ্মাতীর বিদ্যমান। কিন্তু স্থান এবং দৃশ্যতঃ ব্যক্তি এক হ'লেও কালের প্রভাবে পরিবর্তন কী গভীর তা সাধারণ পাঠকেরও অগোচর থাকে না। এই পরিবর্তন কবিব্যক্তিত্বের মধ্যে ক্রমশঃ ঘটেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভা অতি চঞ্চল এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। অথচ তা পরিণামীও বটে। আলোচ্য পর্যায়েই এই পরিণাম ঘটেছে এবং তারপর অপরাহ্ণে কবির লেখনী নির্বাক হয়নি সত্য, কিন্তু আন্তর ধর্মের দিক থেকে নূতন পথে অগ্রগতি হয়নি। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ঘটেছে, ভঙ্গির মধ্যে নূতনত্ব এসেছে, এমনকি কোথাও কোথাও কল্পনা ও সহানুভূতি ঘনীভূত ও তীব্র হয়েছে, কিন্তু কবি-আত্মার নূতন বৈচিত্র্য ঘটেনি। পুরাতন ধর্মেরই বিভিন্ন আকারে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। জীবন ও জীবনাতীতের মিলন-সাধনাই কবি রবীন্দ্রের শেষ সাধনা এবং স্ফুরণোন্মুখী মানসী-চিত্রাযুগের কবি-প্রতিভার উচ্চতম অভিলাষ। যে সূক্ষ্ম ঐক্যের সূত্রে তার উন্মেষ থেকে বিকাশ ঘটেছে তা আমরা বিস্ময়-সহকারে লক্ষ্য করেছি। অতঃপর পূর্ণতম বিকাশের প্রকার আমাদের দর্শনের বস্তু হবে।

এক দিক থেকে দেখলে সকল কবিই জীবন ও অরূপের সমন্বয় সাধনাই ক'রে থাকেন। কারণ, কাব্যে লোক-সাধারণ মানবীয়

ভাবসমূহের ভিত্তিতে অতিলৌকিক আনন্দরস পরিবেশিত হয়। কাব্য-পাঠের ফল যে আনন্দ-বিহ্বলতা তা ব্যবহারিক জীবনের যে কোনো আনন্দ থেকে যেমন পৃথক তেমনি জীবনের সঙ্গে যুক্তও বটে। কিন্তু (সাধারণ কবি থেকে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এই যে তাঁর কাব্য-রস-চেতনা বিশিষ্ট ঈশ্বর-চেতনায় অনিবার্যভাবে মিশে গেছে। কবির কল্পনা এমন অপূর্ব, এমনি বিস্ময়কর ভাবে নূতন ও সুদূরপ্রসারী যে অরূপ-ভাবুকতায় সমাহিত হওয়ার জন্মেই যেন তা সৃষ্ট হয়েছিল। আবার রবীন্দ্রের ঈশ্বর যেহেতু প্রকৃতি ও মানুষ থেকে, মোটামুটি বিশ্ব থেকে অপৃথক, যাবতীয় মানবীয় ভাবের মধ্যেই আস্বাদ্য, সেইহেতু জীবনের মধ্যে ঐ অরূপের স্পন্দনের প্রকার অন্বেষণেই তাঁর প্রতিভা স্বাভাবিক ভাবে নিয়োজিত হয়েছে। তা ছাড়া এহেন সমন্বয়ের মধ্যে একটি যুগ-প্রয়োজনও অনিবার্যভাবে কাজ করেছে—সে যুগ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙালি জীবনের তৎকালীন ঐহিকতার গ্লানির দ্বারা কলঙ্কিত, অথচ বহুকালাগত অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে যুগে প্রয়োজন-বশে আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভার উত্তুঙ্গ স্বকীয়তার মধ্যে এই যুগোচিত বাঙালির তথা ভারতবাসীর চিত্তধর্মের অভিব্যক্তিও লক্ষ্য করতে হবে। (অরূপ-সমাহিত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার যে বিশিষ্টতা, বলাকা প্রভৃতি কাব্যের মূলে তা বর্তমান।) কিন্তু বলাকার সমসাময়িক গীতালির গানগুলিতে জীবনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার একটি সম্পূর্ণরূপ পূর্বেই পাওয়া যাচ্ছে। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের দুএকটি গানে অবশ্য দুঃখমৃত্যুময় বিঘ্নসংকুল জীবনের দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে এবং যাত্রার ইঙ্গিতও রয়েছে। কিন্তু সমগ্র গীতালি এই যাত্রাময় জীবনোৎসবে

মুখর। গীতালি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা গেলেও বলাকার আলোচনায় পুনরায় গীতালির উল্লেখ অপরিহার্য। গীতালি ও বলাকাকে একত্র ক'রে দেখাই যথার্থ দেখা।

পূর্বে আলোচনায় বলেছি, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যে কবি অরূপ-স্পর্শ লাভ ক'রে সেই আনন্দের বহুবিচিত্র রসাস্বাদেই প্রায়শঃ নিমগ্ন আছেন। এই সময়কার বিশিষ্ট মানসিক প্রশান্তির অভিব্যক্তিগুলি ও বিস্ময়ভক্তিতে আপ্লুত সুর নিম্নলিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যাবে—

পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ ক'রে দিন তাই—

অথবা— কোলাহল তো বারণ হ'ল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে।

অথবা— এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।

অথবা— আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র-ছায়া
বর্ষা আসে বসন্ত।

অথচ গীতালিতে এই শ্রেণীর গান নেই বললেই চলে, সেখানে স্পষ্টভাবে জীবনের দুঃখের ও আঘাতের কথা প্রকাশ পেয়েছে, ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর ব'লে অভিহিত করা হয়েছে, দুর্যোগ এবং ঝড়ের রাত্রিকে প্রধানভাবে কবিকল্পনায় অঙ্গীকৃত করা হয়েছে। উপরের কয়েকটি

বিক্ষিপ্ত উদাহরণের সঙ্গে গীতালির নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তির তুলনা করলে একটা পার্থক্য অবশ্যই উপলব্ধ হবে—

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে ?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে ?

গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্যে এই সুরের রচনা কম। এবং যদিও কবির অরূপ-সাক্ষাৎকার প্রকৃতির দ্বিধা-বিভক্তরূপে, বিশেষভাবে সৃষ্টির ভয়ংকর রূপেই অনুপ্রাণিত, তা দিয়ে জীবনকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করা গীতালির পূর্বে হয়ে ওঠেনি। তাই গীতালিতে জীবনের গতির কথা এবং কবির নিজের যাত্রার আনন্দ বারংবার অনুরণিত হয়েছে।

বলাকার প্রথমের দিকের কয়েকটি কবিতা ১৩২১ সালের মধ্যে লেখা। এর মধ্যে চঞ্চলা (হে বিরাট নদী), দান (হে প্রিয় আজি এ প্রাতে), শাজাহান, ছবি, শঙ্খ, পাড়ি (মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে), সর্বনেশে প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি রয়েছে। গীতালির গানগুলি লেখা হয় ১৩২১ ভাদ্র থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কালগত একটা সাধারণ সাদৃশ্যের সম্ভাব্যতা ছাড়িয়ে গীতালির সঙ্গে বলাকার গতি-অনুভূতির অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য রয়েছে। দেখা যায় বলাকার গতি-অনুভূতি বিষয়ক দু তিনটি বিখ্যাত কবিতা মাত্র ১৩২২ এর রচনা, যেমন, বলাকা (সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি), ঝড়ের খেয়া (দূর হ'তে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,), নববর্ষের আশীর্বাদ (পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি)। অপর পক্ষে অধিকাংশ বিখ্যাত রচনাই ১৩২১

এর। যাই হোক, সম্ভাব্য সাদৃশ্য ছেড়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে গভীরতর সাদৃশ্য ও তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা যাক।

আমরা পূর্বে বলেছি গীতালিতেই কবি দৃষ্টিকে নিরাশ্রয় অরূপ-ভাবলোক থেকে নামিয়ে এনে মানবজীবনে নিক্ষেপ করেছেন। এই নব জীবনবাদের প্রকাশ দুই ভাবে হয়েছে। এক, সর্বনাশ ও মৃত্যুকে বরণ করার উৎসাহে, দুই, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রার প্রেরণায়। এই ভাবমুহূর্তগুলিই রবীন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত, তাঁর কাব্য-সাধনার পরিপাকাবস্থা। সর্বনাশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার অভিনব প্রেরণা তাঁর বিশিষ্ট অরূপানুভূতির সঙ্গে কোন্ সূত্রে জড়িত তা রাজা, অচলায়তন, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির আলোচনাকালে নির্দেশ করেছি। ঐ দুই মনোভাব গীতালিতে এবং সমসাময়িক বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে কিভাবে রয়েছে উদাহরণ সহকারে তা দেখানোর চেষ্টা করছি। গীতালির—

সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে (১৯ সং)

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই ক'রে নেবে জিতে পরানটি তোমার।
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ আসছে জীবন-মাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে। (২০ সং)

ঝড়কে আমি করব মিতে,
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে ;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি তুফান পেলে বাঁচি। (২৪ সং)

ঝড় এসেছে ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি।
আকাশ কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি। (৩৩ সং)

ছাড়িয়ে গৃহ ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে ক'রে নিল আমায় জন্ম-মরণ-পারে— (৬২ সং)

পুষ্প দিয়ে মার যারে চিন্‌ল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে। (৭৩ সং)
—ইত্যাদি

উল্লিখিত কবিতাগুলিতে যা বলা হয়েছে বলাকার নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত-গুলিতে ঠিক তাই বলা হয়েছে। তফাৎ এই যে প্রথমটিতে গানের সুরে, দ্বিতীয়টিতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে, কবিতায়—

(১) এবার ঐ যে এল সর্বনেশে গো

* * *

চাহিস নে আর আগুপিছু,
রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর মাথা নিচু
সিক্ত আকুল কেশে গো।

* * *

ঝড়ে যে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো।

(২) ছিঁড়ব বাধা রক্তপায়ে
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।

* * *

মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আনব হ'রে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে,
মরণ-সাধন সাধবে।

(৩) তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

(৪) ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল ;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ।' —ইত্যাদি

কবির গতি-অভিমুখী যে-মন যাত্রা, যাত্রী, তরী, কাণ্ডারী, নেয়ে, পথ, পান্থ, পথের সাথী প্রভৃতির কল্পনায় 'গীতালি' পূর্ণ ক'রে তুলেছে, সেই মনই বলাকার আত্মগত যাত্রার কবিতাগুলিতে সদৃশ কল্পনা আশ্রয় করেছে। তরীতে যাত্রাই হোক বা পদক্ষেপই হোক, মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। গীতালির এই চলা-সম্পর্কিত

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি। এইরূপ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে (বলাকার গতিবাদ নূতন হ'লেও আকস্মিক নয়, তা কবির অরূপানুপ্রাণিত জীবনবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত :)

পথে দিয়ে যে যায় গো চ'লে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়। (২১ সং)

মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাত্রি বেলা (২৪ সং)
নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী ?

* * *

দেখিস নে কি কাণ্ডারী তোর হাসে যে হাল ধরি। (৩০ সং)

যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশী হয়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ যে তোর খেতেই হবে। (৪৭ সং)

শ্রান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু (৫৯ সং)

কাণ্ডারী গো, এবার যদি পৌঁছে থাকি কূলে
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমায় হাত ধরে লও তুলে। (৬৬ সং)

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।

* * *

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।

যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরি বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালো বাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। (৮৩ সং)

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে
পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া (৯৫ সং)

পথের সাথি, নমি বারংবার,
* * *
জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার। (৯৮ সং)

উদয়াচলের সে তীর্থ-পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী
* * *
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
একূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।
(১০৭ সং)

যাত্রার বাণী গীতাঞ্জলি প্রভৃতি পূর্বেকার রচনাতে শ্রুতিগোচর হ'লেও তা এমন সর্বতোব্যাপী, এমন প্রবল নয়, একথা পাঠক মাত্রেই অনুভব করবেন। আর বহু পূর্বেকার কাব্যজীবনে কর্মমুখর অগ্রগতি বা

অভিসারের ধ্বনি যদি বা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুরণিত হয়েছে (যেমন, 'এবার ফিরাও মোরে'), তার প্রকৃতি বহুল পরিমাণে কাল্পনিক উচ্ছ্বাসময়, বর্তমানের মত সুদৃঢ় ধ্যানদৃষ্টির মধ্যে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠার দাবী সেগুলির আছে কিনা সন্দেহ। অরূপানুভূতি লাভের পর জীবন-সম্পর্কে একটা নিশ্চিত ধারণায় কবি এসেছেন ব'লেই এই যুগের কয়েকটি কবিতাও আদর্শবাদী মনের প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশুদ্ধ কবিতা থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে Ethicsএর মধ্যে প্রবেশ করতে কবি দ্বিধা করেন নি তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি।

গীতালির সমসাময়িক যে দুটি বলাকার কবিতায় তরীতে যাত্রার পুর্ণসংকেত বর্তমান তা হ'ল 'পাড়ি' এবং 'অজানা'। প্রথমটিতে কবির অরূপই জীবন-সংস্পর্শে এসে নাবিকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার আগমনকালের প্রাকৃতিক পটভূমিও পাঠকের বহুপরিচিত দুর্যোগময় পটভূমি—

মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।

* * *

হেন কালে এ দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূলছাড়া মোর নেয়ে।

ইনি আমাদের পূর্বপরিচিত গীতাঞ্জলির অনির্বচনীয় অনুভূতিরূপে প্রত্যক্ষীভূত অরূপ, যাঁর আগমনের নিঃশব্দ পদসঞ্চার কবি বিস্ময়বিমূঢ় হৃদয়ে শুনেছিলেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।

ইনি খেয়ার 'আগমন' কবিতার রাজাও বটেন। সর্বত্র এঁর আগমনের প্রকার একই। গীতালির যুগ থেকে ইনি জীবনময় হয়ে প্রকটিত হয়েছেন মাত্র এবং কবির জন্মান্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ইনি কবির কাছে রত্নের ভার নিয়ে উপস্থিত হবেন, কিন্তু কোনো পার্থিব প্রকৃত রত্ন নয়, দৃশ্য-গন্ধ-গানের অপরিসীম সৌন্দর্যরূপ রত্ন—

নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।

কিন্তু রজনীগন্ধা হাতে ক'রে যাত্রার কারুণ্য ও সৌন্দর্য দ্যোতনা যিনি করছেন তাঁর আকার-প্রকার ও পারিপার্শ্বিকে কী অপরিসীম বেদনা, শূন্যতা ও ভয়ংকরতার চিত্র!

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

বাস্তব জীবনের দুঃখময় চলার দিকের অপূর্ব সাংকেতিক চিত্র কবি উপরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। গীতাঞ্জলি-ডাকঘর প্রভৃতিতে যদি অরূপ মুখ্য—জীবন গৌণ, গীতালি ও বলাকায় জীবন মুখ্য—অরূপ গৌণ। অরূপ এখানে জীবন-রূপ পরিগ্রহ করেছেন, অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছেন দুঃখময় জীবনে বাণীময়।

'অজানা' কবিতাটিতে কবি বৈরাগী মন নিয়ে বাউলের ভঙ্গিতে স্বীয় যাত্রার ভাব প্রকটিত করেছেন। এখানে কবির জন্মান্তর সম্পর্কে অনুসন্ধানী মনোভাবও তিরোহিত। তিনি যে যাত্রী এবং 'অজানা'র পথের যাত্রী এই তাঁর আনন্দ। এ হ'ল বলাকার বিশিষ্ট 'পথের আনন্দবেগ', কিন্তু অজানাকে লক্ষ্য ক'রে। পথ অজানা হ'লেও আনন্দ-উপলব্ধি তো সত্য। 'অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি।' সুতরাং অজানা আর কেউ নন, কবির বিশিষ্ট অরূপরসানুভূতির নিমিত্তভূত সত্য ; গীতাঞ্জলির—'ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে' অথবা গীতালির অচেনা—

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভ'রে।

কবির অরূপ নিসর্গ-উপলব্ধির আনন্দ থেকে পথের আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছেন। পরবর্তীকালে লেখা 'সুন্দর' এর 'কবে তুমি আসবে ব'লে রইবো না বসে' প্রভৃতি বিখ্যাত গানটিতেও অরূপানুভূতির সূত্রেই পথের আনন্দ কবির অভিপ্রেত হয়েছে—

তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই,
তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই ;

পরবর্তীকালে যাত্রাপথের মধ্যে এই আনন্দ-উপলব্ধির কথা বিদায়ী কবির মনে বারংবার উদয় হয়েছে, যার সূত্র বলাকায়। ফলে 'মেঘদূত'এর পূর্বমেঘের যাত্রাটি বিরহীর পথের আনন্দ ব'লে কবি অভিহিত করেছেন—

সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী

('বিচ্ছেদ'—পুনশ্চ)

নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর। ('যক্ষ'—সানাই)

'বলাকা'র এই অংশের সুবিখ্যাত 'শাজাহান' কবিতাটিও এই যাত্রার কল্পনাতেই রচিত। (বৃহত্তর জীবনের প্রতি আগ্রহে কবি এখানে ইহজীবনের প্রতি (যেহেতু স্বার্থময় ভোগপূর্ণ জীবন পদে পদে বদ্ধ হয়ে পড়ে) অনুরাগও ত্যাগ করেছেন। যাত্রার প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগ যেখানে, সেখানে 'অভ্যাসের সীমা-টানা' পঙ্গু মর্ত-জীবনের প্রতি বৈরাগ্যই স্বাভাবিক।) যাই-হোক, মর্ত-জীবনের প্রতি আত্যন্তিক বিরাগ যদি কোনো কালে কবি-অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তাহ'লে তা ক্ষণিকের জন্যে এই যুগেই হয়েছে। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। (জীবনের দুঃখ ও মৃত্যুকে গ্রহণ ক'রে গঠিত সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির মূলে জাগরিত যে মর্ত-অনুরাগ তা-ই কবির কাম্য।) সুতরাং বর্তমানের ক্ষণিক মর্ত-বৈরাগ্যের দ্বারা কবি স্থির দৃঢ় জীবন-অনুরাগকে লাভ করলেন, যা প্রথম কাব্যজীবনের কল্পনামূলক মর্ত-প্রীতি থেকে বিভিন্ন। স্থূল প্রয়োজনের জীবনের প্রতি কবির অনাসক্তি চিরন্তন। আবার অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবি বিষয়সুখের বিশেষভাবে বিরোধী হ'য়ে উঠেছেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আশ্রয় মাত্র ক'রে ইন্দ্রিয়গত বিচিত্র তরল সুখানুভূতিতে লিপ্ত না হয়ে ইন্দ্রিয়াতীত ঐক্যমূলক রসাস্বাদই কবির অভিপ্রেত; এবং এরই মাধ্যমে কবির অরূপ-সাক্ষাৎকার। এই (অরূপ-উপলব্ধির পথে মৃত্যু ও জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কবি স্বীয় পদক্ষেপের শব্দ যেমনি শুনতে পেলেন অমনি ভোগবাসনাময় বদ্ধ জীবনের মূল্যও তাঁর কাছে ক্ষীণ হয়ে এল। যাত্রার অনুভূতি যেখানে তীব্র নয় এমন কবিতাগুলিতে (বলাকা-কাব্যের মধ্যেই) অবশ্য পার্থিব অনুরাগের ছবি ফুটে উঠেছে। কয়েকটি কবিতায় কবি সেজন্য এই দ্বৈতের সামঞ্জস্য-সাধনও করতে চেয়েছেন।) বলা বাহুল্য, সে সব ক্ষেত্রে কবি পরিণাম-

সত্তা অরূপের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। উপরিলিখিত কারণে 'শাজাহানে'র—

যে-প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে-প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে···

ইত্যাদি অংশে ভোগসুখযুক্ত, দানের ও গ্রহণের অযোগ্য প্রেম স্বাভাবিক ভাবেই তিরস্কৃত হয়েছে। 'উপহার' কবিতাতেও কবি এরকম দানকে নিন্দা করেছেন যা মুক্তির স্বাদ দেয় না, জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যা অগ্রসর হতে পারে না, যা পথিককে বদ্ধ করে মাত্র। পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার বাইরের স্বতঃ-আগত, চলার প্রেরণাযুক্ত যে দান তাকেই কবি ঐ কবিতায় সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন। এ দান ক্ষণিকের, এর প্রেরণা পথিক-চিত্তকে ক্ষণিকের জন্যে তার অজ্ঞাতে অনন্তের অভিমুখী করে, এ হ'ল বিশুদ্ধ নির্বিষয় আনন্দ-স্বরূপ।

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে—
চ'লে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী॥

স্পষ্টতই কবি এখানে পার্থিব বাসনাময় সুখকে অতিক্রম ক'রে আনন্দের বিশুদ্ধতাকে একান্ত কাম্য ও জীবনের গতির সঙ্গে যুক্ত ব'লে মনে করেছেন।

'শাজাহানে' জীবনের গতির সঙ্গে যুক্ত ঐহিক-বাসনা-পরিত্যাগ-করার চিত্রই ফুটে উঠেছে। একটু তাত্ত্বিক ভাষা প্রয়োগ করলে বলা যায়, শাজাহানের যে বদ্ধ ব্যক্ত রূপ তা এ জীবনে প্রেম-সম্ভোগে রত ছিল। কিন্তু যেহেতু আসল শাজাহান অব্যক্ত-স্বভাব, সেইহেতু নামরূপের বন্ধন ত্যাগ ক'রে সেই অব্যক্তেই সে বিলীন হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, জীবনান্তর বা অবস্থান্তরবাদের অর্থাৎ যাত্রার অনুভূতির প্রতি কবির তীব্র আসক্তিই কবিকে অনাসক্তির ধারণায় প্রবর্তিত করেছে। আর এই উপলব্ধির তীব্রতাকে প্রকট ক'রে তোলবার জন্যেই ঐ কবিতাটির ভূমিকাংশে শাজাহানের জীবনানুরাগের চিত্রটিকে অত দীর্ঘ ও সুন্দর ক'রে নির্মাণ করতে হয়েছে।

গীতালিতে যাত্রার কল্পনায় যার ভূমিকা, বলাকায় সেই বস্তু-বৈরাগ্য বা বস্তুগতজীবন-বৈরাগ্যই কবির স্বকীয় জীবন থেকে বিশ্বগত গতিবাদে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে গীতালির আলোচনায় আমরা বলেছি যে 'যাত্রা' বা 'চলা'ই গতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কবির পক্ষে যাত্রা, বিশ্বের পক্ষে গতি। 'বিশ্বের কোনো কিছুই স্থির নেই, বস্তুও নয়, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তো নয়ই; বস্তু মানুষের ভাবকে প্রেরণা দিচ্ছে, আবার ভাব রূপের মধ্যে ধরা দেওয়ার জন্যে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে'—কবির এই মনোভাবটি বলাকা থেকে অবশ্য প্রাচীনতর, কিন্তু তাকেই 'রূপ' (১৬ সং) কবিতার মধ্যে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন—

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথী।

স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল।

কিন্তু দেখতে হবে, এখানে কবি বিশ্বের বস্তুনিচয়ের গতি-বিরুদ্ধতার কথা বলেন নি। (জড়বস্তু যে বাধা, তা যে পঙ্কিল, অশুচি, অবরুদ্ধতার কলুষে দূষিত এই ভাবটি কবির বিশ্বগতিতত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত এবং 'চঞ্চলা' কবিতায় তা প্রকাশ পেয়েছে।) রবীন্দ্রনাথ মর্ত-অনুরাগী হ'লেও যেমন স্থূল বাসনার পোষকতা করতে পারেন নি, তেমনি জড়বস্তুর মহিমা কীর্তনেও চিরকালই বিমুখ। বিষয়বাসনা ও বস্তুর মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। বস্তু স্থূল বাসনার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং বিশুদ্ধ আনন্দ-উপলব্ধির পথে বাধা। যে গতির অনুভূতি—'অকারণ অবারণ চলা' কবির পূর্বকাব্যজীবনের সুদূরের আকর্ষণের মতই বিশুদ্ধ আনন্দ-স্বরূপ তা বিষয়বাসনার পোষক নয়, সুতরাং জড়ত্বেও আবদ্ধ নয়। এই গতির আনন্দে পাথেয় সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, অবাধে পাথেয় ক্ষয় ক'রেই চলতে হয়। বিশ্বগত এই গতির আনন্দময়তার দিকটি 'চঞ্চলা' কবিতায় একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই বিশিষ্ট বিশ্বগতিরহস্যের কবিতাটি ফাল্গুনীর গানগুলির রচনার ঠিক আগে এবং গীতালির অব্যবহিত পরে লেখা। কবিতাটিতে কেবল কাল-রূপ একটি অতিচঞ্চল সত্তার প্রকার এবং কার্যই বর্ণিত হয়নি, কবির আত্ম-কথাতেই কবিতাটির সমাপ্তি ঘটেছে। বস্তু-জগতের ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা থেকে ঋতুপর্যায়ের আবর্তন ও জন্ম-মৃত্যুর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই শক্তির প্রবাহ অবিরাম চলছে।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।

চলাই হচ্ছে এর একমাত্র সত্যস্বরূপ, এ অনাসক্ত, শোকভয়াদি পার্থিব বিকারের অতীত, স্থতরাং স্থিতিশীল বাসনাদির বিরোধী—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওনা কিছু, করো না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

এই শক্তির বিরাম বা স্থিতিময় পূর্ণতা কল্পনার অতীত। কাল অনাদি এবং অনন্ত, সৃষ্টিও সেই জন্যে অহরহ ধ্বংসের মধ্য-দিয়ে অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং কাল গতিহীন হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব পরিবর্তন-হীন হয়ে পড়েছে এমন চিন্তা স্বপ্নেরও অগোচর—

যে-মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই।

সৃষ্টির প্রাণ-প্রবাহ যদি এই পরিবর্তন-সত্তার স্বরূপ হয় তাহ'লে জড় বস্তু? কবি বলছেন, প্রাণ-প্রবাহের বিরাম নেই, তার গতির পথে ক্ষণিক বাধাই জড় বস্তুর রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু এই বাধা যদি অকল্পনীয় বিরতিতে পরিণত হয় তাহ'লে সৃষ্টি নিশ্চল হ'য়ে পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারে পীড়িত হয়ে যাবে। নিশ্চল বস্তু যেমন অপবিত্র, তেমনি ভয়ংকর। রুদ্ধগতি বদ্ধ জীবন অসহনীয়।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;—

সুতরাং মৃত্যুও বরণীয়, বিশ্বের ধ্বংসের রূপও অভ্যর্থিত হওয়ার যোগ্য, কারণ, মৃত্যুর দ্বারা রূপান্তরিত জীবনই যথার্থ জীবন। 'মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ সেই তো তোমার প্রাণ'। এইজন্য কবি মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্রতার দিকটি পরিবর্তনরূপা সৃষ্টির শক্তির মধ্যে লক্ষ্য করলেন—

ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

অতঃপর (কবি আত্মজীবনে গতির শিহরণ অনুভব করলেন) এবং পরিশেষে স্বীয় গতাগতি-রহস্য সম্পর্কে যে-উপলব্ধির পরিচয় দিলেন তা বহুপুরাতন হ'লেও কাব্য-সাধনায় সিদ্ধ কবির উক্তি ব'লে নূতনতর ব্যঞ্জনা নিয়ে পাঠকের গোচর হ'ল—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

বহু জন্মের মধ্য দিয়ে আগত একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-প্রবাহের বোধ যেন অধুনা নিজের ও বিশ্বের যাত্রা-অনুভূতির স্পর্শে একটি উপলব্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে বিশ্বের অন্তর্নিহিত পরিবর্তন-প্রবাহ সম্পর্কে রচিত হ'লেও কবিতাটি আত্মবিবৃতি থেকে বঞ্চিত নয় এবং সেইখানে গীতালির যাত্রা ও পূর্বেকার অরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে।

নিঃসংশয় গতিতত্ত্বের আর একটি বহু পরিচিত কবিতা এবং সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা হ'ল 'বলাকা' ('সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি')। 'চঞ্চলা' থেকে একবৎসর পরে রচিত হ'লেও ভাবে ও কল্পনায় 'চঞ্চলা'র সঙ্গে এর বহু সাদৃশ্য লক্ষণীয়, অথচ কাব্যরসে কবিতাটি উৎকৃষ্টতর। (বলাকার বিমানগতি এবং তার পাখার শব্দ কবির অদ্ভুত কল্পনার জাগরণের সহায়ক হয়েছে। উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হয়ে কবির গতি-অনুভূতি এখানে একটি বিস্ময়কর সমগ্রতা লাভ করেছে এবং এ অনুভূতি যে কবির একান্ত স্বকীয়, এ যে গতির সঙ্গে একাত্ম কবিমানসের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশ) এসম্পর্কে পাঠকের কোন সংশয় থাকে না। এই জন্যেই এই (কবিতাটির বহিঃরূপেও অকৃত্রিম চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী ভাষা। এই পর্যায়ের কাব্যে কবির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও যে পরিণত কবি-প্রতিভার পরিচায়ক হয়েছে তা কয়েকটি কবিতার মধ্যে এইটি বিশেষ ভাবে প্রমাণ করে। এখানে—

> ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
> রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
> বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির প্রাকৃতিক ধ্বনিময়তার সঙ্গে—

এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে॥

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির (বিশ্বের গতি-চাঞ্চল্যের সুর এত অনায়াসে মিলিত হয়ে পড়েছে যে কী উপায়ে কবি একটি থেকে অপরটিতে উত্তীর্ণ হচ্ছেন তা বোঝার অবকাশ থাকে না। ছন্দে ভঙ্গিতে অলংকারে এবং আদ্যন্ত বিচ্ছুরিত তীব্র আবেগে কবিতাটি কবির আত্মলীনতার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হয়েছে এবং শুধু গীতিধর্মের দিক থেকে Shelleyর Ode to the West Wind এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কবিতাটির শেষে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে' এই চিরস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে কবির যে আত্মপরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তা যেমন সমসাময়িক কবিতা ও গানের সঙ্গে 'বলাকা'র সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে, তেমনি প্রবলতার সঙ্গে মানব-সাধারণের সুদূরের প্রতি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকেই রূপদান করেছে। কবিতাটির শেষাংশের আত্মবিবৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে কবি শুধু নৈর্ব্যক্তিক ভাবে গতিস্পন্দিত বিশ্বকে দর্শন করছেন না, সেই সঙ্গে তিনি আত্মদর্শনেচ্ছুও বটেন)—যে-কবিপ্রবৃত্তি গীতালির সর্বস্ব এবং ফাল্গুনী পুরবী প্রভৃতির একমাত্র প্রেরণার আশ্রয়। সুতরাং 'বলাকা'-র দর্শনে বের্গসঁ এর প্রভাব দেখলেই চলবে না, কবি যে স্বকীয় উপলব্ধিতে পরিচালিত তাও বুঝতে হবে।

'যাত্রা' নামে (১৮সং) আর একটি গতি-অনুভূতির কবিতায়

কবির আত্মবিচারণা ফুটে উঠেছে। এখানেও সংকীর্ণচেতা মানুষের বিশেষতঃ আমাদের প্রাত্যহিক সঞ্চয়ের গ্লানি, প্রয়োজন-বাসনার মোহ এবং আরাম-প্রয়াসী স্থিতিশীল জীবন নিন্দিত ও ত্যাগমূলক গতিশীল জীবন প্রশংসিত হয়েছে। একদিকে বার্ধক্য এবং অপরদিকে যৌবনের পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মের বর্ণনায় বিশিষ্ট এই কবিতাটি ফাল্গুনীর পূর্বাভাস সূচনা করে। গীতালি এবং বলাকার সঙ্গে সুরের দিক থেকে ফাল্গুনী নাটক অন্তরঙ্গ। মৃত্যু অসত্য, গতিময় জীবন ও যৌবনই সত্য, এই তত্ত্বটি ফাল্গুনীতে নাট্য ও সংগীতাকারে বিন্যস্ত হয়েছে। এখানেও অতি সংক্ষেপে সেই কথাই বলা হয়েছে—

ওগো আমি যাত্রী তাই—

*　　*　　*

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রবনা ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।

একদিকে ঐ বিপুলা গতির অনুভূতি, এই সংঘাতমুখর জীবনকে বরণ করার উৎসাহ ও মৃত্যুকে অস্বীকার এবং অন্যদিকে প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি কবির ঐকান্তিক অনুরাগ এই দুই আপাতবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে কবি দার্শনিকের মতই সামঞ্জস্য দেখতে পেলেন। সে সামঞ্জস্য অবশ্যই অনন্তে, দ্বৈতাতীত একক সত্তায়, যেখানে যাবতীয় সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, ভাব-অভাব ইত্যাদি লৌকিক মানসের দ্বন্দ্ব তিরোহিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, অরূপ-সমাহিত কবির নূতন জীবনবোধের উদ্রেকেই এবংবিধ সমাধান সম্ভব হয়েছে। যার ফলে পরিবর্তন এবং মৃত্যুর দ্বারা বিশিষ্ট যথার্থ জীবনের প্রতি কবি

অনুরাগী হয়েছেন। কারণ, বহু পুর্বেকার রোম্যান্‌টিক ভাববিলাসে প্রমত্ত কবি স্থিতিশীল নিসর্গ এবং নিসর্গ-অনুরাগকেই যে চরম মূল্য দিয়েছিলেন তা সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যগুলির বহু কবিতাতেই সুপ্রকাশিত। কিন্তু পার্থিব দুঃখ এবং সুখ এই উভয় অনুভূতির মাধ্যমে অরূপানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কবি যখন দুঃখ এবং মৃত্যুকে এবং সেই সূত্রে পরিবর্তন-সত্যকে যথার্থ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার অধিকারী হলেন তখনই পুর্ব-কথিত মর্ত-অনুরাগ এবং নব-উপলব্ধ পরিবর্তন-অনুরাগকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ পেলেন এবং তাঁর গতিশীল কবি-মানসের এই অংশে সুদৃঢ় প্রীতির নিঃসংশয় উপলব্ধিতে এসে পৌছালেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট জীবন-দার্শনিক মহাকবি। (মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জীবনধারা এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আগত চিরন্তন সৃষ্টির রূপই তাঁর কাছে সত্য। এই মিলন এবং সামঞ্জস্যের উপলব্ধিতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা সার্থক,) একদেশদর্শী কল্পনামূলক শিথিল-মূল মর্ত-অনুরাগের বাণীতে নয়। অতঃপর সাধন-লব্ধ স্থির প্রজ্ঞা-সহকারে বলাকার কয়েকটি কবিতায় কবি এই অভেদবোধের দিকটি পরিস্ফুট করেছেন।

'জীবন-মরণ' (১৯সং) এবং 'ঝড়ের খেয়া' (৩৭সং) এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে প্রধান। বলা বাহুল্য, এগুলিতে গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্যের যে সুর প্রকাশ পেয়েছে তা বলাকার গতিতত্ত্বের বিরোধী অনুভূতি নয়, পরিপুরক উপলব্ধি। লক্ষ্য করতে হবে বহুপুর্ব কাব্যজীবনে ছেড়ে-যাওয়াকে কবি সত্য ব'লে অনুভব করতে পারেন নি। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের আনন্দ, এ উপলব্ধিও কবির ছিল না তাই 'জীবন-মরণ' কবিতায় দৃঢ়তার সঙ্গে কবি এখন বললেন—

এমন একান্ত ক'রে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ক'রে ছেড়ে যাওয়া
সেও এই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।

সেই মিল অবশ্যই জন্ম এবং মৃত্যুর অন্তর্বর্তী একক সত্তার লীলার ধারণায়। মানব-জীবন কেবল নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি এবং প্রবঞ্চনা নয়, দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ ক'রে এবং তাকে অতিক্রম ক'রে এক পরিণামে মানুষকে পৌছাতেই হবে—ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই মৌলিক সত্য কথাই কবির মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

স্থূল বাসনাময় স্থিতিশীল পার্থিব জীবনের জড়ত্বকে অতিক্রম ক'রে জীবনের মধ্যবর্তী অথচ জীবনাতীত সেই লীলাময় একের অনুসন্ধানের প্রয়াস ও তজ্জনিত আবেগ 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটিতে নিঃসংশয় ঐকান্তিকতার সঙ্গে ও বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। এই কবিতাটির মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহকারে কবির বাস্তবজীবন অধ্যয়ন এবং ততোধিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে ঐ জীবনকে তৃণ-জ্ঞান ক'রে ত্যাগময় এবং ব্রহ্মানন্দময় মুক্তজীবনকে গ্রহণ করার অভিলাষ সূচিত হয়েছে। দীনতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা এবং সংশয় যা বস্তুপ্রিয় মানুষকে পঙ্গু ক'রে রাখতে চায় তার প্রতি উদ্ধত বিদ্রোহ এবং সর্বনাশের মুখে আত্মসমর্পণের দ্বিধাহীন সাহসের অভিব্যক্তি সবচেয়ে এই কবিতাটিরই আকর্ষণের বস্তু। স্থূল জীবনের

প্রতি নির্মম বৈরাগ্য বা বিষয়সুখ-বিমুখতা কবির বিশ্বোপলব্ধির প্রথম স্তর থেকে সূচিত এবং গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য প্রভৃতির মধ্যে পরিণামপ্রাপ্ত হ'লেও এ হেন তীব্র আবেগের সঙ্গে ইতিপূর্বে উৎসারিত হয়নি। বস্তুতঃ বাসনালিপ্ত বিষয়সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ একই আধারে অবস্থান করতে পারে না, তাই মুক্তিপ্রয়াসী কবি 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'যুক্ত মৃত্যুভয়ে ভীত দীন-চিত্ত মানুষকে আহ্বান ক'রে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন—

দূর হ'তে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,

এবং তাদের কাছে বিশ্বের মরণমুখী সত্যাগ্রহের দিক চিত্রিত ক'রে ধরলেন—

বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
'বন্দরের কাল হল শেষ'।

যাত্রার পরিণামের দিকটি কবি-দার্শনিকের গোচর হ'লেও মানুষের পক্ষে এই যাত্রা প্রকৃতপক্ষে ফলকামনাহীন, তা অক্লান্তভাবে কর্মের মধ্য দিয়ে, এবং এর সংগ্রামের রূপই সবচেয়ে প্রকট—

কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।

এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মত এখানেও কবির বাস্তবজীবন-বোধ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। বাস্তব জীবনে দৃষ্ট মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, ভীরুতা ও নিপীড়িতের মর্মবেদনার একটি পরিপূর্ণ রূপ কবি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে দিয়েছেন—

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নির্যাতনের অমানবীয়তার দিকটি কবির হৃদয়ে আঘাত করতেই তাঁর আমূল সংস্কারের প্রয়াসী বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের জাগরণ হ'ল এবং মুহূর্তের মধ্যে কবি জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও প্রলয়ের পার্থক্য ভুলে গিয়ে যেন বৈদান্তিক সত্যে আরূঢ় হয়ে মৃত্যুকেই আহ্বান করলেন—

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।

মানবপ্রেমিক বৈদান্তিক বিপ্লবীর মৃত্যুবরণের দিকটি পরবর্তী মুক্তধারা এবং কতক পরিমাণে রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

বলাকায় যদি জীবন-বৈরাগ্য থাকে, তা বিষয়সুখময় সংকীর্ণ জীবনের প্রতিই প্রযোজ্য, কাব্যোপলব্ধিময় বা সৌন্দর্য-সমাহিত বা

অরূপানুপ্রাণিত জীবনের প্রতি নয় একথা পূর্বে বহুবার বলেছি, এবং জন্মান্তরেই হোক, ইহজীবনেই হোক, রসোপলব্ধিগত জীবন্মুক্তিই কবির কাম্য এও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ঠাকুরদা-শ্রেণীর চরিত্রে পূর্বেই দেখা গেছে; একটু ভিন্ন-ভাবে পরবর্তী মুক্তধারা ও ঋতুনাট্যগুলির মধ্যেও দেখা যায়। আলোচ্য বিশিষ্ট কবিতাটির উপসংহারের দিকে কবি সমূহ দ্বন্দ্বের সমাধান রূপে এবং সংগ্রামপরায়ণ পীড়িত মানবের আশ্রয়রূপে একের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন—

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

কবিতাটির শেষে ভারতীয় বিশ্বাসের বাণীতে অনুপ্রাণিত কবি, দুঃখদৈন্য নিপীড়নের মধ্য দিয়ে আত্মদানেই যে নিশ্চিত অমৃতত্ব লাভ করা যায় এই মাভৈঃ বাণী প্রকাশ করলেন এবং যেন পাশ্চাত্যের এবং পাশ্চাত্য-প্রভাবিত বিষয়সুখের অনুরাগী ঐহিকতাগ্রস্ত আধুনিক বাঙালির শোচনীয় নাস্তিকতার উপরে তীব্র আঘাত দিয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়াস করলেন—

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশলজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত

অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্যে দুঃখ এবং মৃত্যুকেই কবি এখন একান্ত কাম্য ক'রে তুললেন—

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

দেখা গেল, বলাকার গতি-অনুভূতি এবং বৈরাগ্যধর্ম সগোত্র হ'লেও এই গতি অনিশ্চিত শূন্যে ধাবমান হওয়া নয়, এবং বৈরাগ্যও অভাবাত্মক নয়, সম্পূর্ণরূপেই ভাবাত্মক। গীতাঞ্জলি এবং গীতিমাল্যের ভগবদনুরাগের পর গীতালির দুঃখ, মৃত্যু ও যাত্রার অনুভূতির মধ্য দিয়ে বলাকায় পরিবর্তন-সত্যের সঙ্গে অরূপাদর্শের মূলে জীবনকে কিভাবে মিলিয়ে নিলেন তাও দেখলাম। বলাকায় কেবল-গতিতত্ত্বের অনুভূতি যে ক'টি কবিতায় প্রকাশিত তার সংখ্যা তিন চারটির বেশী নয়। এগুলিকে ভাবাত্মক বা পরিণামমুখী গতিতত্ত্বের ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিণামবাদ সম্পর্কিত কবিতাগুলিকে ঐরূপ কবিতার পরিপূরক রূপে দেখাই উচিত।

বলাকার অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায়ও নবজীবনবাদের সঙ্গে অরূপের অনুভব নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সর্বনেশে, শঙ্খ, বিচার, মুক্তি, দেওয়া-নেওয়া, রাজা, দেনাপাওনা (পাখিরে দিয়েছে গান), তুমি আমি, প্রেমের বিকাশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে 'সর্বনেশে' কবিতাটিতে পূর্বদৃষ্ট বিশিষ্ট অরূপ-উপলব্ধির মূলীভূত দুর্যোগময় প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র দেওয়া হয়েছে। গীতালির বহুশ্রুত যাত্রার আহ্বান এবং দুঃখসুখের অতীত হওয়ার কথা এই কবিতাটিতে পুনরায় শ্রুতিগোচর হ'ল।

এই কবিতাটি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে লেখা ব'লে কবি ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে অভিহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বন্ধু পিয়র্সন সাহেবের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কোন কবিকে এহেন oracle রূপে দেখার যে-চমৎকারিত্বই থাকুক, তা কবির প্রতিভা সম্পর্কে যথার্থ ধারণার পোষক নয়। তা ছাড়া কবিদের সামাজিক সত্তা অনস্বীকার্য হ'লেও তাঁরা কোনো ঘটনা-বিশেষের অগ্রবর্তী বা অনুবর্তী হবেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরূপ ধারণার বাধা আছে। অপিচ ঐ বিশিষ্ট কবিতাটির ভাব যদি যুদ্ধরূপ ঘটনার সূচক হয় তাহ'লে খেয়া-কাব্যের—

বজ্র ডাকে শূন্যতলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।

অথবা—

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্রহেন ভারি।

প্রভৃতি মধ্যে তা বহুপূর্বেই ধরা পড়েছে, এমন কি অচলায়তনের শৃঙ্খলিত মনুষ্যত্বের মুক্তির জন্য যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যেও এবং রাজা নাটকের রাজার আশ্চর্য ভয়ংকর রূপের মধ্যেও। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ স্বল্পমূল্যের 'নবী' নন। কবি হিসেবে পূর্ব পূর্ব কালের এবং তৎকালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক। সেই সূত্রে ভবিষ্যৎ জীবনের স্পন্দন তাঁর কাব্যে অনুভূত হ'লেও তা সামগ্রিক ভাবেই হয়েছে। কোনো ঘটনাবিশেষের ইঙ্গিত পূর্বাহ্ণেই যদি

কবির কাব্যে পাওয়া যায় তাহ'লে কবি-প্রতিভায় অতিপ্রাকৃত ধর্মের আরোপ করতে হয়। বস্তুতঃ গীতালি ও বলাকায় কবি প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'লেও স্বকীয় ভাবেই হয়েছেন, যুদ্ধকে স্বীয় আদর্শ ভাবলোকেই স্থান দিয়েছেন।

যাই হোক, অরূপ-উপলব্ধির পর থেকে রবীন্দ্রকাব্যে যে দিক্-পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায় তার জন্যে তাঁর অরূপানুভূতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তৎকালকে একত্র দায়ী করলে কোনো বিরোধ ঘটে না। কারণ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন কবি বর্তমানে যেমন একদিকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল জীবনে বিশ্বাসী তেমনি জীবনের যাবতীয় গ্লানির নিঃশেষ সংস্কারের পক্ষপাতী। অরূপের রুদ্রভয়ংকরত্ব যেমন তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয় তেমনি ঐহিকতাগ্রস্ত এদেশীয় সংকীর্ণ জীবনের অসারত্বও তাঁর প্রতিপাদ্য। এই জন্যে কবির ঈশ্বর তৎকালের ভারতীয় সমাজের পুঞ্জীভূত গ্লানি নিঃশেষে দূর করবার জন্যে বিপ্লব নিয়ে আসছেন এবং জগতের অন্যত্রও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বাহকরূপে আসছেন যুদ্ধের মধ্যে। কবি তাঁর কাব্যে যেমন স্বতন্ত্র-ভাবে এই ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করেছেন, যুগের পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও তেমনি তার সমর্থন লাভ করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা যেমন যুগবর্তী তেমনি বিশেষ ভাবে কালাতিক্রমী, প্রাচীন অতীত থেকে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এইজন্যে বলাকার সর্বনেশে, শঙ্খ, প্রভৃতি কবিতাগুলিকে কবির বিশিষ্ট প্রতিভার বর্ণে অনুরঞ্জিত অথচ যুগের প্রেরণার সঙ্গেও সমধর্মী ব'লেই আমরা অনুভব করেছি। 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা' প্রভৃতি উক্তিতে কেবল অনাগত তাৎকালিক যুদ্ধেরই নয়, সমস্ত যুদ্ধেরই সূচনা নিহিত রয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে কেবল প্রথম মহাযুদ্ধে

সর্বনাশের বন্যায় সমস্ত গ্লানি মুছে যায়নি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসেছে—এবং তারপরেও বিশ্বের নানাস্থানে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ রয়েছে। সুতরাং একান্তভাবে তাৎকালিক ব্যাখ্যার দ্বারা প্রজ্ঞাসম্পন্ন কবির রসভূয়িষ্ঠ কবিতাকে গ্রহণ করার পক্ষে আমরা বাধা অনুভব করেছি। 'গীতালি'র যাত্রা-প্রীতির মধ্যে অবশ্য কোথাও কোথাও মহাযুদ্ধের বজ্র ও বিদ্যুতের ঝলক অবশ্যই আমরা পেয়েছি, 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার' প্রভৃতি গানই তার প্রমাণ। কিন্তু এগুলিও মৌলিক কবিপ্রতিভার সঙ্গে সর্বথা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহসা উদিত কোনো তত্ত্ব নয়।

অরূপ-সম্পর্কের অন্যান্য কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে কবির ব্যক্তিগত কাব্যজীবনেতিহাস, জীবন ও অরূপকে মিলিয়ে উপলব্ধির প্রকার বিবৃত হয়েছে। এগুলি কাব্য-সম্পদের দিক থেকে পুর্ব-বর্ণিত অন্যান্য কবিতাগুলি থেকে পৃথক হ'লেও একালের কবি-আত্মার স্বরূপ জানার দিক থেকে মূল্যবান; যেমন ২২সং 'মুক্তি' কবিতায় গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের অরূপ-রসনিমগ্ন কবিচিত্তের জীবনের মধ্যে নিষ্ক্রমণের চিত্র দেওয়া হয়েছে—

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে করল মাতাল।

কবি স্পষ্টতই বলছেন যে অরূপ-নিমগ্ন অবস্থায় অরূপকে সম্যক চেনা যায় না, জীবনের কঠোরতার মধ্যে এবং বিচ্ছেদের মধ্যে তাঁকে

প্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ অরূপের সঙ্গে জীবনকে মেলাবেনই, এইখানেই তাঁর কাব্য-সাধনা পূর্ণতা লাভ করবে। তাই বললেন—

তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদন খানি।

'দেওয়া-নেওয়া' কবিতাটিতে কবি মুক্তিকামী সাধকের মতই পার্থিব জৈব প্রয়োজন ও প্রাপ্তি থেকে পরিত্রাণ চাইছেন। ঐহিকতাকে 'শূন্য পিপাসায় গড়া পেয়ালা' ব'লে অভিহিত করছেন এবং বাসনার চরিতার্থতাকে ভার ব'লে মনে করছেন—

যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায় ;
অনন্ত সে দায়
সহিতে পারি না হায়
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়

পরিচিত 'পাখিরে দিয়েছ গান' কবিতাটিতে কবির অতিপ্রিয় এবং নানাস্থানে বহু-কথিত মনুষ্যত্বের মহিমা গান করা হয়েছে। অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে যাত্রায় মনুষ্যজীবন সার্থক। বিধাতা মানুষকে ইতর প্রাণী থেকে অপেক্ষাকৃত সম্বলহীন অবস্থায় পাঠিয়ে চিরন্তন দুঃখ ও সংগ্রামের অভিমুখী করেছেন। অত্যল্প উপকরণ পেয়ে মানুষ স্বীয় শক্তিবলে যে বিস্ময়কর জ্ঞান ও ভাবের পরিচয় দিয়েছে তা থেকে কবি কল্পনা করছেন যে মানুষের মধ্য

দিয়ে তাঁর নিজ অভিপ্রায়ের চরিতার্থতা ঘটছে। মানুষের মাধ্যমে তিনি নিজ লীলার সার্থক অনুভবে ধন্য হচ্ছেন।

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও
* * *
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

লীলাময়ের সঙ্গে মানুষের এই নিবিড় সম্পর্কটি—যাতে মানুষ একান্ত স্বাধীন অথচ অতিশয় নির্ভরশীল, তার উপলব্ধি কবির বিশেষ সাধনারই পরিচয় বহন করে। প্রাচীন ভগবৎপ্রেমিকদের বিশিষ্ট উক্তির সঙ্গে নিম্নলিখিত উক্তি একত্র তুলনা ক'রে দেখার ইচ্ছা হয়—

শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।

এই কবিতার পরবর্তী লেখা 'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা, আপনাকে তো হয়নি তোমায় দেখা' প্রভৃতি ঐ ঈশ্বর-মানুষের নিবিড়তম সম্পর্কের মর্মে রচিত মনুষ্যমহিমাগানে মুখর।

বলাকার সঙ্গে গীতালির নিবিড় সাদৃশ্য তথা কবির অরূপ সাধনার বৈশিষ্ট্যের উপর বলাকার যাত্রী-মনোভাবের প্রতিষ্ঠার বিষয় লক্ষ্য করা গেল। কবির এই কালের রচনা একদিকে মর্ত-অনুরাগ, অপরদিকে মর্ত-বিরাগের আশ্চর্য নিদর্শন। কিন্তু এই দুটি ভাব পরস্পর-বিরোধী হয়ে কবির অনুভূতিতে প্রকাশ লাভ করেনি। এরা সমন্বয়ধর্মী। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে কবির মর্ত-প্রীতি কল্পনামূলক প্রগাঢ় রোম্যান্টিক মনোবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব জীবনের দীনতা সংকীর্ণতা প্রভৃতি যে মুহূর্তে

কবির চিত্তে প্রতিকূল বেদনার প্রতিক্রিয়া জাগরিত করেছে সেই মুহূর্তে কবি মানবের যাত্রার তথা যাত্রাপথের কাল্পনিক পরিণামের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবির ঈশ্বর-উপলব্ধির সঙ্গে যে-প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র তথা মানবীয় জীবনসংগ্রাম যুক্ত রয়েছে তা কবির উপরিউক্ত ধারণাকে দৃঢ় ক'রে তুলেছে। পরিশেষে সেই মর্ত-অনুরাগই কবির কাম্য হয়েছে যা জীবনাশ্রিত হয়েও আর্ট-এর মত নির্লিপ্ত, বিশুদ্ধ। এই নির্লিপ্ততা ও জৈববাসনাহীনতার মধ্য দিয়ে যে অরূপের উপলব্ধি ঘটছে তা আমরা শারদোৎসব প্রভৃতিতেও লক্ষ্য করেছি। যাই হোক, বাসনাকলুষিত, সৌন্দর্যহীন, জীর্ণ মর্ত পরিত্যাজ্য; সৌন্দর্যময় অরূপসাক্ষাতের হেতুভূত মর্ত ভোগ্য, এই দর্শনেই কবি শেষে স্থির হয়েছেন। বলাকাতেও এই দুই প্রকার মর্তের পরিচয় বিবৃত রয়েছে। একটি কবির বিশেষ আবেগ-মণ্ডিত, তাৎকালিক জাতীয় জীবনের পরিবেশের মধ্যে গঠিত, অপরটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন—উভয়ই অরূপ-উপলব্ধির দ্বারা নবীকৃত। রবীন্দ্রনাথ জীবনপ্রীতির অদ্বিতীয় কবি হ'লেও জীবনকে স্থূলভাবে ভোগ করার চিরন্তন বিরোধী ছিলেন একথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই সব কারণে, বলাকাকে বা পূর্বের কোনো রচনাকে রবীন্দ্রকাব্যের বিচ্ছিন্ন অধ্যায় ব'লে আমরা অনুভব করি নি। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে একটি ধারাবাহিক পরিণামপ্রবণ ঐক্য উপলব্ধি করেছি। তথাপি বলাকার তীব্র গতিমনোভাবের পশ্চাতে কোনো বহিঃপ্রভাব আছে কি না বা তার পরিমাণ কিরূপ তাও আলোচনা ক'রে দেখবার বিষয়।

এই কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবির উপর যে-প্রভাবের কথা বিশেষ জোর ক'রে বলা হয় তা হ'ল ফরাসী দার্শনিক Bergson

এর মতবাদ। বের্গস রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। বলাকা-গীতালি রচনার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর বিখ্যাত Creative Evolution গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে দার্শনিক তাঁর পূর্ব পূর্ব রচনাগুলির সার উপস্থাপন ক'রে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ স্তরের জীব মানুষ প্রাণবেগ-শক্তির ক্রিয়ার বশে প্রতিমুহূর্তে নূতন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পদক্ষেপ করে চলেছে। বিশ্বের প্রাণিজগৎ যদিচ একটা স্থির অভিব্যক্তির নিয়মে ধাবমান হয়েছে, তথাপি তরুলতা ও ইতর প্রাণীর যাত্রা কোনো কোনো সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং মানুষ হয়েছে এই যাত্রায় জয়ী। অবিরাম সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের এই যাত্রার দিকটি বের্গস /নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

"Life as a whole, from the initial impulsion that thrust it into the world, will appear as a wave which rises, and which is opposed by the descending movement of matter. On the greater part of its surface, at different heights, the current is converted by matter into a vortex. At one point alone it passes freely, dragging with it the obstacle which will weigh on its progress but will not stop it. At this point is humanity ; it is our privileged situation................
All the living hold together and all yield to the same tremendous push. The animal takes its stand on the plant, man bestrides animality, and the whole of humanity in space and in time, is one immense army galloping beside and before and behind each of us in an

overwhelming charge able to beat down every resistance and clear the most formidable obstacles, perhaps even death."

(মানুষের এই অবিরাম যাত্রার দিকটি বের্গস'র একটি প্রতিপাদ্য বিষয়। বের্গস' যদিও অভিব্যক্তিবাদের উপর ভিত্তি ক'রেই তাঁর দর্শনকে গড়ে তুলেছেন তথাপি প্রচলিত অভিব্যক্তি-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর প্রকট বৈসাদৃশ্য রয়েছে। ইনি যান্ত্রিক পরিবর্তনের নিয়মকেও মানেন নি আবার অভিপ্রায়মূলক বা পরিণামমূলক ধারণাকেও অঙ্গীকার করেন নি।) কারণ, তাঁর মতে উপরিউক্ত দুই ধারণাতেই স্বাধীন অজ্ঞাত পরিবর্তনকে অস্বীকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই স্থির আছে এমন অমূলক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে ভবিষ্যৎ আমাদের অনুভব, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার কাছে কেবল যে অভিনব তাই নয়, তা একেবারেই অজ্ঞাত। আমরা শুধু সেই মুহূর্তটুকুই জানতে পারি যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে তৎকালে প্রত্যক্ষ। জগতের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর মতে অভিনব অধ্যায়ের অভিনব মুহূর্ত। অর্থাৎ আমরা কেবলমাত্র পরিবর্তনকে জানতে পারি, তার বেশি কিছুই নয়; এবং এই পরিবর্তনই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য। 'we change without ceasing, and the state itself is nothing but change'. অবিরাম-গতি কালের মধ্যে জড়-চেতন সমুদয় বস্তুকে নিহিত ক'রে এই দার্শনিক দেখেছেন সমস্তই 'growing old'। তিনি বলেন প্রাণিজগতের জন্মপূর্ব বহু অবস্থা ছিল। জীবন আর কিছুই নয়, অতীতের বর্তমান অবস্থায় নূতন আকারে অগ্রগমন মাত্র, 'persistence of the past into the present'।

(তিনি যথার্থভাবে দার্শনিকসুলভ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ-শক্তির

দ্বারা অভিব্যক্তিবাদের স্বরূপ, তৃণলতা ও জীবজগতের উৎপত্তি ও অগ্রগতি, এই দুয়ের বিকাশের মূলীভূত ঐক্য, অথচ ধারার মধ্যে পার্থক্য প্রভৃতি নির্ণয় ক'রে এই অগ্রগতির মূলে একটি 'Vital Impulse' বা প্রাণবেগ কল্পনা করেছেন এবং তার ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন।) তাঁর ধারণায় এই প্রাণশক্তির প্রচণ্ড উদ্গমনের ক্রিয়া অব্যাহত নয়। প্রতি মুহূর্তে একে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্‌গতি, আবার প্রগতি—এই হ'ল গতির ধারা। তিনি বলছেন, এই বাধাই বস্তুর আকারে রূপায়িত হয়েছে। বস্তু আর কিছুই নয়, 'inverse movement' মাত্র। প্রাণিজগতের জীবনকে যদি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত একটি হাউইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় তা হ'লে জড়বস্তুকে তুলনা করতে হয় তার ছাইয়ের সঙ্গে। এই জন্যে জড় ও চেতন এই দুই সত্তা বিরুদ্ধভাবসম্পন্ন। কেবলমাত্র চেতনের মধ্যেই পরিবর্তনশীলতার গুণ আরোপ করে তিনি বলছেন—'We find that, for a conscious being, to exist is to change, to change is to mature and to mature is to go on creating oneself endlessly.'

(আমাদের মধ্যেকার এই প্রাণবেগকে আমরা কী প্রকারে উপলব্ধি করতে পারি? বের্গসঁ বলছেন, প্রজ্ঞার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা নয়। Intellect বা বুদ্ধি দিয়ে আমরা বস্তুজগতের আকার প্রকার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি মাত্র এবং ফলে তাদের কাজেও লাগাতে পারি। কিন্তু প্রজ্ঞা ছাড়া প্রাণের স্বরূপ বোঝা যায় না। বস্তুর সঙ্গে বুদ্ধির মিলন এবং প্রাণের সঙ্গে প্রজ্ঞার সম্পর্ক দেখিয়ে তিনি বলছেন যে বস্তু যেমন একটা প্রবাহের পশ্চাদ্‌গমন, বুদ্ধি তেমনি প্রজ্ঞার বিপরীত ধর্ম। প্রজ্ঞা যেন আমাদের মুক্ত করে, আর বুদ্ধি

বদ্ধ বা যুক্ত করতে চায়। বের্গসঁ প্রথমে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ অবলম্বন ক'রে পরিবর্তন-গত সত্য আবিষ্কার করেছেন, পরে বিশ্বের মধ্যেও ঐ চিন্তাকে প্রসারিত করে দেখেছেন, যা ভাণ্ডে তাই ব্রহ্মাণ্ডে। 'The universe is becoming.'

(বের্গসঁর দার্শনিক উপলব্ধির সঙ্গে বলাকার কাব্যোপলব্ধির এক দিক থেকে মোটামুটি আশ্চর্য মিল দেখা যায়। 'চঞ্চলা' কবিতার প্রারম্ভে কালের অবিরাম গতির কথাই কবি বলেছেন।)

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল

ভবিষ্যৎ যে অজ্ঞেয় তা কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবি জানিয়েছেন। যেমন 'আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ', অথবা—

দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' ইত্যাদি উপলব্ধির মধ্যেও কালের পদক্ষেপ কবির শ্রুতিগোচর হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে বর্তমানের মৃত্যু ঘটছে ও ভবিষ্যৎ নবজীবন গড়ে উঠছে—এই উপলব্ধিকে কবি নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছেন—

তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

(একটি বিশিষ্ট জীবনবেগ থেকে যে বিশ্বের উৎপত্তি ঠিক সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেন নি, কিন্তু ঐ বেগের অগ্রগতির সঙ্গে

যে পশ্চাদ্‌গতি বা বাধা অনিবার্যভাবে যুক্ত এবং এর প্রতিঘাতই যে বিশ্বের বস্তুরূপ তা তিনি নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিবৃত করতে চেয়েছেন—)

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম-মূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

(বস্তুগত স্থূলতার সম্মান রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই দেন নি, কিন্তু এখানে যেভাবে বস্তুর ও সঞ্চয়ের স্বরূপ বিবৃত করছেন (অর্থাৎ গতির স্তব্ধতাই যে বস্তু এই ধারণা এবং 'আকাশের মর্মমূলে' প্রভৃতি কল্পনা) তাতে বের্গসঁ তাঁর নিশ্চিত পড়া ছিল ব'লেই মনে করি। তার পর সংঘাতবন্ধুর পথে মানুষের উৎক্রান্তির মুখে যাত্রার বর্ণনা কবি উক্ত দার্শনিকের সদৃশভাবেই করেছেন। বের্গসঁর পূর্বলিখিত উদ্ধৃতির সঙ্গে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার বিভিন্ন স্থান তুলনা ক'রে দেখার যোগ্য।)

(এইভাবে বের্গসঁর Creative Evolution গ্রন্থের নানান স্থান ও

অভিমতের সঙ্গে বলাকার কোনো কোনো স্থানের প্রায় আক্ষরিক মিল থাকলেও, দার্শনিক ও কবির মধ্যে একটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। তা হ'ল কবির পরিণাম সম্পর্কে ধারণা। বের্গস্ঁ প্রারম্ভবাদী হ'লেও হতে পারেন কিন্তু কদাচ পরিণামবাদী নন। কেবল পরিবর্তনকেই সর্বব্যাপী শক্তি বলে তিনি মনে স্থান দিতে পারেন নি। সৃষ্টি একটা আদিঅন্তহীন প্রহেলিকা মাত্র এরকম ধারণা কবির ধর্মবিরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের এই পরিণামভাবের দৃষ্টি বলাকাতেই 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, যার 'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,…………………তবে ঘরছাড়া সবে, অন্তরের কী আশ্বাস রবে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

এখানে বের্গস্ঁ সম্পর্কেও একটা সংশয় মনে দেখা দেয়। বের্গস্ঁর আদিঅন্তহীন সৃষ্টিক্রিয়াসম্পন্ন গতিবেগমুখর ঐ Vital Impulse যদি পরিণামী না হয়, এর ধারণা কি স্পষ্টতই প্রাকৃতিক যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদেরই অঙ্গ নয়? বের্গস্ঁ কি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ল্যামার্ক বা ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদকেই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে আরোপ ক'রে দেখছেন না? বের্গস্ঁ সম্পর্কে এ প্রশ্ন সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এ-ও সত্য যে, বের্গস্ঁ সৃষ্টির পরস্পরবিরোধী অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-ঐক্য দেখতে পেয়েছেন, আপাত-অনুভূত বুদ্ধিগ্রাহ্য শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে-সামঞ্জস্য আবিষ্কার করেছেন, বস্তুবাদী ও ভাববাদী পূর্বতন ধারণার ত্রুটিগুলি বিচার ক'রে যে-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচেন, ব্যবহারিক বুদ্ধিকে 'তিষ্ঠ' ব'লে যে-নির্দেশ দিয়েছেন এবং বস্তুর অতীত জীবনবেগ-রূপ spiritকেই যে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন—তার মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি আশ্চর্য এককশক্তির লীলার তত্ত্বই প্রকটভাবে অনুভূত হয়নি কি?

মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টির স্বাধীনতা অথচ বিশ্বগত আকার-প্রকার-মূলক বস্তু-নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে বের্গস যখন বলছেন 'We are not the vital current itself; we are this current already loaded with matter, that is, with congealed parts of its own substance which it carries along its course'—তখন সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ধারণা ছাড়াও মুক্ত আত্মার বদ্ধতা সম্পর্কে এদেশীয় ধারণার কথা মনে উদয় হয় না কি? বস্তুত বের্গস তাঁর উপলব্ধিকে এমন একটা স্তরে স্থাপন করেছেন যাতে এসম্পর্কে দুটো বিপরীত প্রশ্ন একই সঙ্গে করা যেতে পারে।

(বের্গসঁর ধারণার সঙ্গে এদেশীয় বৈদান্তিক ও ভাববাদী দার্শনিক ধারণাও একত্র তুলনা ক'রে দেখার যোগ্য।) বের্গসঁর মত বস্তু-জগতের রূঢ়তা, স্থূলতা ও সীমাবদ্ধতা এবং অন্তর্জগতের স্বাধীন অগ্রগতির কথা আর কোন্ আধুনিক পাশ্চাত্য মনীষীর প্রজ্ঞায় এমনভাবে ধরা পড়েছে? বের্গসঁর মতে সত্য এক, ঘাত এবং প্রতিঘাত, অগ্রগতি এবং পশ্চাদ্‌গতি উভয়ই যার স্বরূপের অন্তর্ভূত। আমরা ব্যবহারিক বস্তু-সীমাবদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে সৃষ্টির স্বরূপ নির্ণয় করতে যাই, ফলে বস্তুকেই তত্ত্বরূপে দেখতে চাই। অথচ বিশ্বে বস্তু নেই আছে শুধু কার্য। তিনি বলছেন—'Everything is obscure in the idea of creation if we think of things which are created and a thing which creates..............It is natural to our intellect, whose function is essentially practical, made to present to us things and states rather than changes and acts. But things and states

are only views, taken by our mind, of becoming. There are no things, there are only actions. More particularly, if I consider the world in which we live, I find that the automatic and strictly determined evolution of this well-knit whole is action which is unmaking itself, and that the unforeseen forms which life cuts out in it, forms capable of being themselves prolonged into unforeseen movements (তু°—'তাজমহল' কবিতা—'কে তোমারে দিল প্রাণ হে পাষাণ') represent the action that is making itself.

(Creative Evolution—Ideal Genesis of Matter)

গ্রন্থের এই অধ্যায়ে বের্গস্ঁ এর উপলব্ধি আত্মদর্শী প্রাচ্য দার্শনিক-দের সগোত্র হয়ে উঠেছে। জীবনবেগময় বিশ্বের সৃষ্টির মূলে তিনি বস্তুকে দেখেন নি, দেখেছেন একটি উৎক্ষেপের অবিরাম প্রবাহ— 'A centre from which the worlds shoot out like rockets in a firework display—provided, however, that I do not present this centre as a thing, but as a continuity of shooting out.' (ঐ)

তারপর এই প্রজ্ঞাবাদী দার্শনিক সৃষ্টির মূলীভূত সত্যরূপে তাঁর স্বকীয় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, (যদিও গতিরূপে ছাড়া ঈশ্বরকে ধারণায় আনতে পারেন নি ব'লে ভারতীয় আস্তিক দর্শনের সঙ্গে তাঁর বৈসাদৃশ্যও প্রকট হয়ে পড়েছে)—'God, thus defined has nothing of the already made ; He is unceasing life, action, freedom. Creation, so conceived, is not a mystery ; we experience it ourselves when we act freely.'

আমাদের ধারণায় একক সত্তা বা ব্রহ্ম গতিস্বরূপ এবং স্থিতিস্বরূপ দুইই। তিনি প্রাণ, চৈতন্য, ব্যক্তিত্ব, কর্ম প্রভৃতিরূপে বিশ্বে বিরাজমান, কিন্তু এতদতিরিক্ত অদ্বৈতানুভূতিরূপেই মানুষের হৃদয়গম্য, তিনি পথ ও পরিণাম উভয়ই। রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি এই রকম ধারণাই প্রকাশ করেছেন। এজন্যে বের্গসঁর সঙ্গে তাঁর মিল আছে, আবার নেইও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুভূতি-প্রবণ কবি ব'লে, বা পরিবর্তনশীল অনুভূতির মধ্য দিয়ে অরূপ নানাভাবে কবির নিকট প্রতিফলিত হয়েছে ব'লে, এবং জীবনাশ্রয়ী হয়ে আমাদের মানবীয় প্রেম, সৌন্দর্য-স্পৃহা প্রভৃতির সঙ্গে অরূপকে তিনি যুক্ত ক'রে দেখেছেন ব'লে বের্গসঁর ধারণার সঙ্গে কবির উপলব্ধির মিলই দেখা যায় বেশি। বের্গসঁ ব্রহ্মকে স্থিতিরূপেই দেখুন বা গতিরূপেই দেখুন, সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গভীর সাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়েছে। কবির সঙ্গে দার্শনিকের এই প্রায় সর্বতোব্যাপী মিলের দিকটি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে।

বের্গসঁ যেমন একটি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুর সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, তেমনি বুদ্ধির সঙ্গে বোধির বৈষম্য কল্পনা ক'রে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক জৈব প্রয়োজনের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে বাহ্য জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বের দিকটি তিনি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করেছেন—

'In the humanity of which we are a part intuition is, in fact, almost completely sacrificed to intellect. It seems that to conquer matter, and to reconquer its own self, consciousness has had to exhaust the best part of its power.' (ঐ)

(আবার তিনি আত্মসাক্ষাৎকারের প্রকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতেও কবির সঙ্গে সাদৃশ্যই দেখা যায়।) বের্গস঳ বলেন, বস্তু-শৃঙ্খলিত প্রয়োজনের জীবন যাপন করতে করতে কখনো কখনো প্রবল দুঃখে আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং সেই অবস্থায় আমরা জীবনবেগকে প্রত্যক্ষ করি এবং নিজেদের সম্পূর্ণ চিনে নিতে পারি। (প্রবল দুঃখের মধ্যে যে আমাদের আত্মোপলব্ধি ঘটে এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও গদ্যে বলাকার পূর্বে ও পরে নানাভাবে আমাদের জানিয়েছেন।) কবির অরূপ-উপলব্ধির মূলে এই দুঃখবোধ কী ভাবে কাজ করেছে তা আমরা পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। (কবির পক্ষে বিশেষ এই যে কবি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমেই সেই প্রজ্ঞায় সহজে উত্তীর্ণ হতে পারেন। বের্গস঳ বুদ্ধির সঙ্গে প্রজ্ঞার বিরোধ দেখালেও ইন্দ্রিয়ানুভূতির এই দিকটি সম্পর্কে অবশ্য স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি।) তিনি বলছেন 'Intuition is there, however, but vague and above all discontinuous. It is a lamp almost extinguished which only glimmers now and then, for few moments at most. But it glimmers wherever a vital interest is at stake.' (ঐ)
এদিক থেকে কবির সদৃশ উপলব্ধি হ'ল—

হয়তো তারে দুঃখ দিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।

এই কবিতাংশটি 'পুরবী'র হ'লেও এর উপলব্ধ তত্ত্বটুকু বহু প্রাচীন,—দুঃখ দুর্যোগের মধ্যে অরূপ-সত্যের বা সৌন্দর্য্য-বিরহের মধ্যে সুদূর কোনো সত্তার উপলব্ধি। বের্গস঳ আরও বলছেন—"At times, however,

in a fleeting vision, the invisible breath that bears them is materialised before our own eyes. We have this sudden illumination before certain forms of maternal love, so striking and in most animals so touching, observable even in the solicitude of the plant for its seed. This love in which some have seen the great mystery of life may possibly deliver us life's secret."

(ঐ—Development of Animal Life)

রবীন্দ্রকাব্যে আশ্চর্য সর্বগ্রাসী রোম্যান্টিক ক্ষুধার মধ্যে যখনই কবির প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে তখনই তিনি বিশ্বের অন্তর্গত একক প্রাণশক্তির লীলা অনুভব করেছেন দেখেছি। কখনো বা সৌন্দর্যরহস্যরূপেও একক সত্তার লীলা কবি অনুভব করেছেন। এবিষয়ে তাঁর প্রথম কাব্যজীবনের বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি, চিত্রা, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি উত্তম কবিতাগুলি লিখিত হয়েছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা— প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে তাঁর কাব্যে তখন থেকে সর্বদা অনুস্যূত প্রজ্ঞামূলক উপলব্ধির কথাই কবি বিবৃত করেছেন। সেকালের এবং কিছু পররর্তী কালের চৈতালি, নৈবেদ্য, উৎসর্গ প্রভৃতিতে অরূপ-উপলব্ধির পূর্বাহ্ণেই কবি যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে অভাবনীয়ের চকিত স্পর্শ লাভ করছেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। চৈতালির 'ক্ষণমিলন' কবিতায় কবি বের্গসঁর উপরিউক্ত ধারণার মতই ক্ষণিক আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে অনন্তের আভাস প্রত্যক্ষ করছেন—

'এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর, তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।' নৈবেদ্য কাব্যে যেখানে কবি নিজের মধ্যে একক প্রাণ-শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করছেন ও বিশ্বের মধ্যে তাকে প্রসারিত ক'রে দেখছেন সেখানে কবির প্রজ্ঞাময় উপলব্ধি দার্শনিক বের্গসঁর সদৃশই হয়েছে, যেমন—)

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে............

আপনার ও বিশ্বের অন্তর্গত এই একত্বের উপলব্ধির জন্যেই বিরহী কবি 'প্রবাসী' এবং অন্য নানা কবিতায় এই অভিমত সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন যে—)

জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিরগৌরব, একথা না যদি শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

*　　*　　*　　*

যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে জনমে জনমে মরণে॥

কবির প্রথম কাব্যজীবনের বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্যে বের্গসঁর সঙ্গে বিস্ময়কর মিল দেখা যায় কবির 'জীবন-দেবতা' বা 'অন্তর্যামী' নামক স্বীয় ব্যক্তিত্বের বা আত্মশক্তির (বের্গসঁর Self বা Creative Personality র ধারণা) বিষয়ে। বের্গসঁ তাঁর Creative Evolution ছাড়া Matter and Memory, Introduction to Metaphysics প্রভৃতি আলোচনাতেও ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্বর্তী একক শক্তির পরিবর্তনমূলক বিকাশলীলার কথা বলেছেন এবং একমাত্র প্রজ্ঞাগোচর শক্তি ব'লে একে উল্লেখ করেছেন। 'জীবন-দেবতা' সম্পর্কে আলোচনায় আমরা কবির পূর্ব পূর্ব স্মৃতির বাহক অথচ নব নব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অজানার পথে বিকাশপ্রবণ এই ব্যক্তিসত্তার দিক সম্পর্কে নির্দেশ করেছি এবং এরই মর্মে যাত্রী কবির বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে স্বকীয়ভাবে অগ্রসর ঐক্যধারা সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছি।

এইভাবে বের্গসঁর সঙ্গে কবির বিশ্বদর্শনের প্রকার ও ধারার প্রায় আদ্যন্ত সঙ্গতি দেখানো যায়, অথচ বলা যায়, যেবিষয়ে কবির উপলব্ধির সঙ্গে বের্গসঁর একটু তারতম্য রয়েছে সে বিষয়ে বের্গসঁই আমাদের প্রশ্নের পাত্র হয়েছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা ও উদ্ধৃতিনিচয় থেকে এও বোঝা যায়, বের্গসঁ বিজ্ঞান-নির্ভর যুক্তিবাদ থেকে কোথায় এসে পড়েছেন। তিনি প্রাকৃতিক ও অভিপ্রায়মূলক পরিবর্তন উভয়কে বর্জন ক'রে যে জীবনবেগের ধারণা করেছেন তাকে স্থির অপরিবর্তন সত্তারূপে গ্রহণ না করলেও একমাত্র অধ্যাত্ম-মানসেরই গোচর ক'রে তুলেছেন। এবং এইখানেই আমাদেরও প্রশ্নের অবকাশ ঘটেছে। (জননীর সন্তান-স্নেহ, বিরহীর নিবিড়তম ব্যথার মধ্যে যে অদৃশ্য জীবনবেগ

প্রজ্ঞা-গোচর হয় অথবা অনুরূপ অবস্থায় আমাদের যে আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে তাতে আমাদের সংবিৎ জড়ত্বের আবরণ মুক্ত হ'লে আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই একটি ধ্রুব অখণ্ড অস্তিত্বের মধ্যে উপলব্ধ হয় না কি? দার্শনিকপ্রবরের কাছে ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, প্রজ্ঞার দ্বারা জীবন-বেগের স্বরূপ জ্ঞাত হ'লে তার ভবিষ্যৎ পন্থাও কি আমাদের অজ্ঞাত থাকবে? তিনি সৃষ্টিপরম্পরার কারণরূপ প্রাণবেগকে যে-নিরাশ্রয় শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা তো আর একপদ অগ্রসর হওয়ারই অপেক্ষা রাখে। তখনই একটি ধ্রুব অপরিবর্তন সত্যের ধারণাও অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে, এবং তখন পরিবর্তনের ধারণায় স্থির না হতে পেরে ভারতীয় দর্শনের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়,—বিশ্ব পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মা ধ্রুব; প্রকৃতি পরিবর্তনরূপা, পুরুষ স্থির। বস্তুতঃ বের্গস যে-প্রজ্ঞাকে দুর্লভ ব'লে অভিহিত করেছেন ভারতীয়ের কাছে তা সুলভ এবং ভারতীয় সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি সহকারে সত্যকে পরিবর্তনশীল ব'লে দেখতে পায় নি, স্থির, ধ্রুব বলেই জেনেছে।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনায় স্বকীয় উপলব্ধিবলে পরিণামের আশ্রয়, গতির গতি ধ্রুবসত্তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। পরিবর্তন-প্রহেলিকার চরম মূল্য দেন নি। এইখানে বের্গস‍ঁর সঙ্গে কবির মৌলিক পার্থক্য। কিন্তু অন্য সব বিষয়ে বের্গস‍ঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল দেখে এই পার্থক্যটুকুকে একটি সূক্ষ্ম আবরণের পার্থক্য ব'লেই মনে হবে। পূর্বে যে কথা বলেছি যে বের্গস‍ঁর উপলব্ধি আর একপদ অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষা রাখে, তা রবীন্দ্রনাথেই ঘটেছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অরূপ-কল্পনায় সেই শূন্য পূর্ণ হয়েছে। বের্গস 'এত

প্রেম, এত আশা, এত ভালোবাসা'র মধ্য দিয়ে যে দুর্জ্ঞেয় জীবনবেগকে দেখতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা লীলাময়ের প্রকাশ বলেই অনুভব করেছেন। ঐ সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু বাদ দিলে, কবির সঙ্গে দার্শনিকের সর্বাবয়বগত যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাকে প্রভাবমূলক সুতরাং সহসা উদিত ব'লে মনে করলে ভুল করা হবে। মোট কথা, বের্গসঁ'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল কেবলমাত্র পরিবর্তন-তত্ত্বেই আবদ্ধ নয়। সৃষ্টির প্রকার, প্রণালী, মানুষের মহিমা, জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মের যোগ ব্যক্তিগত জীবনের গতিশীল বিকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উভয়ের ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে। এবং কেবল কবির বলাকা পর্যায়েই নয়, তার পূর্ব পূর্ব পর্যায়ের বিভিন্ন উপলব্ধিগুলির মধ্যেও দার্শনিকের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সেইজন্যে আমরা কবির পরিবর্তন-বাদের বিষয়টি বের্গসঁ এর প্রভাব-জাত ব'লে মেনে নিতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় উপলব্ধির মূলেই ধীরে ধীরে এই জীবন-দর্শনে এসে পৌঁছেছেন এই সমীচীন ধারণাই পোষণ করেছি। বের্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ স্থূল বস্তুগত পার্থিব প্রয়োজনের জীবনের প্রাপ্যমূল্য দিয়ে জীবনাতীতের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত ক'রে দেখেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ ও পরিণাম যে ঐক্যসূত্র অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে কবির জন্মান্তরের অনুভূতি, নিরুদ্দেশ সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বসুন্ধরার তাবৎ বস্তুতে জীবন-চাঞ্চল্যের অনুভব, সৌন্দর্য বা আর্টের তথা অনির্বচনীয় অরূপের মধ্যে মুক্তির অনুসন্ধান, দুর্যোগময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অরূপানুভূতি, সংঘাতক্ষুব্ধ বন্ধুরপথে মানবজীবনের জয়যাত্রা প্রভৃতি কিভাবে একত্র যুক্ত হয়ে একটি বিশিষ্ট কবি ও একটি বিস্ময়কর সমগ্রতা অভিব্যক্ত করেছে তা এতাবৎ আলোচনার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এর মধ্যে কেবল বলাকাতেই বের্গসঁ'র প্রভাব নির্দেশ

করলে যেমন কবি প্রতিভার অনন্য-পরতন্ত্র ঐক্যমূলক বিকাশের ধারণায় কুঠার-আঘাত করা হয় তেমনি উভয়ের জীবন-দর্শনের গভীরতর ঐক্যের উপলব্ধি থেকেও বঞ্চিত হতে হয় †। এই কারণে আমরা মনে করি যে উভয় দার্শনিকই স্বকীয় বিশিষ্ট উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রায় এক ধারণায় এসে পৌঁছেচেন। একজন প্রজ্ঞাময় মননের দ্বারা, আর একজন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আনন্দ-চৈতন্যময় লোকে উত্তীর্ণ হয়ে। বলাকার কয়েকটি কবিতায় Creative Evolutionএর বিশিষ্ট কয়েকটি ধারণার ও ভাষার যে মিল রয়েছে তা থেকে শুধু এই মনে হয় যে ঐ গ্রন্থ কবি পাঠ করেছিলেন এবং ওর প্রতিপাদ্য রহস্যময় জীবনবেগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওর মধ্যে তিনি নিজেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে সেই আত্মদর্শনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপেই যেন ঐ পুস্তকের কয়েকটি প্রবল উক্তি অলংকার-রূপে বলাকার কয়েকটি কবিতায় গ্রহণ করেছেন। আমাদের আরো মনে হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে নানান্ ক্ষেত্রে প্রাচ্য রহস্যময়তার যে স্পর্শ লেগেছে তারই ফলে ফিক্‌টে, শেলিং, হেগেল থেকে বের্গসঁ এবং ক্রোচে পর্যন্ত প্রায় সকলেরই বিশ্বোপলব্ধির সঙ্গে ভারতীয় ঐক্যদর্শী ভাবধর্মী দর্শনের মিল দেখা যায়। যাই হোক, বের্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সমগ্র সাদৃশ্যের দিকটি লক্ষ্য করতে হবে, এবং বলাকা-পূরবী পর্যায়ের জীবন-অরূপের অথবা প্রকৃতি ও আত্মার অপূর্ব মিলন-উপলব্ধির অধ্যায়টি রবীন্দ্র-কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে চলবে না। গীতাঞ্জলি ও গীতালি থেকে আরম্ভ ক'রে মহুয়া পর্যন্ত জীবন ও ধর্মের সামঞ্জস্যের সূত্রটি ক্রমশঃ আবিষ্কার ক'রে চলার ছন্দের উপর যেমন কবি প্রাধান্য দিচ্ছেন তেমনি দেখা

† প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করতে হয় যে বের্গসঁর কোনো রচনাই খ্রিঃ ১৯১০—১১ এর আগে ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি।

যায় এই বিখ্যাত দার্শনিকও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গতিতত্ত্ব উপস্থাপিত ক'রে অরূপকে জীবনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইছেন। অধ্যাত্মকে যাঁরা কেবল জীবনাতিরিক্ত (Transcendent) ব'লে দেখতে চান এমন 'মরম না জানে ধরম বাখানে' ব্যক্তিদের বিষয়ে এই সমন্বয়বাদী দার্শনিকের সমালোচন যেন তাঁর লেখনীতে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি—'The great error of the doctrines on the spirit has been the idea that by isolating the spiritual life from all the rest, by suspending it in space as high as possible above the earth, they were placing it beyond attack, as if they were not thereby simply exposing it to be taken as an effect of mirage !................a philosophy of intuition will be a negation of science, will be sooner or later swept away by science, if it does not resolve to see the life of the body just where it really is, on the road that leads to the life of the spirit.' অর্থাৎ, বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদীরা জগৎ ও জীবন থেকে অধ্যাত্মকে পৃথক ক'রে উচ্চে তুলে ধ'রে তাকে রক্ষা করার যে প্রয়াস করেছেন তাতে অধ্যাত্ম তার মূল হারিয়ে ফেলেছে এবং সাধারণ্যে মরীচিকার ভ্রান্তি জন্মাচ্ছে। প্রজ্ঞাবাদীরা যদি আত্মাকে দেহের সঙ্গে যুক্ত ক'রে না দেখেন, জীবনের মধ্যেই জীবনবেগ-রূপ কারণ অনুসন্ধান না করেন তা হলে জড়বিজ্ঞানের প্রবাহে অধ্যাত্ম ধুয়ে মুছে যাবে। বের্গসঁর মতে দেহের মধ্যেই দেহাতীত অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ দর্শন, বিশ্বের চৈতন্যময় জীবনস্পন্দনের স্বরূপ জীবনের মধ্যেই প্রাপ্তব্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সীমার মধ্যেই

অসীমের লীলা' প্রত্যক্ষ করতে হবে, বৈরাগ্য-প্রণোদিত তুরীয়লোকে নয়।

(দেখা গেল, বের্গস্ঁ এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে আত্যন্ত মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। কবির এই সংঘাতময় অবিরাম চলার ধারণার পশ্চাতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' মন্ত্রটি রয়েছে এমন ধারণা কোনো কোনো মনীষী পোষণ করেন। ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রটি গতি-শীলতার প্রকাশের দিক থেকে অসামান্য, কিন্তু যেহেতু মোটামুটি উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ও বেদান্ত-অনুসারী ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের মধ্যে বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার কথা নানা আকারে বিক্ষিপ্ত রয়েছে—এমন কি, লৌকিক বাউল সংগীতেও নানাস্থানে যাত্রার অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে, সেইহেতু কয়েকটি বিশিষ্ট মন্ত্রকেই কবি-অভিপ্রায়ের মৌলিক প্রেরণারূপে মনে করতে আমরা দ্বিধাবোধ করেছি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিগূঢ় এবং তা রহস্যময় কবিব্যাপারের মধ্যে এমনিভাবে গ্রথিত যে বিশ্লেষণ ক'রে একথা বলা চলে না যে অমুক মন্ত্র অবলম্বন ক'রে কবি অমুক কবিতা লিখেছেন। এক্ষেত্রে নানাদিক দিয়ে Creative Evolutionএর গ্রন্থকারের উপলব্ধির সঙ্গে কবির যে বিস্তৃত সাদৃশ্য রয়েছে তা আমরা আলোচনার সঙ্গেই দেখিয়েছি।) বস্তুতঃ রবীন্দ্রকাব্য স্বকীয় উপলব্ধির ক্রমবিকাশের এক বিস্ময়কর চিত্র।

কবি বলাকার বৈষয়িকতামুক্ত যাত্রী-জীবনকে বরণ করার আগ্রহ এবং জীবনের মধ্যে অরূপকে দেখার প্রকার এই সময়কার চতুরঙ্গ উপন্যাসের শচীশ-চরিত্রের মধ্যে বাস্তব আধারে দেখানোর প্রয়াস করেছেন এবং বলাকার অব্যবহিত পরের কাব্য 'পলাতকা'র মধ্যে করুণ কাহিনীর আশ্রয়ে জীবনের গতানুগতিকতা থেকে নিষ্কৃতির

অভিলাষ বর্ণনা করেছেন। পলাতকায় নিসর্গকে ঐ মুক্তির বাণীর বাহকরূপে এবং মৃত্যুকে সহায়করূপে কল্পনা করা হয়েছে।

কবির উপলব্ধির এই পরিণতির কালে ঋতুনাট্যগুলি অসামান্য-ভাবে তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক হয়েছে। অরূপের যে লীলা চলেছে সৃষ্টির মধ্যে, জীবনের মধ্যে, মূলতঃ তারই বিচিত্র অনুভব ঋতুরচনায় প্রকাশিত। খেয়া, শারদোৎসব ও গীতাঞ্জলির আলোচনার সময় আমরা দেখিয়েছি কিভাবে নিসর্গ-সৌন্দর্য-অনুভূতি কবির অরূপ-উপলব্ধির মূলে রয়েছে, প্রকৃতির সুন্দর ও ভয়ানক এই দুই রূপের মাধ্যমে রসনিমগ্ন কবিচিত্ত রসের কারণস্বরূপ অথবা রস-স্বরূপ (কারণ, অরূপ বা সুন্দর কবির রসোপলব্ধির বা জীবনবোধের সঙ্গে এমনভাবে বিজড়িত যে তা পৃথক ব্যপদেশের অযোগ্য) অনির্বচনীয়ের সন্ধানে কিরূপে অগ্রসর হয়েছে। ঋতু-পর্যায়ের বৈচিত্র্যের মধ্যে একের পদধ্বনি তখন থেকেই কবির শ্রুতিগোচর হয়েছে। গীতাঞ্জলির নিম্নলিখিত গানটিতে কবি তন্ময় হয়ে এই নটরাজের লীলা অনুভব করেছেন এবং পার্থিব স্বার্থের আত্যন্তিক মুক্তির মধ্যে এই লীলারসের অনুভবনীয়তা ব্যক্ত করেছেন—

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে।
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

* * *

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,

প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধে রে ॥

এই গানটিকে ঋতুপ্রকৃতির সঙ্গে কবিমানসের নিবিড় সম্পর্কের ও ঋতুপর্যায়ের মধ্যে উপলব্ধ অরূপের চরণক্ষেপের দ্যোতক একটি বিশিষ্ট কবিতা ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই অরূপই পরে সন্ন্যাসী, সুন্দর বা মুক্তিদাতা নটরাজে রূপান্তরিত হয়েছে। "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"

কার এবং কিসের বন্ধন? চিরযৌবনময় রূপরূপান্তরের মধ্যে অগ্রগামী অন্তরাত্মার জৈব প্রয়োজনের বন্ধন। যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্র ও পার্থিব বুদ্ধি দিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গ্লানির মধ্যে অনন্ত জীবনকে আমরা বন্দী ক'রে রেখেছি। কবি বলছেন—

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি
চতুর্দিকে।

('উদ্বোধন'—বনবাণী)

অবসাদের মধ্যে বিস্মৃত নীলমণিলতাকে স্মরণ ক'রেও কবি এই ঐহিক বৈষয়িকতা-গ্রস্ত জড়ত্বে আবদ্ধ জীবনকে নিন্দা করছেন—

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে,
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে।

(বনবাণী)

মুক্তি জীবনবৈরাগ্যে নয়, স্বার্থবৈরাগ্যে, কবির এই সুপ্রাচীন উপলব্ধিটি প্রকৃতিরসভাবুকতার এই অভিনব পর্যায়ে তিনি অতি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। নটরাজের লীলায় নিমগ্ন হয়ে কবি এই মুক্তিরস পান করছেন এবং যেন বিষয়াসক্ত বুদ্ধিজীবীদের এই উদার মুক্তিকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন—

শুনবি রে আয় কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্যগগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সুতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করবেন এই নৃত্যের মুক্তির সঙ্গে কবির অধুনা-

পরিপুষ্ট বিশ্বগতিলীলাতত্ত্ব নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে। নটরাজ-লীলা প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করার বিষয়, 'খেয়া'য় প্রথম উপলব্ধ দুই পরস্পরবিরুদ্ধ রূপের মধ্যে রহস্যময় অরূপদর্শন এগুলির মধ্যেও নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে। চঞ্চল নটরাজের ঐ মিলিত দুই রূপই ঋতুকাব্যের আলম্বন, যেমন, নটরাজে—

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে ॥

'শেষ-বর্ষণে' আষাঢ়ের রূপে—

সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা ॥

'বাঁধন হারা' 'পথিক' বসন্তের আহ্বানে বৈরাগী চিত্তের কঠোর রিক্ততার মধ্যে—

আসবে যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্তপথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।

পৌষের রিক্ততা ও ফাল্গুনের পূর্ণতার মধ্যে—

"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী—তখন ফাল্গুনের আম্র-

মঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

অতএব "তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো তুমিই সর্বনেশে"।

এই ঋতুপর্যায়ের নাটকের মধ্যে শারদোৎসবের পর দ্বিতীয় রচনা 'ফাল্গুনী' এই সময়কার চলার সুরে স্পন্দিত। জরা ও জড়ত্বকে অতিক্রম ক'রে 'বারে বারে প্রথম' যৌবনের বিজয়যাত্রা চলেছে, শীতকে বিনির্জিত ক'রে বসন্তের আগমনের রূপকের মধ্যে কবির এই উপলব্ধি অভিব্যক্ত হয়েছে। গীতালির—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

প্রভৃতি গানটি ফাল্গুনীর ভূমিকারূপে স্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় উৎসর্গ-খেয়া-গীতাঞ্জলি-ডাকঘর এর চিরপরিচিত সুদূরের বাঁশির সুরের সঙ্গে ফাল্গুনীর চলার সুর একাত্মও বটে। কিন্তু ফাল্গুনীতে জীর্ণতা ও জড়ত্বের উপর কবির বিরাগ অতিশয় প্রবল। আমাদের অত্যন্ত প্রবীণ, সংশয়-কুণ্ঠিত, বুদ্ধি-অবগুণ্ঠিত, জরাগ্রস্ত মনটাকে কবি 'মান্ধাতার আমলের বুড়ো' বলে অভিহিত ক'রে সুচির-লালিত দৃঢ়মূল বার্ধক্যের আবরণ সবলে উন্মোচন করেছেন এবং তার যথার্থ স্বরূপ এখানে উদ্ঘাটিত করেছেন। ফাল্গুনীর অকারণ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য-পরিণাম-হীন চলা কিশোরদের কণ্ঠে কেমন সহজ প্রকাশ লাভ করেছে!—

আমরা যাব।

কোথায়?

সেটা আমরা ঠিক করি নি।

যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক করনি।

সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

'যাওয়ার সুরে আসার সুরে' একাকার হয়ে সমস্ত বিশ্বে যে সত্যের লীলা চলেছে তা ফাল্গুনীর কয়েকটি গানের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। কবি বলছেন, যাত্রার মধ্যে মিলন ও বিরহের সুর রয়েছে একত্র মিশ্রিত। "জগৎটা কেবল পাব পাব বলছে না—সঙ্গে সঙ্গেই বলছে ছাড়ব ছাড়ব"।

নতুন ক'রে পাব ব'লে
হারাই ক্ষণে ক্ষণে।

* * *

তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন।

এই হ'ল প্রকৃতির মধ্যে বসন্তের লীলা, নব নব রূপের মধ্যে অরূপের পুনঃপুনঃ প্রকাশ। প্রাণের মধ্যেও সেই ফাল্গুনের লীলা চলেছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে পাবার আগ্রহে, যার প্রেরণায় বালকের দল ছুটে চলেছে শীতবৃদ্ধের বস্ত্রহরণ করতে। "বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলেছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।" বালকদলের কর্তব্যের বালাই নেই, প্রয়োজনের তাগিদ নেই, তারা বুদ্ধির বদ্ধতা থেকে মুক্ত। তাদের আছে শুধু 'পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয়' ক্ষয় করা। 'আমরা কিছু বুঝব না বলেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।' বুদ্ধিকে বিষয়সুখের সঙ্গে জড়িত ক'রে প্রজ্ঞাবাদী বের্গস'র মত 'কবিশেখর' বা রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা বুদ্ধিমান।"

বলা বাহুল্য, একথা লেখার সময় আধুনিক বৈষয়িকতা-প্রবণ বুদ্ধিজীবী যুবকদের কথাই কবির মনে হয়েছিল। জীবনের মধ্যে স্বার্থবৈরাগ্যের সাধনাই মুক্তির সাধনা, তাতেই অরূপের লীলাচ্ছন্দে যোগদানের পথ উন্মুক্ত হয় এই সত্যোপলব্ধিটি অন্যত্র যেমন ফাল্গুনীতেও তেমনি স্পষ্ট ক'রেই 'কবিশেখর' বা কবি ব্যক্ত করলেন—

"যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।"

এই হ'ল আধুনিক কবিশ্রেষ্ঠের নবতম জীবন-দর্শন। কবি কর্তৃক দৃষ্ট এ মুক্তি-সত্যের আর এক যুগোপযোগী বাস্তব মূর্তি আমরা একটু পরেই দেখতে পাব মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটকদ্বয়ের আলোচনায়।

গীতালি ও বলাকার অ-বস্তুতান্ত্রিক জীবনরসবাদ বা আমাদের কথিত জীবন ও অরূপের সমন্বয়, পূরবী ও মহুয়াতে কী রূপান্তর গ্রহণ করেছে তা এখন আমাদের লক্ষণীয় হবে। কিন্তু তার পূর্বে

এই সময়ের রচনার একটি লঘু প্রবণতার দিক সম্পর্কে অচেতন থাকলে চলবে না। তা হ'ল কবির বিশেষভাবে সাময়িক রচনা, যা কোনো ব্যক্তির প্রেরণায় লেখা, ঘটনা বিশেষের আবরণে আবৃত। এরকম একান্ত তাৎকালিক কবিতা ইতিপূর্বে লেখা হ'লেও তাদের সংখ্যা বর্তমানের থেকে খুবই কম। কবির পরিচয়ের ও লৌকিক সহানুভূতির সীমানা বেড়ে যাওয়ার ফলে এরকম আধা-ফরমায়েশি বা ফরমায়েশি রচনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে কিনা তা চিন্তনীয়, অথবা এই যুগের পর কবির প্রতিভা-দীপ্তি (বহুবিস্তৃত হ'লেও) ক্ষীণ হয়ে আসছে ব'লে, তারই পূর্বাভাস পূরবী-মহুয়ার অসামান্যতার মধ্যেও সূচিত হয়েছে কিনা তাও ভেবে দেখবার বিষয়। অবশ্য তাৎকালিক দাবীর পরিপূরক হ'লেও এগুলি যে কাব্য হিসেবে উপাদেয় নয় তা আমরা বলি না। এগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর প্রতিভার স্বকীয়ত্বে মণ্ডিত হয়ে কেবলমাত্র সাময়িকতাকেই অতিক্রম করেনি, অধিকন্তু এই পর্যায়ের বিশিষ্ট পরিণত কবি-প্রতিভার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলির রচনার মুহূর্ত যেন কবির আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেমন ধরা যাক পূরবীর শেষের দিকে মুদ্রিত 'বিদেশী ফুল', 'অতিথি' প্রভৃতি তাঁর বিদেশবাসের গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশ্যে অথবা তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে লেখা কয়েকটি কবিতা। নানান্ স্মৃতি-বিস্মৃতি জড়িয়ে এক একটি বিশেষ মুহূর্তে এগুলির প্রকাশ এবং এগুলির মাধুর্য অনস্বীকার্য, বিশেষভাবে 'শেষ বসন্ত' কবিতাটিতে পথিক কবির ক্ষণিকতা-বিলাসী মর্মের অপূর্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'আকন্দ' নামে গীতিকবির একটি সাধারণ মুহূর্ত কার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েছে কে জানে? পূরবী থেকে মহুয়ায় এই ধরণের কবিতার সংখ্যা বেশি, এবং পরের কয়েকটি কাব্যে এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মহুয়ায় কতকগুলি ফরমায়েশি কবিতা এবং নিছক 'প্রসাধনকলা'র কতকগুলি কবিতা (যেমন 'নাম্নী' শ্রেণীর কবিতাগুলি) সম্পর্কে কবি স্বয়ং অতিশয় সচেতন (রচনাবলী, গ্রন্থ পরিচয় দ্রঃ)। কিন্তু বহিঃ-প্রেরণার তাগিদেও এমন কবিতা সৃষ্ট হয়েছে যেগুলি পূর্বাপর মিলিয়ে এই দ্রষ্টা কবির পরিণত উপলব্ধির সঙ্গে একত্র আস্বাদন করা যায়; স্বতঃপ্রেরিত কবিতার তো কথাই নাই। এ সম্পর্কে কবি পূর্ব থেকেই আমাদের ধারণার অনুকূলেই সায় দিয়ে রেখেছেন দেখতে পাই—'মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে গেছে।' এদের মধ্যে কবি-প্রতিভার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল কবিতাগুলিই বস্তুতঃ আমাদের দর্শনীয় হবে।

পূরবীর উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি পাঠ করলে কবির নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবণতার সঙ্গে পরিচয় হয়। এক, নিরাসক্ত মন নিয়ে মর্তের প্রেম ও সৌন্দর্যের আস্বাদন, দুই, রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কাব্যরসাস্বাদের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ, তিন, মর্তের দৃশ্য সৌন্দর্যের অন্তরালে তথা কবির অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি ঐক্যসত্তাকে উপলব্ধি করার ব্যাকুলতা ও অসম্পূর্ণতাবোধে হতাশ্বাস। এগুলির সঙ্গে কোথাও কোথাও অতি ক্ষীণভাবে বিজড়িত রয়েছে কবির পূর্বজীবনের বেদনা-মধুর স্মৃতি। গীতালি-বলাকার কালের কবির নব-উপলব্ধ আত্মপরিচয় ও বিশ্ব-পরিচয়ের মধ্যেই কবির উপরিউক্ত প্রবণতাগুলির মূল নিহিত রয়েছে। আর সম্ভবতঃ যান্ত্রিকতাময় কর্মজীবন এবং সাময়িক অসুস্থতা প্রতিঘাত দিয়ে কবির চিত্তকে 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল' দিনগুলির স্মৃতিতে নিয়ে গেছে এবং যাত্রার আনন্দের সঙ্গে বেদনা বিজড়িত

করেছে। পূরবীতে কবি যে একেবারে সোনারতরী-যুগের রোম্যান্‌টিক স্বপ্নাবেশের ও মর্ত-প্রেম-বিহ্বলতার কবি হয়ে উঠেছেন তা নয়, পুরানো দিনের স্মৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ জেগেছে মাত্র। বস্তুতঃ পূরবীর প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রসাস্বাদের স্পৃহা চলার পথের অরূপ-রসাস্বাদ বিশেষ, যা একালের 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গে'ও অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু পুরবীর ক্ষীণ বেদনাময়তার পশ্চাতে তৎকালীন ব্যক্তিগত বাস্তবতা অথবা পূর্বস্মৃতি যে-ধারণাই আরোপ করা যাক না কেন, ঐ অসম্পূর্ণতার নিমিত্ত হতাশ্বাসের দিকটি একালের কবি-কল্পনার মধ্যবর্তী ব'লে প্রণিধান করতেই হবে। এই হতাশা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে কবির ধারণা বলাকায় উপলব্ধ পরিবর্তন ও পরিণামের দ্বন্দ্ব থেকে উৎপন্ন। কবির যাত্রা-অনুভূতির সঙ্গেই কোনো গোপন সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির প্রয়াস ও না-পাওয়ার বেদনা, সুতরাং পরিচয়ের অসমাপ্তিজনিত হতাশা, কবিকে আবিষ্ট করেছে। এই বেদনাই নানাভাবে কয়েকটি কবিতায় যাত্রার আনন্দের সঙ্গেও একত্র প্রকাশ পেয়েছে।

এই কাব্যটির ভূমিকারূপে উপস্থাপিত 'পুরবী' নাম্নী কবিতাটির মধ্যে কবি চলার সঙ্গে উপভোগের আন্তরিক সমন্বয় সাধন করেছেন। এ আনন্দ নিরাসক্ত, কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে চিরন্তন সঞ্চয়রূপে গ্রহণ করতে চায় না। 'এই যা দেখা, এই যা ছোঁয়া, এই ভালো, এই ভালো।' এ যেন বলাকার সেই শ্রেষ্ঠধন—'না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার, সেই তো তোমার।' আবার খেয়া ও গীতাঞ্জলির প্রয়োজনবাসনামুক্ত অরূপানন্দের এ যে সগোত্র তাতেও সন্দেহ নেই, যেহেতু 'বকুলবনের পাখি' কবিতায় কবি স্পষ্টভাবেই বৈরাগ্যময় মুক্তির কথা জানালেন—

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্তি যাক না ঢাকি।

কবির এই সাধকোচিত বৈরাগ্য-মনোভাবের পরিচয় গোধূলি-পর্যায়ে শেষ সপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতি কাব্যে যে আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা পরে দেখতে পাব।

'যাত্রা' কবিতাটিতে কথিত অজ্ঞাত পথিকদের পথে যদ্যপি বিষাদের কুহেলিকা এবং ভঙ্গিতেও 'চক্ষু ছলছল' তথাপি কবি যাত্রার আহ্বানে অজানার পথে অবশ্যই চলবেন, কারণ কবির বিশ্বাস এ জীবনের পরিসমাপ্তিতেই আনন্দবোধের পরিণাম নয়। এই কবিতাটির নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে ভাবে ও ভঙ্গিতে বলাকার তের সংখ্যক (যৌবনের পত্র) কবিতার অপূর্ব কবিত্বময় উপসংহার একান্তভাবে তুলনীয়—

যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধ শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রাণীর স্বয়ংবরমাল্য-সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গন-দ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা

নন্দনমন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকরপাঁতি
গেছে উড়ি মর্তের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।

(যাত্রা)

স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।

(যৌবনের পত্র)

মর্তজীবনের উপলব্ধির অপূর্ণতার বেদনা পুরবীর কয়েকটি কবিতার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষভাবে ঐক্যসত্তার অনুসন্ধানমূলক কবিতাগুলির মধ্যে, কোথাও পরিস্ফুটভাবে, কোথাও অপরিস্ফুটভাবে। যেমন—ক্ষণিকা, তারা, আহ্বান, সাবিত্রী। 'বকুলবনের পাখি' কবিতাটিতে যাত্রার নিশ্চয়তার সঙ্গে পূর্বস্মৃতি ও দূরে চ'লে যাওয়ার বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে—

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি।
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি,
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি।
কিছু কি থাকে না বাকি।
বালক গিয়াছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে?

এই অংশের সঙ্গে প্রথম যৌবনে লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতার উপসংহারের বেদনার দিকটি 'তাহাদের প্রেমে কিছু কি রবনা আমি' ইত্যাদি তুলনা ক'রে একালের নব-উপলব্ধির সঙ্গে বিজড়িত গতি-মনোভাবের বৈপরীত্যও স্মরণযোগ্য—

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
মুক্তির টীকা ললাটে দাও তো আঁকি।

* * *

ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

এই শ্রেণীর বেদনা-মাধুর্যের সঙ্গে যুক্ত 'খেলা' ও বহুশ্রুত 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায় যে-নারীমূর্তি কবির গোচরীভূত হয়েছেন তিনি তাঁর পূর্ব কাব্যজীবনের বিদেশিনী বা মানসসুন্দরী। কবির কল্পনা অনুসারে ইনি কবির সৌন্দর্য-অনুভূতি, সুদূর-ব্যাকুলতা ও অরূপের লীলার সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ সাধন ক'রে এসেছেন। তাই ইনি লীলার সঙ্গিনী মাত্র। 'পূরবী'তে যাত্রার বেদনার সঙ্গে কবি যখন মর্তের বিশুদ্ধ আনন্দ-রস আস্বাদনের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছেন তখন স্বভাবতই লীলা-সহচরী তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে। ইনি কবির ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের সংবাদ রাখেন না, অতীন্দ্রিয় কল্পনাগুলির পরিপুষ্টিতে সহায়তা করেন। তাই দেখা যায় এ সঙ্গিনীর চরিত্রবর্ণনার মধ্যে পূর্বেকার মানসসুন্দরীই দেখা দিয়েছেন, যিনি কবির পুঁথিপত্র ফেলে দিয়ে কর্মমুক্ত ক'রে তাঁকে নিরুদ্দেশ সুদূরের সঙ্গে যুক্ত করতেন—

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার কঙ্কণঝংকারে।

......কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষকোণে।
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলাপ্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে—
অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে।

এর সঙ্গে প্রথম কাব্যজীবনের নিসর্গাশ্রিত সৌন্দর্যময়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন মানসসুন্দরীর প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে হবে। কবিতাটির শেষাংশের 'গোপনরঙ্গিণী', 'রসতরঙ্গিণী', 'নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে' 'চিনি যে তোমারে চিনি' প্রভৃতি বর্ণনা থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে ইনি কেবল কবির নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যেরই সঙ্গিনী নন, উৎসর্গের সুদূরের চকিত স্পর্শ এবং খেয়া ও শারদোৎসব প্রভৃতির প্রাথমিক অরূপানুভূতিরও অকথিত সহচরী। কবির অরূপ-ব্যাকুলতার বিস্তৃত অধ্যায়টার মধ্যে গোপন থেকে বলাকার বৈরাগ্য-মূলক তীব্র জীবনবোধে প্রতিহত হয়ে পূরবীর রসানুভূতির কালে ইনি স্বাভাবিকভাবেই কবির কাছে পূর্ব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছেন। তাই কবি বলছেন—

সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।

কিন্তু কবির এখনকার চলার অনুভূতি এবং উপলব্ধির অসম্পূর্ণতার বেদনার সঙ্গে বয়ঃসুলভ বিদায়ের মনোভাব মিশ্রিত হয়ে কবিতাটীতে করুণরস সঞ্চার করেছে—

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির
শেষরাগিণীর বীন।

তথাপি দেখা যায়, জীবন-উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত কবি মর্ত থেকে বিদায়ের বেদনা অতিক্রম করতে চাইছেন এবং তাঁর সঙ্গিনীর এই অসময়ের আহ্বানের একটা অর্থ উপলব্ধি করছেন—

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।

এর সঙ্গে 'পদধ্বনি' কবিতার "ডাক' মোরে কী খেলা খেলাতে আতঙ্কিত নিশীথ বেলাতে" এবং সানাইয়ের 'বিপ্লব' কবিতার 'হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিতকঙ্কণে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি তুলনার যোগ্য এবং এই 'লীলাসঙ্গিনী' বীথিকা, সানাই প্রভৃতি শেষজীবনের কয়েকটী কাব্যে কবির কাছে পুনঃপুনঃ কোন্‌রূপে দেখা দিয়েছেন তাও লক্ষণীয়।

লীলাসঙ্গিনীর কল্পমূর্তি কবির বিভিন্ন বিকাশশীল লীলানুভূতির যোগসাধয়িত্রী হ'লেও সৌন্দর্য, সুদূর বা অরূপের সঙ্গে ইনি একাত্মও হয়ে পড়েছেন। কবির সমস্ত অনুভূতিই একান্তভাবে কল্পনাশ্রিত ব'লে সুদূর-রসের সঙ্গে ঐ রসেরই কল্পিত রূপের পার্থক্য কোথাও কোথাও স্বাভাবিকভাবেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এইজন্যে উৎসর্গের 'জ্যোৎস্নানিশীথে, পূর্ণশশীতে দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে' প্রভৃতির মধ্যে রূপাশ্রিত রসানুভূতি বা রসাশ্রিত রূপদর্শন যেমন এক হয়ে পড়েছে তেমনি পুরবীর এই কবিতাটিতেও 'ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে, ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে' প্রভৃতির মধ্যে লীলা ও লীলার কল্পিত সহচরী এক হয়ে পড়েছে।

'মানসসুন্দরী' বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'তে অথবা চিত্রার 'জ্যোৎস্না রাত্রে' 'পূর্ণিমা' বা 'উর্বশী' কবিতাতেও কল্পিত রূপ ও উপলব্ধ রস সমবায়-সম্বন্ধে উদ্ভূত হয়েছে। এইজন্যই পরের আলোচ্য 'পদধ্বনি' কবিতার যাত্রামূলক অরূপানুভূতি ও লীলাসঙ্গিনীর ইঙ্গিতের মধ্যে পার্থক্য নেই এবং 'আহ্বান' কবিতায় কবি যেখানে সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত একক সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার আগ্রহে অধীর হয়েছেন সেখানে সহজেই ঐ কল্পিত সত্তা কল্পিত নারীরূপে দেখা দিয়েছে—
'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।'

কবির একটী ব্যক্তিগত বাস্তব উপলব্ধি তাঁর রুগ্ন অবস্থায় ঘটেছিল এবং কী প্রকারে তা (একটু পরের লেখা হ'লেও) 'পদধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিবৃত হয়েছে। 'পদধ্বনি' কবির নিবিড়তম উপলব্ধির একটী শ্রেষ্ঠ কবিতা। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করলে মনে হয় যাঁর পদধ্বনি কবি শুনছেন ব'লে কল্পনা করছেন (সেই অরূপকে) 'লীলাসঙ্গিনী' রূপে পূর্বে তাকেই লক্ষ্য করেছেন—

ডাক' মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে।
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে।

যে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার উৎসাহ কবি পূর্বে বার বার প্রকাশ করেছেন, অস্ফুট শঙ্কামিশ্রিত আনন্দে কবি কিভাবে তাকে অতি বাস্তব অনুভূতির মধ্যে গ্রহণ করছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়—

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
অজানার যাত্রী কে গো। ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।

সঙ্গে সঙ্গে কবি উপলব্ধি করলেন এ সেই পূর্ব-পরিচিত অরূপের আহ্বান, পরিবর্তনশীলতাই যার রূপ, আসক্তিমোচনই যার অভিপ্রায়—

এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে।

কবি এই অনিশ্চিত সুতরাং ভয়ংকর যাত্রার মর্মে আত্মকথা বিবৃত করছেন—

ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসানখেলায়।

কিন্তু এর লীলার স্বরূপ কবি পূর্বেই (অর্থাৎ বিশেষভাবে গীতালি-বলাকা-ফাল্গুনীতে) উপলব্ধি করেছেন, তাই উৎসাহ সহকারে বলছেন—

হোক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারংবার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন ক'রে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ;

এই আশ্বাসবাণীই যদিচ কবির চিরন্তন সহায় তথাপি বাস্তব উপলব্ধির ক্ষেত্রে কবিচিত্তে একদিকে বেদনার সঞ্চার হয়েছে এবং আর একদিকে অসম্পূর্ণতাবোধও কবিকে পীড়িত করেছে।

পূরবীর কয়েকটি কবিতায় কবি একান্তভাবে আত্মমুখী হয়ে উঠেছেন। যে প্রজ্ঞালোকে কবি এতাবৎ একটি সর্বহৃদয়-সংবেদ্য ভাব

(তা অরূপ সম্পর্কেই হোক বা গতিশীলতা সম্পর্কেই হোক) আস্বাদন করেছিলেন তাকে যেন ফিরিয়ে এনে এখন নিজের জীবনে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন। এগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিলাসও নেই, ঠিক পুর্বেকার অরূপ বা যাত্রা বা গতির কথাও নেই। এ যেন একটা বিশেষ আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ। এগুলিতে বরঞ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তরালবর্তী তথা অন্তরে উপলব্ধ একটি সামঞ্জস্য বা ঐক্যের তত্ত্বকে উদ্ঘাটন ক'রে দেখার প্রয়াস এবং সেই সত্যকে না জানার বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এরকম আত্মতত্ত্ব বা ঐক্যতত্ত্ব দর্শনের অভিলাষ অবশ্য প্রথম বলাকাতেই লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
—ইত্যাদি (২৯ সং)

অথবা—

হে ভুবন,
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন
—ইত্যাদি (১৭ সং)

বলা বাহুল্য, এগুলি যে পরিমাণে তত্ত্ববোধ-পরিচায়ক হয়ে উঠেছে সে পরিমাণে কাব্য হয়ে ওঠে নি। কিন্তু পূরবীর আত্মদর্শনেচ্ছা ও আত্ম-বিশ্লেষণ উপযুক্ত ভাবাবেগের সহায়তায় কাব্যরূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই একান্ত মর্মমুখিতার কথা পূরবীর 'আগমনী' কবিতাটিতে কবি প্রথম ব্যক্ত করেছেন—

অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে, তাই তো লাগে ধাঁধা।

* * *

বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।

কবির এই মর্ম-বিচারের প্রকৃষ্ট পরিচয় 'আহ্বান' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে—'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার ফিরেছি ডাকিয়া।' কবি এখানে অনুভব করছেন যে বহির্বিশ্বে একটি ঐক্য-সত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনিই কবির আত্মাকে বারবার আহ্বান করছেন—

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।

কবি-আত্মা পার্থিব প্রয়োজনের জীবনে জড়ত্বের আবরণে সর্বদাই আবৃত রয়েছে। যখন বাহিরের এক কবির অন্তরের এককে জাগিয়ে তোলে তখনই সম্ভবপর হয় কবির প্রজ্ঞামূলক আত্মদর্শন। আর তখনই নিশ্চল কবিমানস চঞ্চল হয়ে ওঠে, ভাবাবেগে স্পন্দিত হয়, জন্ম হয় কবিতার। নৃত্যচ্ছন্দ-মুখর কবিতা বস্তুতপক্ষে আত্ম-প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি,—
"আছি আমি আছি।"

সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াসা ফেলে টুটি
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে ;
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্যকলরোলে।

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি থেকে ইটালীয় দার্শনিক ক্রোচের 'আত্ম-প্রকাশই কাব্য' এই তত্ত্ব প্রমাণ করা যায়। বাহিরের এক এবং অন্তরের একের মিলনে কবির জড়ত্বের আবরণযুক্ত অসাড় চৈতন্য যে উন্মীলিত হয় এবং তখনই যথার্থ কাব্যোপলব্ধি ঘটে এই কথাটি সাহিত্যের বিচার প্রসঙ্গেও কবি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঐ আত্মপ্রকাশ বা আত্মোপলব্ধি এবং ব্রহ্মোপলব্ধি অবশ্য এক, সহোদর নয়। সাহিত্যবিচারমূলক নানান্ প্রবন্ধে কবি আমাদের মানবীয় অস্তিত্বের একেবারে মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন, স্থতরাং সে সকল স্থানের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ব'লে মনে করি। "আমি আছি" এর ব্যাখ্যা তাঁর ঐ সাহিত্যিক আলোচনা-গুলিতেই পাওয়া যাবে,—

'আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন।...আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানাভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎস্থক হয়ে থাকে।......শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব।...... আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর

প্রবাহিত হচ্ছে বস্তুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে ; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।' (সাহিত্যতত্ত্ব—সাহিত্যের পথে)

'বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।' (ঐ)

'আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি, কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি।......কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর পুজাপাত্রে বিচিত্র রেখায় যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়।'

(তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে)

'গোলাপ ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় ব'লে এর নাম দিই আনন্দরূপ।' (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ কথিত এই দুই একের মিলন হ'ল আলংকারিকদের কথিত রসাবস্থা। রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যের জড়ত্ব থেকে মুক্তি এবং আনন্দরূপের প্রকাশ হ'ল আলংকারিকদের 'চিদ্‌গত আবরণ ভঙ্গ' এবং সত্ত্বগুণের স্ফুরণে 'প্রকাশানন্দচিন্ময়' অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি এবং মানবীয় আনন্দবোধের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারেন ব'লে আলংকারিকদের মাত্র দার্শনিক তত্ত্বটুকুর সঙ্গে কবির সম্পূর্ণ মিল নেই।

বলা বাহুল্য, কবি 'আহ্বান' কবিতায় বিস্ময়সহকারে বিশ্বের সঙ্গে নিজ অস্তিত্বের নিবিড় যোগের স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন এবং সেই উপলব্ধ বহিঃসত্তাকেই কল্যাণী, দূতী, নারী প্রভৃতি ব'লে সম্বোধন করেছেন। একে জীবনদেবতা ব'লে মনে করা ভ্রমাত্মক হবে। জীবন-দেবতা কবির অন্তর্লোকের অধিবাসিনী কল্পিত চালক-শক্তি, যিনি কবির বহুবিধ উপলব্ধিকে সমঞ্জীসভূত ক'রে কবিকে একটি পরিণামের পথে নিয়ে গেছেন। তিনি চিত্রার পর্যায়েই দর্শন-গোচর, অন্যত্র নন, কারণ, কবি-প্রতিভা তার বিকাশের প্রারম্ভেই বিস্ময়ের সঙ্গে একে প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন বোধ করেছিল। তিনি একান্তভাবে কবির ব্যক্তিগত জীবনের চালক। অথচ এখানের এই কল্পিত নারী বহির্লোকবাসিনী, কবির অন্তরে অভিসারের জন্যে অবসর খুঁজছেন। অর্থাৎ ইনি সেই অরূপমাত্র, নিসর্গ যাঁর বহিরাবরণ, যিনি কাব্যবপুঃ, সুন্দরীর রূপে কল্পিত হয়েছেন মাত্র। নিম্নলিখিত ব্যাকুলতাপূর্ণ আবেদনে কবি যা চেয়েছেন তার অধিক তাঁর কাছে আর কী চাইতে পারেন ?—

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ।

কবি একক সত্তাকে কাব্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তরের এক এবং বাইরের এক এই দুই রূপে ভাগ ক'রে দেখলেও এদের মধ্যে ভেদরেখা টানা কঠিন। বস্তুতঃ কবির অন্তরের এক বা আত্মার মাধ্যমেই তিনি বাইরের একের কল্পনা করছেন এবং নিজ অন্তরের মধ্যেই আত্মার

জাগরণ কামনা করছেন। ক্রোচে কাব্যোপলব্ধি সম্পর্কে এইরকম ধারণাই পোষণ করেন, এবং রবীন্দ্রকাব্যের অন্যত্র যাই হোক এখানে আমরা ঐ তত্ত্বেই কবিকে ভালভাবে পেতে পারি। অন্তরাত্মার জাগরণে কল্পিত বাইরের একের মাধ্যমে কবি 'চরম আহ্বান' বা আত্মদর্শন লাভ করতে ইচ্ছুক, এবং যতক্ষণ না তা আসে ততক্ষণ কবির বেদনাময় ব্যাকুলতার সীমা নেই—

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান।

হয়ত সাধক কবি মনে করছেন এতদিনেও যথার্থ আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেনি। এরকম অসম্পূর্ণতার উপলব্ধি পরিণাম-অভিলাষী কবির পক্ষে স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। কবি চান স্বার্থ বা অহং বলতে কিছুই না রেখে নিঃশেষে আত্মদান। সেই অতি-প্রত্যাশিত মুক্তির চরম আনন্দ উপলব্ধি হয়নি ব'লেই কবিতাটির শেষে কবি বেদনায় অধীর হয়ে উঠেছেন। চরমতম সত্যকে কি মর্তদেহে আবিষ্কার করা যায়? কিন্তু যেহেতু তা-ই কবির অভিলাষ সেইহেতু কবি শুধু ইঙ্গিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। সেই জন্যে একান্তভাবে আক্ষেপ করছেন—

জানি জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।

*　　　*　　　*

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।

'ক্ষণিকা' কবিতাটিতে সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত এই চরমতম সত্যকে

দেখার ব্যাকুলতা ও না-পাওয়ার বেদনা অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। সম্ভবতঃ পূর্ব-উপলব্ধ সৌন্দর্য-বিহারী অরূপের কথা মনে ক'রেই কবি বলছেন—

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।

কবি ভেবেছিলেন বস্তুতান্ত্রিক জীবনের মালিন্যের মধ্যে সেই অরূপের প্রেরণা লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কবি আশ্বস্ত হলেন এই দেখে যে তিনিই গোপনে কবির গানের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করছেন, তিনিই সমস্ত সংগীতের অভিপ্রেত বস্তু—

আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;

কিন্তু যেহেতু কবি ইঙ্গিতে অনুমানে তাঁর পরিচয়ে সন্তুষ্ট নন, সেই হেতু বহির্জগতের 'বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজাল' তাঁর কাছে সাময়িকভাবে এ বিষয়ে বাধা-স্বরূপই প্রতিভাত হয়েছে। চরমতম সত্যকে নিঃশেষে জানার আগ্রহই কবিকে এবংবিধ কল্পনায় প্রবর্তিত করেছে। তাই আক্ষেপ সহকারে কবি এখানেও বলছেন—

গেল না ছায়ার বাধা; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা; সে মূর্তি ফিরেছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

এই ছায়ার বাধা দূর করার প্রচেষ্টাই তো যথার্থ সাধকের চিরন্তন প্রচেষ্টা। সাধক রামপ্রসাদ তাঁর দৃষ্টির অন্ধত্বের জন্যই ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন

—'একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত'। উভয় কবির অন্তরতম অভিলাষ এক, ভঙ্গিতে মাত্র পার্থক্য। 'শেষ', 'তারা' প্রভৃতি কবিতাগুলিও কবির এই আন্তরিক প্রার্থনার বাণীতে মুখর—

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।

(শেষ)

আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই।

*   *   *

ফিরে যাবার সময় হ'ল, তাই তো চেয়ে রই—
আমার তারা কই। (তারা)

কবির অন্তরের এই না-পাওয়ার ব্যথা অবশ্যই আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে। যে অরূপকে কবি তাঁর কল্পনাবলে সৃষ্ট নিবিড় রসোপলব্ধির মুহূর্তগুলিতে পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকে এখন জীবনের মধ্যে আরো প্রত্যক্ষভাবে পেতে চান ব'লেই কি কবির চিত্তে এই বেদনাময় আক্ষেপের সঞ্চার হয়েছে?

'সাবিত্রী' কবিতাটিতেও কবির সত্য-নিরীক্ষণের অভিলাষ বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশলাভ করেছে। যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের আত্মা সূর্যের মধ্যে কবি এই সত্যকে দেখতে চান। সৃষ্টির অন্তরতম রহস্য এই জ্যোতির কনক-পাত্রের আবরণে আবৃত রয়েছে, উপনিষদের ঋষির এই ধারণা তাঁদেরই মত ব্যাকুল এক কবিকে সূর্যের অভ্যন্তরে রহস্যানুসন্ধানের প্রেরণা দিয়েছে। এখানেও তীব্র অভিলাষটি কবির স্বকীয়; ঈশোপনিষৎ এর 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বে পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥' মন্ত্রটি আধারের অর্থাৎ ঐ অভিলাষের রূপকের কাজ করেছে। কবি প্রবল আবেগ সহকারে বলছেন—

ঘন-অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।

এ দুর্যোগ শুধু তাৎকালিক বহিঃপ্রকৃতির নয়, কবির অন্তরেরও বটে। কবি তাঁর চেতনার জড়ত্ব ও অসাড়তা বোধ করছেন। সমগ্র কবিতাটি কল্পিত বিদায়ক্ষণের অভিলষিত উপলব্ধির আগ্রহে পূর্ণ।

এই শ্রেণীর 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে বিরহী সাধক একক স্পষ্টভাবে জানার আগ্রহ থেকে বিরত হয়ে কবিসুলভ স্বপ্নের মধ্যেই আত্ম-নিয়োগ করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত বেদনা-বিচ্ছুরিত কবিতাগুলিতে যদি রূপকে বাদ দিয়ে রূপাতীতকে জানার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে, এই কবিতাটিতে পরিচিত পার্থিব স্বপ্নাবেশের মধ্যে সুদুর্লভ মুক্তির আনন্দলাভে অপরিসীম সন্তোষের কথা প্রকাশ পেয়েছে। সাধনলভ্য সর্বদ্বৈতবিনির্মুক্ত এক এবং তার লীলার অনুভূতির মধ্যে কবি স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়টির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছেন। বাস্তবে পরিচিত সুতরাং তত্ত্বতঃ অপরিচিত কোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্য ক'রে কবি তাঁর নিম্নলিখিত মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন—

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো, সত্য সে কি।"

*   *   *   *

আমি বলি, স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে।
যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।
সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন—
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।

নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ কভু হেলা।

মানুষের মধ্যে যে অন্তরতম মানুষ রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ জানা নাইবা গেল, তার লীলাস্বপ্নে কবি আনন্দময় মুক্তি পেতে চান। কিন্তু এখানে কবি বিশ্বে ঐ একের অপ্রকাশের একটা কারণও নির্দেশ করতে চান এবং বলতে চান যে তাঁর স্বপ্নে আভাসে ইঙ্গিতে এর যতটুকু প্রকাশ পায় তাই তাঁর যথেষ্ট—

অমৃত যে হয়নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন,
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলনছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমায় লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে—
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।
আমি জানি, সত্য তাই—
মরণদুঃখে অমর জাগে অমৃতেরই তত্ত্ব তাই।

লক্ষ্য করতে হবে একক সত্তা এবং তার মায়াশক্তি বা লীলার ধারণাতে কবি ভারতীয় ভাবসাধকের সগোত্র, কেবল উপলব্ধির পন্থাতেই পৃথক। কবি যথাভূত মানবীয় জীবনের মধ্যেই অরূপকে পেতে চান এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এবিষয়ে অন্যত্র লেখা বহু কবিতা ও গানের সঙ্গে পূরবীর 'মুক্তি' কবিতাতেও 'লীলারস উপলব্ধির আনন্দে' মুক্তির তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন—

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।

*　　*　　*

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
স্থরের ভঙ্গিতে,
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।
সেদিন বুঝিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন ;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
—ইত্যাদি

এই মুক্তি জীবনকে যথার্থভাবে গ্রহণ করার মুক্তি, নিরাসক্তভাবে পথে চলার মুক্তি, নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে যোগদানের মুক্তি, স্বার্থবিসর্জনময় মানবীয়তাবোধের মুক্তি।

পূরবীর মধ্যে গ্রথিত 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের, ব্যক্তির সুখ ও দুঃখের অন্তরালবর্তী আনন্দময় একের লীলা-উপলব্ধি বিষয়ক। ফাল্গুনী ও বসন্ত ঋতুনাট্যে কবি পূর্বেই এই লীলারহস্য বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। 'পূর্ণ থেকে রিক্ত এবং রিক্তের থেকে পূর্ণ এরই মধ্যে ওর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা,—এও যেমন এক খেলা, ও-ও তেমনি এক খেলা।' বস্তুতঃ এ ধারণা কবির অরূপানুভূতির সঙ্গে যুক্ত মৌলিক ধারণা এবং খেয়া-গীতাঞ্জলি থেকে নানাভাবে এই ধারণাটিই সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ঠিক এর পরেই কবি যে-নটরাজের চিত্র কল্পনা করেছেন এই কবিতাটিতে তার সূচনা রয়েছে। কবিতাটি রূপে ও রসে বস্তুতঃ নটরাজ-ঋতুরঙ্গ পর্যায়ের। কিন্তু যেহেতু গীতরসহীন কবিতাটিতে কেবল নৈর্ব্যক্তিক লীলার উপলব্ধিই বর্ণিত হয়নি, কবির আত্মবিবৃতিও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে সেইজন্যেই সম্ভবতঃ এটিকে কাব্যের

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কবিতাটির প্রারম্ভে কবি ব্যক্তিগত বিষাদের প্রশ্নই তুললেন—

> যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
> হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
> হে ভোলা সন্ন্যাসী ?

কিন্তু সুখ ও দুঃখ এই দুই আপাতদৃশ্য বিরোধের মধ্যে ঐক্যরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবি দুঃখের চিরস্থায়িত্বে অবিশ্বাস করলেন—

> নহে নহে আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
> নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সংবরিয়া
> রাখ সংগোপনে।

এ হ'ল মহেশ্বরের তপস্যার রূপ। নটরাজের বামপদক্ষেপের নৃত্য। এখন তিনি রুদ্র, শংকর, ভয়ংকর। বহিঃপ্রকৃতির শীতাতপের শুষ্কতা, ধূসরতা, দাহ, বজ্রপাত, প্লাবন এবং মানব সমাজের ক্ষতি, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি হ'ল তাঁর প্রকাশের বিশ্বগত মূর্তি। সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত এই দুই রূপের মাধ্যমে একক সত্তার উপলব্ধি কবির স্বকীয়, অন্যকর্তৃক অপ্রভাবিত। এইখানেই রবীন্দ্র-কবি-মানসের অপূর্বতা, তাঁর কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার অসামান্য দান। স্বতঃ-উপলব্ধ এই রসতত্ত্বটি 'খেয়া'র সময় থেকে আরম্ভ ক'রে কী ক'রে জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি চিরন্তন সত্য-উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে তা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করবার বিষয়। এখানে কবি আর মাত্র রোম্যান্টিক ভাববিলাসী নন, উচ্চতম ভারতীয় স্বপ্নদ্রষ্টা ভাব-রসিকদের সঙ্গে একাত্ম। কবি তাঁর স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে কতদূর নিঃসংশয় তা নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।

কবি এই মিথ্যা দুঃখমূর্তির মধ্যেকার ছলনা ধ'রে ফেলেছেন। এ যেন—

'আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি'
(রামপ্রসাদ)

কবি বলছেন—

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগি, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণেবশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

সত্য-উপলব্ধি সম্পর্কে কবির এই সন্দেহাতীত মানসিক অবস্থার পরিচয় সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ছলনা কেন? কেন মানুষের এই দুঃখভোগ? তার উত্তরে কবি বলছেন—লীলা। লীলারসের নিবিড় উপলব্ধিতে মুক্তির আনন্দলাভ করবার জন্যেই এই আয়োজন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ত বলতেন 'নইলে রসের পোষ্টাই হয় না যে।' একই কথা। নিসর্গের মধ্যবর্তী এই লীলার কোন্‌দিক কবির শেষ আস্বাদন ও ধারণের যোগ্য হবে? বাহিরের আপাত দুঃখের মূর্তি অথবা সুখের চঞ্চলতা? অথবা এ দুয়ের অতীত অন্তরের আনন্দময় সত্য-স্বরূপ? কবি বলছেন—

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী—
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।

ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে-ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি।

কবি তাই রসবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্য-শিব-সুন্দররূপ একের উপাসক।

কবি এই সত্যদর্শনকে বাঙ্ময় করতে গিয়ে যে ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা-ও অসামান্য এবং তা তাঁর পরিণত প্রতিভার উপযুক্তই হয়েছে। অক্ষরমাত্রিক ছন্দে দীর্ঘ পর্বের আশ্রয়ে ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দসংঘাতের মধ্য দিয়ে গোলাপের বাণী-ব্যাকুলতা থেকে যুগান্তের বিদ্যুদ্বহ্নি-বিকাশ পর্যন্ত সমান চাতুর্যের সঙ্গে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শব্দার্থের এই অদ্ভুত মিলন কাব্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। কবিতাটিতে কবির বিশিষ্ট উপলব্ধিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়েছে উমা-মহেশ্বরের রূপক যা কুমারসম্ভব কাব্য থেকে কবি আহরণ করেছেন, এবং এর রূপকে আবেষ্টন ক'রে আছে সংস্কৃতের মাধুর্য ও গাম্ভীর্যময় বাগ্‌ভঙ্গি— 'ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ।'

রবীন্দ্রকাব্যের নানান্ ক্ষেত্রে রূপসৃষ্টিতে, বিশেষতঃ বাণীরূপে সংস্কৃতের প্রভাব একটি লক্ষণীয় ঘটনা। এই প্রভাবের বিষয়ে 'সমগ্রগুণ-গুম্ফিতা' বৈদর্ভী রীতির নিয়ন্তা কালিদাসও আছেন, কোমলকান্ত-বাণী-বিলাসী জয়দেবও আছেন। এদের সঙ্গে একটি তৃতীয় শক্তি— বাংলা লোকসংগীতের চাতুর্যহীন প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষা মিলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি স্বকীয় স্টাইলের সৃষ্টি করেছে। বিষয় এবং উপলব্ধি অনুসারে উপরিউক্ত ভাষাভঙ্গিগুলির প্রকাশের অল্পবিস্তর তারতম্য এবং একতরের প্রাধান্য ঘটেছে মাত্র। যেমন বলা চলতে পারে যে গীতালি, ফাল্গুনী প্রভৃতির গানে বাউল সুরের তথা ভাষার প্রকাশ,

নটরাজ-ঋতুরঙ্গে ধ্বনিময় সংস্কৃত রীতির, মহুয়ার 'সাগরিকা' কবিতায় আদিরসের সঙ্গে জয়দেবীয় ভাষাবিলাসের অনুবর্তন।

ঋতুনাট্যগুলির ভূমিকা-অংশে এবং কথোপকথনের মধ্যে একটি প্রাচীন পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টিতে সংস্কৃত নাটকাদির ছাপ বিশেষভাবে পড়েছে। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবিদের কাব্যে ও নাট্যে (বিশেষতঃ কালিদাসের রচনায়) ঋতু-প্রকৃতিকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। নিসর্গপ্রেরণাজাত ঋতুনাট্যগুলিতে পাঠকের মনকে প্রাচীন কালে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে আধুনিক ব্যবহারিক জীবন ভুলিয়ে কবি এক প্রকার অনির্বচনীয় কাব্যরস সঞ্চার করতে চান। সেই কালের রাজা, মন্ত্রী, রাজকবি, নাট্যাচার্য প্রভৃতি দর্শকের চিত্তকে এমন ভাবে প্রাচীন কাব্যলোকে নিয়ে যায় যে প্রকৃতি-রস-আস্বাদন অব্যাহতভাবে নিষ্পন্ন হয়। পরবর্তী কালে তপতী-নাটক রচনায় সংস্কৃতের আবহাওয়া কবি তাঁর অভিপ্রেত রসনিষ্পত্তির উপযুক্ত অলংকাররূপে অতিশয় নৈপুণ্য-সহকারে ব্যবহার করেছেন। কবির প্রাচীন-ধর্মী মণ্ডন-কুশলতা এই সব স্থানে এমন সর্বব্যাপী যে দর্শকের মনে হবে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নাটক দেখছি। কিন্তু ঋতু-নাট্যগুলির বিষয়বস্তু ও গানের মধ্যে এবং কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপে বাউল-সংগীতের ভাষারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। বাউল-সম্প্রদায়ের ভাবধারার সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের বিষয় আমরা কবির দার্শনিক মনোভাবের অনুসন্ধান পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। ভারতীয় সাধনার কোনো স্তরের সঙ্গে যদি কবির আত্মিক মিল থাকেই তা এই বাউলদের জীবন-সাধনার সঙ্গে একথাও তৎকালে উল্লেখ করেছি। ঋতুনাট্যগুলিতে সুরে বাউল এবং রূপে সংস্কৃত কাব্যের ও বাংলা যাত্রাগানের পদ্ধতির আশ্চর্য সম্মিলন পাঠকমাত্রকে চমৎকৃত করবে।

'মহুয়া' কাব্যে এসে পথিক কবির যাত্রা-বোধের স্পর্শ পুনরায় পাওয়া গেল। এবারে কিন্তু কবি প্রেমকে মানুষের সঙ্গী করেছেন, তাকে 'পথের ধুলা'র মধ্যে ফেলে রাখেন নি। মহুয়া কাব্যে এই প্রেমের আবির্ভাব অবশ্যই 'আকস্মিক'। কিন্তু তা ফরমাশের দীনতা থেকেও মুক্ত (রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে কবির পত্রে আত্ম-সমালোচনা দ্রঃ) এবং কবির কাব্য-সাধনা থেকে স্বতন্ত্র নয়। স্বাদে অভিনব, যদিও মর্মানুসরণে অভিন্ন। মহুয়ার নব-জাগরিত মানবপ্রেম বলাকার মতই রবীন্দ্র-প্রতিভার চঞ্চলতার অন্যতম উদাহরণ, কিন্তু রাবীন্দ্রিকতার মধ্যেই সার্থক। তাঁর প্রধান সমস্ত রচনা তাঁর প্রতিভার ঐক্যসূত্রে সমঞ্জসীভূত ব'লেই তা এত গভীরভাবে আনন্দদায়ক। কাব্যের মধ্যে বার বার একটি বিশিষ্ট কবি-বাণীকে লাভ করার পরমবৈচিত্রী রবীন্দ্ররসিকদের আনন্দের অন্যতম কারণ।

কবি মহুয়ায় দুই জাতের কবিতার বিষয় লক্ষ্য করেছেন। একের মধ্যে প্রণয়ের প্রসাধনকলা, অপরের মধ্যে সাধনবেগ। বলা বাহুল্য, সাধনবেগের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবিতাগুলিই মহুয়ার মুখ্য কবিতা, কারণ, এগুলির মধ্যে প্রেমকে ও প্রেমিককে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে দেখা হয়েছে। প্রৌঢ় কবির পরিণত প্রতিভায় রতি-ভাবের জাগরণ আকস্মিক হ'লেও, অসাধারণ হ'ল প্রেমকে জীবনের চলমানতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। চিত্রা-ক্ষণিকার প্রেমের কবি বর্তমানে একটি বিশিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক আদর্শবোধের সঙ্গে কী ক'রে প্রেমকে যুক্ত করলেন তার রহস্য মহুয়া-পুর্ব কাব্যজীবনেই রয়েছে। মুখ্যতঃ 'নাম্নী' শ্রেণীর কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর কল্পিত চিত্রাঙ্কনের কবিতাগুলিই প্রসাধনের কবিতা। এই নিছক আর্টের প্রেরণা কবির চিত্তকে এতখানি অধিকার করেছিল যে ভারত ও দ্বীপপুঞ্জের

সাংস্কৃতিক মিলনরহস্যকেও তিনি একটি অপূর্ব ললিত কলা-বিলাসে মণ্ডিত করেছেন। নায়ক-নায়িকার ব্যবহার আরোপ ক'রে জয়-দেবীয় বাণী-চাতুর্যে কবি পরপর যে কয়টি অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন তাতে সাংস্কৃতিক মিলনের ঘটনাকে অতিক্রম ক'রে রূপদক্ষ কবির শিল্পগুণই আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পুর্বেও কবি শুধু প্রসাধন-চাতুর্যের প্রেরণাতেই কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেছেন, যেমন কল্পনার 'দুঃসময়' কি ক্ষণিকার 'আবির্ভাব'—যেগুলির বিষয় আগেই উল্লিখিত হয়েছে। 'সাগরিকা' এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা।

মহুয়ার জীবনবেগ-স্পন্দিত ধূলি-ধূসর অ-কোমল বিলাস-সৌন্দর্য-হীন প্রেম সাধারণের চিত্তে আদিরসের আনন্দ দিতে পারে কি? যে-প্রেম কোনো সঞ্চয় রাখতে চায় না, যা বাস্তব জীবনকে ত্যাগ ক'রে ইন্দ্রের অমরাবতী রচনায় তৎপর নয়, বন্ধনহীন পথিকের সর্বনাশা সেই প্রেম কার বরণীয় হতে পারে? 'প্রেমের অভিষেক' এবং 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র † পাঠক মহুয়ায় এসে দম্পতির সতেজ কণ্ঠস্বরে শুনলেন—

† উক্ত কবিতা দুটির নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি 'মহুয়ার' উল্লিখিত 'সাধন-বেগ' সম্পর্কিত কবিতার যে-কোনো অংশের সঙ্গে বৈপরীত্যে তুলনীয়ঃ

হাত ধ'রে মোরে তুমি	দেবগণ,
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি	মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্	দূরস্বপ্নসম, যবে কোনো অর্ধরাতে
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,	সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,	পড়েছে চন্দ্রের আলো—নিদ্রিতা প্রেয়সী,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা	লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাইরে ঘরের লালন-ললিত-যত্ন।

যে ভীরু বালিকা একদিন 'জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে, শংকিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা' একটি আলোকোজ্জ্বল মিলনরাত্রির জন্যে উৎসুক থাকত সে আজ কোন্ প্রেরণাবলে বলতে পারে—

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।

তা চিন্তনীয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এক, রবীন্দ্র-প্রতিভার গতিশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র নির্ধারণ করা আর এক। বস্তুতঃ পূর্বেকার রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসও কাব্য, বর্তমানের জীবনবোধমিশ্রিত রস-প্রবণতাও কাব্য। অধুনা জীবন-যুদ্ধের তীব্রতার কালে প্রেমবোধের পরিবর্তন না হোক, ভঙ্গির বদল হয় নি কি? আধুনিক কোনো কবির মুখে সংগ্রামের সম্মুখীন, উচ্চকিত অথচ স্বপ্নাতুর নরনারীর কাছে বিলাস-বিরতির প্রার্থনা অস্বাভাবিক শোনায় কি? বাংলা প্রেমকাব্যে এই নূতনত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা অসামান্য দান।

বস্তুতঃ যুগোচিত রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিবর্তনশীল এবং পরিণামী প্রকৃতির মধ্যেই এরকম রচনা সম্ভবপর হয়েছে, এবং এমন কি অনাগত কালের সার্বজনীন অনুভূতিও যেন এই শক্তিশালী দর্পণে ধরা পড়েছে।

নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব-অর্থ-ভরা।

(প্রেমের অভিষেক)

গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর। দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

(স্বর্গ হইতে বিদায়)

তাই কবি-প্রতিভার পরিণামের কালে রতিভাবের উদ্বোধন যখন হ'ল তখন কবি গতিমুখর জীবনের মধ্যেই তাকে তুলে ধরলেন, জীবনহীন আরাম, বিলাস ও স্বপ্নের ধূলিতলে তাকে অনাদরে ফেলে রাখলেন না। বহির্জগতের গ্লানির স্পর্শে যে মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ, অশোভন রূঢ় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে মহৎ শক্তি অহরহ লাঞ্ছিত হচ্ছে তারই জয়গান কবি (বা কোনো প্রেমিক) প্রেয়সীর প্রেমের মধ্যে চাইলেন—

হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাকক্ষে করিনা আহ্বান ;—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

কবির এই জীবন-বোধ সুদৃঢ়, অরূপ-জীবন সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তা কেবল সাধারণ আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক নয়।

তপতী নাটক রচনার সময় 'ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু' প্রভৃতির মধ্যে বিলাসিতার গ্লানি থেকে কবি যে-প্রেমকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন তার প্রারম্ভ যেহেতু মহুয়া পর্বে, সেই হেতু সম্ভবতঃ তপতীর ঐ কবিতাটী 'উজ্জীবন' নাম দিয়ে মহুয়ার ভূমিকারূপে কবি স্থাপন করেছেন। পূর্বে কবি জীবনকে স্থূলতা ও বৈষয়িকতা থেকে মুক্ত ক'রে দেখেছেন, কারণ, কবির ধারণায় গতিই হ'ল জীবনের আত্মরূপ ; আর এখন প্রেমকে কামনা থেকে মুক্ত ও সংঘাতময় জীবনের গতির সঙ্গে যুক্ত দেখতে চান।

যাহা রূঢ় যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।

মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

* * *

সুখদুঃখবেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

মহুয়ার এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পড়তে পড়তে বার বার পিছনে বলাকার দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হয়। 'ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল,' 'মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে' প্রভৃতির যাত্রার চিত্রই মহুয়া-পাঠে ফুটে ওঠে। তফাৎ এই যে এবারের যাত্রা প্রেমিক ও প্রেমিকার; তখনকার যাত্রা নিঃসঙ্গ, এবারে মুক্তি-সাধনার সহায়ক প্রেম সঙ্গী, যদিও জীবন এবং পথের প্রকার উভয়ত্রই এক। 'নির্ভয়' কবিতাটিতে প্রেমকে স্পষ্টভাবে ঐ উচ্চে কবি তুলে ধরেছেন—

উড়াব উর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গমপথ-মাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।

'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতাটিতে প্রেমের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি উপলব্ধি ক'রেই কবি তাকে মৃত্যুঞ্জয় আখ্যায় অভিহিত করলেন। জীবনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের অপূর্ব কাব্য বা উপন্যাস 'শেষের কবিতা'য় কবি জীবনের চলমানতার মধ্যেই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেখেছেন। যে-প্রেম বদ্ধ করে না, মুক্ত

করে এবং স্বয়ং মুক্ত কবি তাকেই 'শ্রেষ্ঠ উপহার' ব'লে অভিনন্দিত করেছেন। পরিবর্তনের মধ্যে এই প্রেম সার্থক, অতএব তাকে চিরন্তনও বলা যায়, যেহেতু তা অপরের হৃদয়ে মুক্তিরসের সঞ্চার করে—

কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো সে দিবে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।

প্রেমের এই সক্রিয়তাই বলাকার 'ছবি', 'তাজমহল' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। এই সক্রিয়-গতিবেগসম্পন্ন প্রেমই মানুষের চলার সাথী হবার যোগ্য—'ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়', তাই তা একমাত্র অর্ঘ্য—'অপরিবর্তন অর্ঘ্য'—

সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে

লাবণ্যের দান এবং অমিতের গ্রহণের মধ্যে প্রেমের এই 'স্পর্শমণি' গুণের প্রকাশ হয়েছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে এবং অন্যত্র, যুগের বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকের প্রতিঘাতেও যে রবীন্দ্র-প্রতিভা স্বীয় আকার পরিগ্রহ করেছে তা আমরা বলেছি। বলাকা-গীতালির ক্ষেত্রেও যেমন এখানেও তেমনি বাঙালির স্থূল জৈব জীবন-যাত্রাই কবিকে গতিবাদী আদর্শ কল্পনার প্রেরণা দিয়েছে। এখানে কবি যে আরো স্পষ্টভাবে বাস্তবজীবনে বিচরণ করছেন, তার বর্ণনা কয়েকটি কবিতায়ই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন—

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—

অন্যত্র এই প্রেমকে জীবনের সঙ্গে এত সহজ ক'রে তোলা হয়েছে যে সহসা মনে হতে পারে প্রেম তার সমস্ত গৌরব হারিয়ে ফেলেছে বুঝি। কিন্তু তা নয়, জীবনের সঙ্গে সহজ হওয়াতেই তার গৌরব সূচিত হয়েছে—

মনে করাব না আমি শপথ তোমার
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবেসো যদি বেসো।

জীবনের মধ্যে প্রেমের এই সহজ স্থান দেওয়াই কবির মতে সবচেয়ে কঠিন। অন্তরে দীন ব্যক্তিই মানুষকে সর্বতোভাবে অধিকারের দাবী করে—

সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।

প্রেমের এই অভিনব মূর্তি আঁকতে গিয়ে কবিকে যে-প্রাকৃতিক পটভূমি সৃজন করতে হয়েছে তা অপূর্ব এবং তা পরিণত কবি-প্রতিভার যোগ্য হয়েছে। নূতন কল্পনাশক্তির সঙ্গে আলংকারিক

নববাগ্‌ভঙ্গির মিশ্রণে চিত্রগুলি পুর্বেকার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়েছে, যেমন—

'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্‌ড্রন্‌-গুচ্ছ'

অথবা—

'তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে'

কিন্তু নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতেই অদৃষ্টপুর্ব কবি-কল্পনার সঙ্গে রূপের মিলনের চমৎকারিত্ব সবচেয়ে বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে ;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে !
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, "মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।"
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি ।

মহুয়ার প্রারম্ভে প্রেমের উদ্বোধনস্বরূপ প্রথম-বসন্তের কবিতা এবং শেষে শেষবসন্ত চৈত্রের কবিতা। কবি বলছেন 'নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কাব্যের উপযুক্ত ভূমিকা' ব'লে নটরাজ-ঋতুরঙ্গ শ্রেণীর হ'লেও তিনি কবিতাগুলি মহুয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু 'বোধন' বা 'বসন্ত' কবিতার মধ্যে এমন একটি নূতন ভাব রয়েছে যা নটরাজের সগোত্র হ'লেও সেখানে তা বিশেষভাবে প্রকাশলাভ করেনি। সেটি হ'ল শীতের জীর্ণতার মধ্যে নবীনের আবির্ভাবের চলমান বিদ্রোহী রূপ। বসন্তের আবির্ভাবের মধ্যে পুরাতনকে ভেঙে দেওয়ার একটা প্রবলতা আছে। এই বসন্ত বস্তুতঃ বলাকার

বসন্ত, মহুয়ার জীবনচাঞ্চল্যময় প্রেমের যোগ্যতম ভূমিকা। বলাকার জীবনবেগের মত এই বসন্তও বলে—

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।

এই বসন্ত 'নির্দয় নবযৌবন', প্রাচীন সঞ্চয়কে অবহেলা ক'রে দূরে নিক্ষেপ ক'রে সে অগ্রসর হয়, বদ্ধ থাকেনা—

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।

সুতরাং 'বন্ধনহীন-গ্রন্থি'-যুক্ত 'চল্‌তি হাওয়ার পন্থী'দের যাত্রার প্রেরণায় এই বসন্ত শুধু উপযুক্তই নয়, যোগ্যতম একমাত্র ভূমিকা। মহুয়ার মধ্যেকার 'লগ্ন' কবিতায় কিন্তু মিলনের ভূমিকারূপে কবি বসন্ত অপেক্ষা শরতের উপরেই অধিক গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। কারণ, এখানে, কবির মতে, বসন্তের মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ধৈর্য-হারা স্বভাবের বীজ রয়েছে, অথচ শরতের মধ্যে রয়েছে অপ্রগল্‌ভা পূজারিণীর ছবি। হয়ত কবিতাটি লেখার সময় কোনো গৃহিণীর ও গৃহের শান্ত মাধুর্যের কথাই কবির মনে জেগেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি ব'লেই ক্ষণিকের আবেদন পূর্ণ করাও তাঁর স্বভাবের মধ্যে সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা যেন জীবনের মধ্যেই অনির্বচনীয়কে দেখার শপথ গ্রহণ ক'রে আবির্ভূত হয়েছে। তাই পূরবী ও বলাকার ও

ঋতুনাট্যগুলির ভাবময় পথের সাধনায় পরিতৃপ্তি না পেয়ে তৎকালীন বাস্তব জীবনের প্রবলতম একটি ধর্মকেই আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয় আশ্রয়টি প্রথমটিরই অনিবার্য পরিণাম, পূর্ণতর অভিব্যক্তি। মহুয়ার দুঃখদ্বন্দ্বময় জীবনের মধ্যে চলমান প্রেমের আদর্শেও বাস্তবজীবনাশ্রয়ের দিকটি ক্ষীণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে এমন প্রশ্নেরও অবকাশ থাকা অস্বাভাবিক নয় যে মহুয়া-তপতীর প্রেমাদর্শ পূর্বেকার কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা কর্তৃক উদ্বোধিত ভোগবাসনাজয়ী প্রেমেরই বাস্তবতা-সুগন্ধি রসায়ন। কিন্তু মহুয়ার পূর্বে লেখা একালের মুক্তধারা, রক্তকরবী ও নটীর পূজা এই বিশিষ্ট নাটকগুলির মধ্যেই বাস্তবাশ্রয়ী কবি-মহিমা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবলম্বন হিসাবে ভাবরূপ ত্যাগ ক'রে কবির অরূপ-বোধকে খাঁটি বাস্তব জীবন-সমস্যার নীড় আশ্রয় করতে হয়েছে। এতে কবির অরূপ যথার্থতার মধ্যে উজ্জ্বলভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অধ্যাত্মকে জীবন থেকে পৃথক ক'রে দেখার সম্পর্কে যে সাবধান-বাণী বের্গসঁ উচ্চারণ করেছেন, দেখা যায়, বহু পূর্ব থেকেই কবি সেই সমন্বয়ের জন্যে পথ উন্মুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। আর এই হ'ল এদেশের উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুগোচিত বাণী—জীবনকে গ্রহণ ক'রেই এর জৈব প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত হতে হবে। আচারের মহাশৃঙ্খলজাল থেকে মানবাত্মাকে মুক্ত দেখতে হবে, যান্ত্রিকতার নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে হবে,—যুগের আত্মিক প্রয়োজনের এই দিকটি স্বামী বিবেকানন্দের তূর্যেও ঘোষিত হয়েছিল। পশুজীবনের উপর মানবজীবনের জয়, স্বার্থময় স্থূল বাসনার জীবনের উপর অরূপাশ্রিত মুক্ত জীবনের জয়। পশু কারা? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, যারা শুধু জীবনকেই দেখে অরূপকে দেখেনা,

যারা স্বীয় বিষয়-বাসনার পুরণের জন্যে মানুষকে বলি দিতে দ্বিধা করেনা, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্যে একটা জাতিকে ধ্বংস করতে চায়, যারা বস্তুর আয়োজনে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করছে, যাদের দানবীয় যন্ত্রশক্তির পেষণে প্রাণরস শুকিয়ে যাচ্ছে—তারা। অধুনাদৃষ্ট এর জড়বিজ্ঞান-আশ্রিত শক্তিকে কবি নমস্কার ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই যান্ত্রিকতা, লোভ ও শক্তির নিষ্পেষণের দিক এবং মানবাত্মার মুক্তির স্বরূপ মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটকদ্বয়ে দেখানো হয়েছে। পূর্বে প্রায়শ্চিত্ত এবং অচলায়তনে রাজশক্তির শাসন ও আচারের বন্ধনের দিকটি কবি নাট্যের বিষয়ীভূত করেছেন এবং উভয়কেই মিথ্যা ও দুর্বল প্রতিপন্ন ক'রে মানবীয়তার জয় ঘোষণা করেছেন। উভয়ত্রই কবি বিপ্লবাত্মক আত্মত্যাগের দ্বারা মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছেন। মুক্তধারা এবং রক্তকরবীতে মৃত্যুর মধ্যে মুক্তির দিকটি সমধিক প্রকটিত হয়েছে। 'বাঁচতে জানে তারাই যারা মরতে জানে'—এই মৃত্যুভয়হীনতা এবং দীন জীবনের প্রতি বিরাগ কবির অরূপ-সাধনার প্রথম স্তর থেকে উপলব্ধ সত্য। যাই হোক, কবির মূল অভিপ্রায় উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে প্রায় এক হ'লেও বাস্তবজীবন-নির্ভর মানবীয়তার দিক শেষের নাটক দুটিতে বিশেষ ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

এই নাটক দুটির পশ্চাতে যে বাহ্যবিষয়ের ক্রিয়া রয়েছে তাহ'ল পশ্চিমের মানববিদ্বেষী উগ্র রাষ্ট্র-সচেতনতা এবং মূলতঃ আমেরিকার বস্তুময় যান্ত্রিক সভ্যতা, যার প্রভাব বিশ্বের সর্বত্র অল্পবিস্তর পড়তে শুরু হয়েছিল। কবি লিখছেন, 'কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধ-

ভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম' (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)। কবির বিশ্বাস, এই অকল্যাণকর বস্তুসভ্যতা টিঁকবে না—'পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল ক'রে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে' সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি ক'রে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে। এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না' (ঐ)। সুতরাং মুক্তধারায় কবি বিপ্লবী অভিজিৎকে দিয়ে যান্ত্রিকতার মূলে আঘাত করলেন, রক্তকরবীর জড়বস্তুশক্তিকে প্রাণের কাছে পরাজয় স্বীকার করালেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে কবি রক্তকরবীতে শক্তিদানবের অন্তরেই তার শৃঙ্খলমুক্তির ঝংকার সঞ্চারিত করেছেন। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বন্দীশালার চিত্র ও মৃত্যুবরণের আগ্রহ দেখানো হয়েছে।

মুক্তধারার প্রবাহকে রোধ ক'রে একটা শস্যশ্যামল ভূখণ্ডকে মরুভূমি ও তার অধিবাসীদের পদানত করবার জন্যে আকাশচুম্বী যন্ত্রদানব নির্মাণ। 'যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ বলি চায়।' এর নির্মাণের জন্যেও কত যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে। পথিকের মুখ দিয়ে কবি এই যন্ত্রের রূপ বর্ণনা করছেন—'বাবারে! ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্ছে, মাংস

নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।" এদিকে রক্তকরবীর গ্রহণ-লাগা যক্ষপুরীর আলোহীন আশাহীন জঠরের মধ্যে অগণিত মানুষ নিয়ে শবসাধনা চলেছে। এরও দানবীয় শক্তি ভয়ংকর। জড়বস্তুর শক্তিমত্ততার সঙ্গে মানবীয় বেদনার দিকটিও কবি নিপুণ-ভাবে চিত্রিত করছেন—মুক্তধারায় পুত্রহারা মাতা অম্বার কাতর ক্রন্দনে এবং রক্তকরবীতে বিশুপাগলের মর্মান্তিক যথার্থবাদিতায়। মুক্তধারা নাটকটির সমস্ত কোলাহলের পিছন থেকে পুত্রহারা জননীর বিলাপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

'যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল।
এ পথের কি শেষ নেই? সুমন কি তবে এখনো চলেছে,
কেবলি চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে
সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?'

রক্তকরবীতে প্রত্যক্ষভাবে কাতর বিলাপ শোনানো হয়নি, কারণ, সেখানে শ্রমিকেরাও সংস্কারে আবদ্ধ যন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই 'নিগড়বদ্ধ দাস'দের জীবনের যথাযথ বর্ণনাতেই যক্ষপুরীর মধ্য থেকে মানুষের আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হয়েছে। 'একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,— বলছে, কাজ করো।' 'আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ, তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্যের আলো কড়া ক'রে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে।' এই নিগড়ে আবদ্ধ জীবনে যারা আলো ও মুক্তির প্রার্থনা করে তাদের পরিণামও কবি নিতান্ত বেদনাময় বাস্তব ভাবেই দেখিয়েছেন—

নন্দিনী। আহা পাগলভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে।

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে।...

নাটক দুটিতে কবির এই বাস্তবাসক্তি আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হই এই বাস্তবজীবনের মধ্যেই কবির অরূপ-অনুসন্ধানের প্রয়াস ও অরূপ-প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য ক'রে। 'নন্দিনী' হ'ল এই অরূপ-রসের বা জীবন-সৌন্দর্যের বাহক। যথার্থ মানবী। যক্ষপুরীর কোনো কোনো শ্রমিকের কাছে এবং রাজার বা অধ্যাপকের কাছে সে রসেরই মূর্ত প্রতীক। হাতে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ রসের স্বরূপকেই ফুটিয়ে তুলেছে। তা শুধু সুন্দর নয়, ভয়ংকর-সুন্দর। 'রাজা' নাটকের রাজার মত। সুতরাং একে লাভ করতে হ'লে বিষয়জড়িত ভোগের জীবন পরিত্যাগ করতে হয়, ক্ষমতার লোভ ছাড়তে হয়, তার চেয়ে কঠিন যে সংস্কার তার বাধা ঘোচাতে হয়। জীবনদানের মধ্যেই তা লভ্য। রঞ্জনের চরিত্র কল্পনা ক'রেই কবি জীবনের মধ্যে এই অরূপলাভের তত্ত্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন। রঞ্জন অমূর্ত। নন্দিনীর ভাবাদর্শের রূপ। তাকে পাবার ব্যাকুলতাতেই নন্দিনীর আনন্দময় সত্তার বিকাশ। আবার এই নন্দিনীই রাজা, অধ্যাপক, বাউল বিশুর কাছে প্রেরণার কাজ করছে। এ যেন শেষের কবিতায় উক্ত 'মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি নির্ঝরিণী, তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায় নিজেরে চিনি'। কবি নাটকটিকে সম্পূর্ণ সাংকেতিক ক'রে সৃষ্টি করেন নি। সাংকেতিকতা ও বাস্তবের মাঝখানে স্থাপন করেছেন। নন্দিনীর চরিত্র তার অন্যতম প্রমাণ। সে রসস্বরূপ হলেও যেহেতু রস মানবজীবনের

বাইরের অপ্রাকৃত লোকের নয়, তা সম্পূর্ণ মানবীয়ই, সেইহেতু সে মানবীও বটে, আবার অরূপানুপ্রাণিত একটি সত্তাও বটে। কবি অরূপকে জীবনাশ্রিত ভাবে দেখার ফলেই এমনটি ঘটেছে। যে পারিপার্শ্বিকে নন্দিনীর আবির্ভাব তার একান্ত বাস্তবতায় সন্দেহের অবকাশ কবি রাখেন নি। আর ঐ বাস্তবজীবনের মধ্যেই নন্দিনী ও রঞ্জনের আবির্ভাব এবং বাস্তবতার সঙ্গে তাদের নিগূঢ় সম্পর্কের রহস্যই একালের কবিমানসের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু। তাই অধ্যাপক যখন নন্দিনীর আনন্দময় সত্তাকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—

> 'নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নিচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব ব'লে তাকিয়ে আছি।'

তখন নন্দিনী অধ্যাপকের কথায় কর্ণপাত করে নি। কবি জীবনের মধ্যেই অরূপরসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কবির পরিণত প্রতিভার অরূপ-জীবন সমন্বয়ের এই দিকটি লক্ষ্যে রাখলে নন্দিনী ও রঞ্জনের চরিত্র তথা রক্তকরবীর কাব্যতত্ত্ব বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বলা বাহুল্য, জীবনাশ্রয়-ত্যাগ নন্দিনীর স্বভাবের মধ্যেই নেই তাই নাটকে বাস্তব বিপদজালের মধ্যবর্তিনী হয়েও সে অটল। আর নন্দিনীর ভাবাদর্শ রঞ্জন মুক্তির প্রতীক হ'লেও তাকে দশজনের মধ্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে। বস্তুতঃ 'বন্ধন এবং অবন্ধনের' মধ্যেই এই নাটকটি সার্থক হয়ে উঠেছে, কবির অন্তরতম ভাবাদর্শও সম্যক প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের মধ্যেই অরূপরসের আস্বাদন করতে

হবে, জীবনকে সম্যকভাবে গ্রহণ অথচ স্থূল বাসনাময়তা ত্যাগ ক'রেই জীবনকে যথার্থভাবে পেতে হবে। পূর্বেকার ঠাকুরদাচরিত্রের মত বাউল ধনঞ্জয় এবং বিশু এই মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধ। আর শক্তিধর ভয়ংকর রাজাও তার প্রতাপ ত্যাগ করতে করতে পরিশেষে মুক্তিপথের পথিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তধারার অভিজিৎ এবং রক্তকরবীর রঞ্জন কবির আত্মবিসর্জনময় রোম্যান্‌টিক এবং বৈপ্লবিক আদর্শের ভাবমূর্তি, পূর্বতন পঞ্চক, অমল, চতুরঙ্গের শচীশ প্রভৃতির বিস্তৃত ও স্থানোপযোগী চিত্র।

'নটীর পূজা' নাটিকায় মানবধর্মের জন্যে শ্রীমতীর প্রাণদান কবির এই বাস্তবজীবনবোধকেই একটু ভিন্ন আধারে প্রকটিত করেছে। সেখানেও কবি শক্তি ও আচারের দ্বারা অবরুদ্ধ মানব-আত্মার করুণ ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন এবং মৃত্যুর দ্বারাই মুক্তির সন্ধান এনে দিয়েছেন। রাজধর্ম ও আনুষঙ্গিক উগ্র স্বার্থকোলাহলের মধ্যেকার অতৃপ্তির সুরটি কবি বিখ্যাত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানটিতে প্রতিধ্বনিত করেছেন—

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকার-জীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত।

এবং হিংসাশূন্য ত্যাগময় মুক্তজীবনের জয়গান করেছেন। রক্ত-করবীতে পৌষের ডাকে প্রকৃতির দিক থেকেও এই জীবন্মুক্তির আহ্বান জানিয়ে কবি তাঁর একটি অতিপ্রিয় ও বহুপরিচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

পথিক কবির যাত্রা পরিণামে এসে পৌছল। অথবা আরও যথার্থভাবে বলতে গেলে পরিণামী কবিপ্রতিভার রহস্যময় গতিধর্ম অভিপ্রেত পূর্ণতা লাভ করলে। বলাকা থেকে মহুয়া পর্যন্ত পথের

সীমানায় এই পরিণামের ইতিবৃত্ত কিরকম বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা আমরা যথাসাধ্য দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং অরূপাশ্রিত চলমান মানবীয়তাবোধের মধ্যেই যে কবির অভিলাষের পরিসমাপ্তি তাও নির্দেশ করেছি। অতঃপর কবির লেখনী যদিও রুদ্ধ হয়নি, প্রায় সর্বত্রই তা পুরাতন, বিশেষভাবে একালের মানবীয়তাবোধ-যুক্ত কাব্য-স্মৃতির বা আত্মস্মৃতির মধ্যে বিচিত্রভাবে পরিভ্রমণ করেছে এবং বিদায়ের পরিচয়কে নানাভাবে জানিয়েছে। কিন্তু আমাদের এরূপ মন্তব্যের অর্থ এই নয় যে অতঃপর কবির কাব্যরচনার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। একালেও তিনি এমনতর বহু কবিতা রচনা করেছেন যা নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর এবং তাঁর লেখনীর যোগ্যও বটে। আমাদের বক্তব্য এই যে এই গীতিমহাকবির অলোক-সামান্য প্রতিভার একটি নির্দিষ্টসূত্রে চলমানতা তার বহুকালের অভিলষিত পরিণাম লাভ করেছে। জীবনের মধ্যেই সর্বতোভাবে অরূপ লীলারস আস্বাদনের আগ্রহ তার সমাপ্তি পেয়েছে। গীতাঞ্জলিতে যখন কবি প্রকৃতি-আগত অরূপরসে প্রায় নিমগ্ন আছেন সেই সময়কার একটি গানে তিনি বিহ্বলাবস্থায় এই সমাপ্তি প্রার্থনা করেছিলেন—

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে।
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

কিন্তু তা হয়নি, জীবনের মধ্যে অরূপকে সর্বপ্রকারে উপলব্ধি

ক'রে মানবমহিমার মধ্যে সত্যদর্শন ক'রে তবেই প্রতিভার বশুতা থেকে কবির মুক্তি ঘটেছে। সুদূর ও অনির্বচনীয়ের সঙ্গে জীবনের পরিণয় ঘটিয়ে তবেই রবি যেন তাঁর প্রতিভা-রশ্মি সংবরণ করেছেন।

কাব্যজীবনের শেষ অধ্যায়ে কবি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি কাব্যের বাহনরূপে গদ্যচ্ছন্দের প্রবর্তন। গদ্যচ্ছন্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্ভবতঃ আধুনিক ইংরেজি কাব্য থেকে প্রেরণা এবং সংস্কৃত কাব্য থেকে প্রাণের প্রবর্তনা লাভ ক'রে তিনি কাব্যরচনার পরিসরকে কতদূর বাড়িয়ে তুলেছেন তা আধুনিক কবিদের রচনা থেকে কতকটা অনুমিত হতে পারে। এই ক্ষণজন্মা মহাকবির শেষ জীবনের বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্বে দুএকটি কথা এই পরিণাম-পর্বে স্মরণ করতে চাই।

আমরা দেখলাম মুক্তধারা-রক্তকরবীর মধ্যে কবিপ্রতিভা সার্থকভাবে বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের প্রবল রোম্যান্টিক কল্পনার মধ্যে যার জন্ম তা উচ্চতম ভাবলোকে অধিষ্ঠিত হয়ে পরিশেষে জীবনকে ভাবের সঙ্গে পরিচিত এবং ভাবকে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত ক'রে দেখেছে। যুগের মধ্যে ব্যাপ্ত যে-সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কবিপ্রতিভার এরূপ পরিণাম সম্ভব হয়েছে তা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করেছি। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির তথা ভারতীয়ের প্রতিনিধি যুগকবিও বলা চলে। রবীন্দ্রের সৃষ্টিকার্য দীর্ঘকালব্যাপী। উনিশ শতকের আচার-সর্বস্ব বিলাসী অকর্মণ্য বাঙালিজীবন থেকে আরম্ভ ক'রে বিংশ শতকের সাধারণভাবে জগতের সর্বত্র প্রসারিত উগ্র-

তেমনি রাজবন্দীদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের প্রেরণায় লেখা 'পরিশেষে'র দুটি কবিতা ('নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন' এবং 'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত') রাজশক্তির বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী মানসের এবং মানবপ্রেমের পরিচয় অবশ্যই বহন করে। কিন্তু এই সাময়িক ঘটনার প্রেরণার বশে লেখা কবিতাগুলি কোনা কোনো ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদা পেয়ে থাকে। আমাদের মনে হয়, এরকম কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কবিতার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী ও মানবপ্রেমিক কবিসত্তাকে দেখতে যাওয়া এবং একজন চিরন্তনের অতি প্রবল বিপ্লবীর আংশিক পরিচয় লাভ ক'রে সন্তুষ্ট থাকা একই কথা। অর্থাৎ ডাকঘর, অচলায়তন, গীতালি, বলাকা, ফাল্গুনী, মুক্তধারা প্রভৃতির মধ্যে যাবতীয় আচার-সর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে কবি যে-সংগ্রামের মনোভাব পোষণ করেছেন এবং একান্ত উদার মানবীয়তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন—বাংলা সাহিত্যে আজও যার তুলনা নেই, সেগুলির দিকেই লক্ষ্য বিশেষভাবে নিবদ্ধ না করা বিমূঢ়তার পরিচয়। উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি কবির সেই সমগ্র ও প্রবল চেতনার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এই কয়েকটী বিক্ষিপ্ত রচনায় যে প্রকট প্রত্যক্ষতা পাওয়া যায় তা উক্ত বিখ্যাত রচনাগুলিতে পাওয়া যায় না ব'লে ঐগুলির নিগূঢ় জীবনবোধ এবং তার সঙ্গে জড়িত অসাধারণ কবিপ্রতিভা যদি লক্ষ্যের বাইরে থেকে যায় তাহ'লে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আসলে বাস্তবজীবন ও যুগ কবির বিশাল কল্পনাশক্তিতে ও চৈতন্যে গৃহীত হয়ে যে-রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে তাতেই তিনি মহাকবি, বিশিষ্ট জীবন-দার্শনিক, এবং সেই কবিকে যদি লাভ করতে পারি

তাহ'লেই আমাদের চরম প্রাপ্তি ঘটবে। নতুবা অল্পকেই আপন ব'লে স্বীকার করব এবং বৃহৎকে হারাব।

এই নিবিড় জীবন-চেতনার মধ্যেই কবির শাশ্বত মানবীয়তার পরিচয়। রবীন্দ্রকাব্যজীবনের শেষভাগে তাঁর বিভিন্ন মুহূর্তের নানান পূর্বপরিচয়ের মধ্যে যদি কোনো একটি ধারা পাঠকের মনে স্বতন্ত্র চমৎকারিত্বের সৃষ্টি ক'রে থাকে তা ঐ পরিণামের যুগের মানব-প্রীতির ধারা যা কবির শেষ রচনা ক'টিতে একটু নূতন রূপ গ্রহণ ক'রেই আবির্ভূত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কাব্যজীবনের প্রায় শেষ বৎসরে লেখা কয়েকটি কাব্যে বিষয় ও ভঙ্গি উভয় দিক থেকেই একটা পরিবর্তন এসেছে। বিদায়ের ঠিক পূর্বে কবি যেন সবদিক থেকেই একান্ত সহজ হয়ে উঠতে চেয়েছেন। কবির বক্তব্য যাই হোক, এই সময় একটি সহজ অনুরাগ ও স্বচ্ছ অকপট আন্তরিকতা তাঁর কবিতাগুলিতে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। একেবারে শেষ লেখা ক'টিতে পাঠক অনুভব করবেন যে কবিপ্রতিভা কল্পনাশ্রয়ী হ'লেও একান্ত সহজ অনুরাগ ও সহজ অনুভূতি সেখানে যেন কল্পনাবেগকে সংযত করতে চায়। মনেপ্রাণে সহজ হওয়ার প্রেরণাবশতই কবির উদার মানবপ্রীতি বাস্তবভাবেই সেখানে সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করেছে; এমনকি দুঃখজীবী মানুষকে শোষণ করার দিকটিও কবির লক্ষ্যের বাইরে যায়নি ('জন্মদিনে'র ২২ নং কবিতা 'মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে' প্রভৃতি দ্রঃ)। কয়েকটি কবিতায় কবি স্পষ্টতঃ শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের প্রতি সকরুণ অনুরাগের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বুঝতে হবে, এ অনুরাগ তাঁর ক্রম-উদ্ভিন্ন মানুষপ্রীতি-সঞ্জাত, এর উৎস তাঁর বিশিষ্ট কবিমানস। তৎকালীন রাষ্ট্র ও সমাজ কবির এ মনোভাবকে উদ্দীপিত করেছে মাত্র, যেমন করেছে পূর্ব পূর্ব বিভিন্ন

রচনায়। ফলে, কবিমানস ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব থেকে উৎপন্ন 'ওরা কাজ করে'র মত উল্লেখযোগ্য সাধারণমানুষপ্রীতির কবিতা কবি লিখেছেন এবং 'ঐকতান' কবিতায় তিনি একদিকে যেমন কৃত্রিমতা-সম্পন্ন ভঙ্গিমাত্রসম্বল সাহিত্যিকদের অমানবীয়তা দেখিয়েছেন. সেই সঙ্গে নিজের সাধারণ মানুষকে না জানার আক্ষেপ অসংকোচে বিবৃত করতে পেরেছেন। আর এই একান্ত সহজ অনুরাগের বশেই ভাবীকালে 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' বেদনার সঙ্গী যথার্থ সাধারণ-মানুষের-কবির আবির্ভাবও প্রার্থনা করেছেন, যে-কবি, তাঁর ধারণায়, তাঁর অসমাপ্ত অধ্যায় সমাপ্ত করবে।

গোধূলি-পর্যায়

'পরিশেষ' থেকে 'শেষ লেখা'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের মূল্যবান গোধূলিক্ষণটিকে নানাভাবে স্মরণ করেছেন, যেমন—

এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; (পরিশেষ)

যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে। (ঐ)

দিনান্তের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে, (শেষ সপ্তক)

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে, (বীথিকা)

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরাল।
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা। (ঐ)

শেষ-নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে (পত্রপুট)

বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে। (ঐ)

এই পর্যায়ে একদিকে রয়েছে তাঁর পূর্ব কাব্যজীবনের বিচিত্র স্মৃতি, ফাল্গুনী-বলাকা-পুরবীর কালের জীবনবোধ ও আত্ম-অনুসন্ধানের প্রসার

এবং ঐ পরিণামের কালের শাশ্বত মানবীয়তার ব্যাপক অনুবৃত্তি,—আর একদিকে রয়েছে বিষয়বস্তুর ও স্বীয় মানসের বিশ্লেষণ-তৎপরতা এবং ভাষা ও ভঙ্গিতে নূতনতর পথনির্মাণের অশ্রান্ত উৎসাহ। কবির একালের মানসিক প্রবণতায় আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় বহির্জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে এর অধিকতর সচেতনতা। মানুষ ও জীবন সম্পর্কে শেষ দিন পর্যন্ত কবির কৌতূহলের ও উৎকণ্ঠার বিরাম নেই। আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এমন কি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখদুঃখের মুহূর্তগুলি, কি শহর কি পল্লীর অধিবাসী মানুষের আধুনিক মনের বিচিত্র বেদনার স্থানগুলি একালে কবিকে অধিকতরভাবে ও অনায়াসে আকর্ষণ করেছে। এই সব জাগতিক বিচিত্র বিষয় ও ঘটনাকে কবিমানস যেভাবে আত্মস্থ করেছে তার প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় হ'লেও এবং একালে আমরা বার বার তাঁর পূর্বেকার পরিণত জীবন-উপলব্ধির পরিচয় লাভ ক'রে চমৎকৃত হ'লেও, তাঁর জাগ্রৎ চেতনা ও গ্রহণোন্মুখ শক্তিটিরই বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। এই দিকটিকে তাঁর গতিশীল প্রতিভার বহির্মুখ দিক বলা যেতে পারে। কিন্তু এই শক্তির জন্যেই তিনি পুরাতন হয়েও আধুনিক এবং গোধূলিকালের স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূলিজালে জড়িত হয়েও দীপ্তিমান। এই জন্যে কাব্যে প্রকাশিত তাঁর দিনাবসানের অনুভবকে স্মরণে রেখেও এবং সমসাময়িক 'পথে ও পথের প্রান্তে'র চিঠিতে লেখা 'শক্তির গোধূলি', 'প্রকাশ করবার শক্তি পরিশিষ্টে এসেছে', 'আমার যাত্রা একান্ত ডুবে যাওয়ার দিকে, সামনে ছুটে যাওয়ার দিকে নয়' প্রভৃতি বাক্যকে পরমার্থে গ্রহণ ক'রেও তাঁর এই বহির্মুখী সচলতার পরিচয়লাভে বিস্ময়বোধ করতে হয়।

শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখার সময় তিনি কোন দিক থেকে

অগ্রসর ও আধুনিক এবং কোন বিষয়ে তাঁর চিরন্তন স্বরূপের অন্তর্গত তা বুঝতে হবে। পূর্বেকার অধ্যায়ে আমরা তাঁর প্রতিভার পরিণাম নির্দেশ ক'রে উপসংহারে এই মন্তব্য করেছি যে তাঁর গতিশীল প্রতিভা আন্তরধর্মের দিক দিয়ে আর অগ্রসর হয়নি, যদিও বিষয়বৈচিত্র্যে এবং প্রকাশভঙ্গির নবীনতায় শেষ পর্যায়েও কবিমানসের সচলতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ কবির একালের সৃষ্টিতে বলাকা-ফাল্গুনীর 'জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ ক'রেই জীবন্মুক্তি'র বাণী এবং মুক্তধারা-রক্তকরবীর 'শাশ্বতভাবে আধুনিক' গভীর মানবীয়তার সুরই মৌলিক প্রেরণারূপে নানাভাবে বিরাজ করছে, আর গতিধর্মে সর্বকালেই পুরোবর্তী এই কবি কাব্যের বহিরঙ্গনে যে নূতন বস্তু ও রূপের খেলায় আত্মনিয়োগ করেছেন তারও পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে।

মহাকবির শেষ পর্যায়ের কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে কাব্যজীবনের সকলক্ষেত্রে সকলকালেই তাঁর আধুনিক কবিমানসের কথা বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। 'কড়ি ও কোমল' থেকে আরম্ভ ক'রে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত দীর্ঘ ষাট বৎসরের রচনায় তিনি নূতন থেকে নূতনতর দানে বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ ক'রে পাঠক ও সমসাময়িক সাহিত্যিকদের চিত্ত কাব্যরসে যেমনই হোক, অপ্রত্যাশিত তীব্র বিস্ময়ে স্পন্দিত করেছেন, আবার নূতনত্বের জন্যেই তিনি কালে কালে ভ্রান্ত বিচারকের কঠোর সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। দুঃখ বোধ হয়, যখন মনে করি যে আমরা তাঁর অতিমর্ত সৌন্দর্য-স্পৃহার কালে জন্মাইনি, ভাবময় বিলাসস্বপ্নের জড়ত্ব থেকে মানুষের রাজপথে বাহির হওয়ার মুক্তি-মহামন্ত্র যখন শুনিয়েছিলেন তখন মজ্জার মধ্যে কম্পনবোধ করার সৌভাগ্য লাভ করিনি, আবার, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উজ্জ্বল এবং সত্যোপলব্ধিতে স্থির প্রজ্ঞা নিয়ে যখন সর্ববিধ সংস্কারমুক্তির

কর্তা, মানুষধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, বজ্র-বিদ্যুৎ-পথসঞ্চারী ভৈরব-সুন্দরের দুর্জয় আহ্বান শুনিয়েছিলেন তখনও অনুপস্থিত ছিলাম, এমন কি গীতালি-ফাল্গুনী-বলাকার মোহমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় যাত্রার পদধ্বনিও আমাদের কাছে নিঃশেষে অশ্রুত ছিল। যখন মহুয়া ও শেষের কবিতায় পথচারী প্রেমকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিচ্ছেন তখন আমাদের জ্ঞানও হয়নি। বস্তুতঃ আমরা জন্মেছি তাঁর 'ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর' কালে, তাঁর 'মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ' যখন বিতরণ করছেন তখন—কণিকাপ্রত্যাশী হয়ে। কিন্তু বলতে লজ্জা হয়, তখনকার স্বল্পজ্ঞানে এবং অনভ্যস্ত কাব্যবুদ্ধিতে তাঁর গদ্যকাব্যকে সানন্দে স্বীকার করতে পারিনি।

সেই সময় সাহিত্যিকসমাজে একদিকে যেমন রবীন্দ্রবিহ্বলতা, আর একদিকে তেমনি হিমালয়-লঙ্ঘনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। 'কল্লোল' থেকে 'কবিতা'য় এসে আধুনিক উৎসাহের মধ্যে ঐ পূর্বপ্রচেষ্টারই বাস্তব রূপ দেখা গিয়েছিল। বস্তুতে, ভাষায়, ভঙ্গিতে বাঙালির রবীন্দ্র-অতিক্রমের এই দিকটি কাব্যমূল্যে যাই হোক, অভিযানের দিক থেকে অবিস্মরণীয়, কারণ, সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের উৎসাহ ও প্রস্তুতির দৃষ্টান্ত বিরল। আর এই আধুনিক সাহিত্য-পটভূমিই সায়াহ্নের রবীন্দ্রনাথের রূপকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে, দেখিয়েছে যে তিনি শুধু তাৎকালিক আধুনিক নন, সর্বকালেরই আধুনিকতার মূর্তি। প্রমাণ করেছে যে ভিক্টোরীয় যুগের কল্পনাবিলাসী ও আদর্শপরিতৃপ্ত তৎকাল থেকে আরম্ভ ক'রে বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও সাম্যধর্মী আধুনিক পর্যন্ত একই প্রতিভা প্রাচীনের অনুবর্তী হয়েও আশ্চর্যরূপে কালের গতির সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে নিজকে মিলিয়ে পদক্ষেপ ক'রে চলেছে।

এমনটি যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি, যে, এই মহাকবির একটি বিশিষ্ট জীবন-দর্শন রয়েছে— যাকে মোটামুটি বলা যেতে পারে 'বিশ্ব সত্য, মানুষ অধিকতর সত্য' এই ধারণা। এই অতিব্যাপক জীবন-দর্শনের বশীভূত ব'লেই কোনো কালের অন্তর্নিহিত মানবীয় কামনাগুলির সঙ্গেই তাঁর অন্তরের বিরোধ ঘটেনি, যদিও স্বার্থমলিন জীবনের সঙ্গে তিনি অনিবার্যভাবে সংঘাত অনুভব করেছেন। আর, সত্যোপলব্ধিগত একটি সুবৃহৎ মানবীয়তা তাঁর কাব্যে শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ব'লেই সাম্যধর্মী আধুনিক কালের সাধারণ মানুষের প্রতি প্রেমের দিকটি তাঁর কাব্যে উপেক্ষিত হয়নি, কেবল তা রাবীন্দ্রিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। যেমন বলা যেতে পারে যে পত্রপুট, নবজাতক, আরোগ্য বা জন্মদিনে কাব্যে কর্মী ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনস্পন্দন কবি প্রগাঢ় সহানুভূতির সঙ্গেই যদিচ অনুভব করেছেন, তাদের দেখেছেন দেশকালমুক্ত একটি চিরন্তন জীবনপ্রবাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উত্থান পতনের ও তার পরিচালকদের ক্ষণিকতা ও নশ্বরতার পটভূমিতে দুঃখজীবী, মৃত্যুঞ্জয় এবং কল্যাণব্রত সাধারণ মানুষই তাঁর কাছে চিরকালের ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক হ'লেও বিশিষ্টভাবে আধুনিক, চিরন্তন মানব-মহিমার মূল্যদাতা।

তাঁর দেশকালনিরপেক্ষ মুক্ত কবিমানস সাময়িক প্রেরণায় সচেতন হ'লেও সাময়িকভাবে কোনো ঘটনাকে গ্রহণ করতে পারেনি। আমরা ইতিপূর্বে বলাকার আলোচনায় কবির এই প্রকৃতি লক্ষ্য করেছি। তাঁর একালের প্রান্তিক, সেঁজুতি, নবজাতক এবং জন্মদিনে কাব্যে কয়েকটি রচনায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর

চিরকালের মানবপ্রেমিকতাকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। তাঁর একালের কোনো একটি কাব্যে আত্যন্ত বিস্তৃত কোনো একটি বিশিষ্ট কল্পনাপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায় না, বিভিন্ন কাব্যগুলির মধ্যে কবির মনোধর্মের স্বল্প পার্থক্য অনুভব করা যায় মাত্র। একেই অবলম্বন ক'রে আমরা একালের স্মরণীয় রচনা থেকে যথাসম্ভব তাঁর মানসিক প্রবণতাগুলির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

মহুয়া কাব্যের রচনাকালের ও তারপর মোটামুটি চার বৎসরের কতকগুলি কবিতা 'পরিশেষ' কাব্যে গৃহীত হয়েছে। এতে বলাকা, পুরবী ও নটরাজের অনুবৃত্তিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়,—পরিণত রসচেতনারই ভগ্ন খণ্ড রূপ। 'বিচিত্রা' ও 'তুমি' কবিতায় কবি পুরবী-কালের লীলাসঙ্গিনীকে স্মরণ করেছেন এবং তাঁর দিনাবসানের কালেও প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি তাঁর স্থির অনুরাগের ব্যত্যয় হবে না এই অনুভব জানিয়েছেন। কবির কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিচিত্র সায়াহ্নের রচনায় সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় তাঁর কাব্যজীবনের ও কবিমানসের ইতিবৃত্ত, কিন্তু যে-কল্পিত নারীমূর্তি কৈশোরে ও যৌবনে কবিচিত্তে রসের প্রেরণা দিয়েছে, পুরবীতে বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোকে মুগ্ধনেত্রে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, কবি তাকে নানাভাবে স্মরণ করেছেন বীথিকা ('কৈশোরিকা' তু°), শেষ সপ্তক এবং সানাইয়ে। পরিশেষের 'পান্থ' কবিতায় 'নটরাজে'র মুক্তিসংগীত আমাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে। 'অপূর্ণ' কবিতায় কবি বলাকা-পুরবী স্তরের দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশমান জীবনরহস্যের সার্থকতার প্রশ্ন

পুনরায় তুলেছেন এবং পুনরায় আমাদের আশা ও আশ্বাস দিয়েছেন। যে সাধকসুলভ আত্মজিজ্ঞাসা বলাকার দুএকটি কবিতায় ক্ষীণভাবে এবং পুরবীতে ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা এখন থেকে শেষ সপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপকতর হয়ে চলেছে। এর কতকগুলি কাব্যাংশে উপাদেয় এবং কতকগুলি আত্মবিবৃতিমাত্র হ'লেও রবীন্দ্র কবি-আত্মাকে জানার দিক থেকে এগুলির মূল্য অপরিসীম। পরিশেষের 'আমি' কবিতায় কবি দেশকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তাঁর অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সাধকের প্রজ্ঞামূলক উপলব্ধির সঙ্গে স্বীয় উপলব্ধি মিলিয়ে দেখেছেন—

যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

মহাকবি এবং সাধকের আত্মদর্শন যে স্বরূপে অভিন্ন, প্রকারে পৃথক, একথা পুরবীতে এমনকি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য প্রভৃতিতেও আমরা পূর্বেই বুঝেছি। এখানকার 'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে কবি জীবনবিবৃতির উপসংহারে মৃত্যুর মাধ্যমে পূর্ণতাকে দেখার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন। 'দুর্দিনে' কবিতায় ('দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি কর্মে জড়ায় গ্রন্থি') কবি তাঁর সুলভ স্বকীয়তায় দুঃখদুর্যোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপশূন্য অবিচলিত শ্রেয়ঃ-অনুরাগের মধ্যে আত্মমুক্তির বাণীই প্রকাশ করেছেন। 'লেখা' 'নূতন শ্রোতা' প্রভৃতির মধ্যে কবি অনায়াসেই নূতন কালের কবি ও রসিকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, কারণ,

তিনি জানেন, পুরাতনকে গ্রহণ ক'রেও কাল নূতনের পথে পদক্ষেপ ক'রে চলেছে।

'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' ('নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন') কবিতাটি এবং বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি আমাদের তৎকালের স্বাধীনতা-যুদ্ধের কবিমানসে প্রতিফলনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এগুলি, বিশেষভাবে 'প্রশ্ন' কবিতাটি কবির বিশিষ্ট জীবনবোধের দিকটিকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করার পথ নির্দেশ করেছেন এবং দুঃখ, বিপদ ও মৃত্যুকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রে চলেছে যে-মানুষ তার শক্তিকে অভিনন্দিত করেছেন। তিনি শ্রেয়োবোধের কবি হ'লেও সর্বস্ব পণ ক'রেই শ্রেয়কে জয় করার বাণী শুনিয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কায়িক শক্তিমত্তার দিকটি তাঁর কাছে নিন্দিত হয়নি। কবি এই জীবনবোধে যে কতদূর বাস্তব তার প্রমাণ তাঁর এই উপলব্ধি থেকেই পাওয়া যাবে। তিনি জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন বলেই দেহ, মন ও আত্মা তাঁর কাছে একই আধারে স্থাপিত হয়েছে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর কায়িক শক্তির প্রয়োগ তিনি সমর্থনই করেছেন। কাপুরুষতার চেয়ে নিষ্ঠুরতাই তাঁর কাছে বরণীয় ব'লে মনে হয়েছে। তা ছাড়া, মানবের মুক্তির আর একটি দিক তিনি কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। আমরা পূর্বেকার পর্যায়গুলিতে, অচলায়তন, রাজা এবং গীতালি প্রভৃতির আলোচনায় দেখেছি যে কবির উপলব্ধ অরূপ, যিনি সৃষ্টির দ্বৈতলীলার মধ্যে নিজকে প্রকাশিত করছেন, যিনি যুগপরিবর্তনের মুখে অন্যায় ও পাপকে নিঃশেষে দূর করবার জন্যে গুরুর বা ঠাকুরদার মাধ্যমে অবতীর্ণ হন—তিনি বাস্তব সংগ্রামের মধ্যে যোদ্ধৃবেশেই

আসেন। সুখ ও আরামের বন্দিত্ব এবং প্রথা ও আচারের বন্ধন ও নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্যে সংগ্রাম ও বিপ্লবের সার্থকতা উপলব্ধি কবির আর একটি বিশিষ্ট উপলব্ধি এবং সেই হিসাবে তাঁর অরূপ বা ঈশ্বর কেবল-সুন্দর নন, ভয়ংকর-সুন্দর। আর 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' মনে ক'রে অমানুষিকতাকে কঠোর হস্তে দমন করবার জন্যে যারা অগ্রসর হয় ও অকাতরে আত্মবিসর্জন দেয় কবি মুক্তির মূল্যে তাদেরই অভ্যর্থিত করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের জীবন-উপলব্ধির সঙ্গে গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের পার্থক্যও তুলনা ক'রে দেখবার বিষয়। গান্ধীজী সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে সত্যাগ্রহ ও অহিংসা প্রয়োগ ক'রে আধুনিক কালকে বিস্ময়ান্বিত করেছেন। কবি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে সর্বপ্রথম এই আদর্শমূলক চরিত্র নিয়ে পরীক্ষা করেন। পরে পরিত্রাণ ও মুক্তধারার মধ্যে একই চরিত্রের অনুবর্তন করেন। দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মুক্তিসংগ্রাম এবং গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দিকটি (১৩১৪-১৫ সাল) তৎকালে স্বাধীনতা-কামী সমস্ত ভারতবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। এই আদর্শের সঙ্গে কবি স্বকীয় তৎকালসুলভ বাউল-ভাবাদর্শ মিশ্রিত ক'রে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র এঁকেছিলেন (১৩১৬ বৈশাখ), যদিও ঐ নাটকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের কোনো পন্থা তিনি এদিক থেকে নির্দেশ করেন নি, আর সাহিত্যের দিক থেকে তা করার কথাও নয়। কিন্তু আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই ধরণের চরিত্র পরে একেবারে বাউল-ধর্মী হয়ে পড়েছে (রক্তকরবীর 'বিশুপাগল' দ্রঃ) এবং কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি।

মহাযুদ্ধই হোক আর আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামই হোক, কবি তাঁর বিশিষ্ট জীবনাদর্শের আলোকেই সব প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বাস্তব সংগ্রাম তাঁর কাছে মানবীয় মুক্তির বাণী বহন করে এনেছিল (তু° ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা—গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা—প্রভৃতি)।

দেখতে হবে, কার্যতঃ যে-কোনো অন্যায়কেই কবি হিংসা ব'লে মনে করেছেন, অন্যায়ের কঠোর বিরোধিতাকে হিংসা ব'লে মনে করেন নি। নটীর পুজায় 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' প্রভৃতি গানে অতিরিক্ত স্বার্থলিপ্সা বা বিষয়তৃষ্ণাকেই (জিঘাংসা ও মানবনিপীড়ন যার ফল মাত্র) কবি হিংসারূপে দেখেছেন। সুতরাং অন্যায়রূপ হিংসার নিন্দা করলেও এবং ত্যাগধর্মের জয়গান করলেও মানবীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাস্তব সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দিতই করেছেন। এইখানেই গান্ধীজীর অহিংসাবাদের সঙ্গে কবির জীবনদর্শনের মিল দেখা যায় না। কবির মনোভাব কতকটা এই রকম: অহিংসা বৈরাগ্যমূলক; জীবনধর্মে মানবীয়ত্বের সঙ্গে পুর্ণ বৈরাগ্যমূলক আদর্শ একাধারে স্থান পেতে পারে না; যাঁরা জীবনকে গ্রহণ ও ত্যাগ ক'রে জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন তাঁরাই অহিংসার যথার্থ অধিকারী, সাধারণ মানুষ নয়। 'প্রশ্ন' কবিতাটিতেঁ কবি এই মনোভাব সংশয়ের আকারে প্রকাশ করলেও উত্তরের জন্য কারো অপেক্ষা রাখেন নি। জীবন-সংঘর্ষের এই মানবীয় বাস্তব দিকটিকে উপেক্ষা ক'রে যাঁরা কেবল ত্যাগের বাণী প্রচার করেছেন, তিনি স্বভাবতই তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কবির এই জীবন-দর্শনের অনুসরণ করতে গিয়ে গীতার কর্মযোগের কথা মনে পড়ে এবং বারংবার উচ্চারিত কবির বাণীর সঙ্গে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেই বাণীর একান্ত মিল দেখতে

পাওয়া যায় যা দিয়ে মোহগ্রস্ত সংশয়াত্মা অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছেন—

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥

*　　　*　　　*

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দ জীবন-দর্শনে বৈদান্তিক হ'লেও এ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কবির অনায়াসেই মিল ঘটেছে। জীবনের সর্বতোমুখী বলিষ্ঠতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহসিকতা সন্ন্যাসীর মুখেও প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে দিকটি উপস্থাপিত করেছিলেন তা-ও জীবনধর্মী সর্বতোমুখী বলিষ্ঠতার দিক।

কবি 'প্রশ্ন' কবিতায় যে-উত্তর দিয়েছেন পরবর্তী যুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে ব্যঞ্জনায় তা জানিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন প্রান্তিকের পরিচিত 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস' প্রভৃতিতে।

পরিশেষের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'ধাবমান' ('যেয়ো না যেয়ো না বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন'), 'মৃত্যুঞ্জয়' ('তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও। আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে, যাব আমি চ'লে'—শেষাংশ) এবং 'বিস্ময়' ('জানি এ দিনের

মাঝে, কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে'—শেষাংশ), 'যাত্রী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় ফাল্গুনী-বলাকার পরিণত জীবনবোধ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কবির যে উদার মানবীয়তাবোধ তাঁর জীবন-দর্শন থেকে পুষ্টিলাভ করেছে,—যা গীতাঞ্জলি, অচলায়তন থেকে আরম্ভ ক'রে মুক্তধারা রক্তকরবীতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছে, তার পরিচয় অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদে লেখা একালের কয়েকটি কবিতার মধ্যে রয়েছে। 'পুনশ্চ'র কাহিনী-আশ্রয়ী কয়েকটি কবিতায় মানবীয়তার এই দিকটির বিশেষ প্রকাশ। 'পরিশেষ'এ এই শ্রেণীর একটি কবিতা ('জলপাত্র') স্থান পেয়েছে। 'অগোচর' কবিতাটির মধ্যে যাত্রী মানুষের অন্তর্বর্তী রহস্যের অপরিচয় কবিকে উতলা করেছে। মানুষের এই রহস্যময়তার কথা পরবর্তী কাব্যগুলিতে কয়েকটি কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে।

'পরিশেষ' এবং 'পুনশ্চ'তে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি কবিতার রসের দিক থেকে নয়, রূপের দিক থেকে। তা হ'ল অনুভূতির বাহনরূপে গদ্যচ্ছন্দের প্রবর্তন।

এ বিষয়ে কবি আধুনিক ইংরেজি কবিতা থেকে প্রেরণামাত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু এর আদর্শরূপটী দেখেছিলেন বোধ হয় সংস্কৃত পদ্য এবং গদ্য কাব্যে। কবি তাঁর কাব্যজীবনের যৌবনে, বিশেষতঃ 'কল্পনা' রচনার সময়ে, সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রাকৃত বাংলার মধ্যে উপযুক্ত শব্দালংকারময় সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে রসানুকূল অপূর্ব ভাষাশৈলী গঠন করেছিলেন। তখন থেকে কি কবিতায় কি সংগীতে যে ঐশ্বর্য ও রমণীয়তা পরিস্ফুট হ'ল বাংলা

কাব্যসাহিত্যে তার তুলনা নেই। আর এখন গদ্যচ্ছন্দের পরীক্ষায় কবি যেন সংস্কৃত ভাষার গতিভঙ্গিটীর অনুসরণ করতে চাইলেন।

হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের ও লঘুগুরু অক্ষরের পতন-উত্থান সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য এবং তা সংস্কৃত পদ্যচ্ছন্দের প্রাণস্বরূপ। সংস্কৃত পদ্যে যতির স্থান গৌণ হ'লেও তার সমাবেশের বৈচিত্র্যে স্বল্পমাত্রার লঘুচপল ছন্দ থেকে অধিকমাত্রার মন্থরগতি ও গাম্ভীর্যময় বিভিন্ন প্রকার ছন্দ আকার লাভ করেছে। সংস্কৃত গদ্যে অবশ্য যতির স্থান গৌণ নয়, প্রায় বাংলা গদ্যের মতই প্রধান। উচ্চস্তরের সাহিত্যিক সংস্কৃত গদ্যে যতি-বিভক্ত নানা পর্বের সঙ্গে ভাবানুযায়ী বাক্যের সংকোচন-প্রসারণ, হ্রস্বদীর্ঘ স্বরবিন্যাসের কৌশল এবং অনুপ্রাসের উপযুক্ত ব্যবহার ভাষার রূপকে কিরকম্ রমণীয় ক'রে তুলতে পারে এবং সেই সঙ্গে কাব্যরসেরও সহায়ক হতে পারে তা সুকবি বাণভট্টের রচনা পড়লেই বোঝা যায়। বাহুল্যভয়ে সংস্কৃত পদ্য বর্জন ক'রে গদ্য থেকেই উদাহরণ উদ্ধার ক'রে সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির স্বরূপটি দেখাতে চাই। বাণভট্ট প্রায়শঃ সমাসবদ্ধশব্দযুক্ত অতিদীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করলেও যতি ও ভাব-যতির নিপুণ ব্যবহারে বাক্যকে এমনভাবে নিয়মিত করেছেন যে শুধু পড়তেই একটি বিশেষ আনন্দবোধ হয় এবং স্টাইলের গুণে অর্থও দুর্বোধ্য থাকে না। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যও যে কাব্য তা অনেকাংশে এই রূপচাতুর্যের জন্যে। যেমন ধরা যাক 'কাদম্বরী'র নিম্নলিখিত অংশ—

> একদা তু। প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে। গগনতলকমলিনীমধুরক্ত-পক্ষসম্পুটে। বৃদ্ধহংস ইব মন্দাকিনীপুলিনা। দপরজলনিধিতটমব-তরতি চন্দ্রমসি। পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডুনি। ব্রজতি বিশালতামাশা-চক্রবালে।

এই কবির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাক্যে স্বরবৈচিত্র্য এবং অভিপ্রেত যতি ও ছেদের সাম্য দেখা যাক *—

শূন্যমিব মে প্রতিভাতি জগৎ ॥ অফলমিব পশ্যামি রাজ্যম্ ॥ অপ্রতিবিধেয়ে তু বিধাতরি। কিং করোমি ॥ তন্মুচ্যতাময়ং দেবি শোকানুবন্ধঃ ॥ আধীয়তাং। ধৈর্যে ধর্মে চ ধীঃ ॥ ধর্মপরায়ণানাং হি। সদা সমীপসঞ্চারিণ্যঃ। কল্যাণসম্পদো ভবন্তি ॥

কম মাত্রার পর যতিসমাবেশের দৃষ্টান্ত 'দশকুমারচরিত' থেকেও নেওয়া যাক—

অনন্তরং চ কশ্চিৎ। কর্ণিকারগৌরঃ। কুরুবিন্দসবর্ণকুন্তলঃ। কমলকোমলপাণিপাদঃ।

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের বা কবিত্বময় গদ্যের রূপ দেখা গেল। যতিবহুল বাংলা গদ্যের সঙ্গে সংস্কৃতের এই ভঙ্গিটি তুলনা ক'রে দেখবার বিষয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যিক বাংলায় যথাসম্ভব সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গির অনুসরণ ক'রেই বাংলা গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ছন্দোযুক্ত সংস্কৃত পদ্য কিন্তু বাংলা পদ্যের সঙ্গে আত্মিক মিল ঘটাতে পারেনি। বাংলায় সংস্কৃত বিভিন্ন পদ্যের অবিকল অনুকরণ সবক্ষেত্রেই কৃত্রিম হয়েছে। তবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত গুরু বা দীর্ঘ অক্ষরের 'দু'মাত্রা উচ্চারণের রীতি প্রয়োজনমত বাংলা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে প্রাচীন কাল থেকেই অনুসৃত হয়েছে এবং এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' রচনার কাল থেকে উত্তরোত্তর চমৎকারিত্বের সঙ্গে ক'রে এসেছেন। গদ্যছন্দের ক্ষেত্রেও ভাবের প্রকার ও আবেগের মৃদুতা বা তীব্রতা অনুযায়ী কবি কখনো কখনো গুরু ও দীর্ঘ অক্ষর সন্নিবেশ ক'রে এদের দুই মাত্রার মূল্য দিয়েছেন ;

* কেবল যতি স্থানে। এবং যতিও ছেদের মিলন স্থানে ॥ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলে সংস্কৃত গদ্যের অন্তর্নিহিত ভঙ্গিটি ছাড়া রূপকৌশলও গদ্যচ্ছন্দে কতকপরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়ে একটু পরেই আমরা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

রবীন্দ্র-প্রদর্শিত গদ্যচ্ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল অনেক ক্ষেত্রে পদ্যের মতই ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে না দিয়ে মধ্যে স্থাপন করা। গদ্যে বাক্যের মধ্যেই এইভাবে ক্রিয়াপদ স্থাপন করার আদর্শ আমাদের প্রাচীন রূপকথার মধ্যে রয়েছে। 'এক যে ছিল রাজা। তার ছিল সাত রানী' থেকে আরম্ভ ক'রে সুখদুঃখময় বিচিত্র আবেগের বর্ণনাগুলিতে ক্রিয়াকে মধ্যে রেখে বলার ভঙ্গি রূপকথার রসকে কিরূপ ফুটিয়ে তুলেছে তা সকলেরই সুবিদিত। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকথাশ্রেণীর কয়েকটি রচনায়, এমনকি শিল্পবিষয়ক লেখার মধ্যেও বাক্যের এই রূপকথা ঢঙের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে ক্রিয়াপদ সন্নিবেশের ফলে ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি অবশ্যই বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিপিকার অনুভূতিময় গদ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম এইরূপ বাগ্‌বিন্যাস অবলম্বন করেছিলেন, যার ফলে সহজেই তা কাব্য হয়ে উঠেছে, যেমন—

> এখানে নামল সন্ধ্যা ll সূর্যদেব ll কোন্ দেশে l কোন্ সমুদ্রপারে l তোমার প্রভাত হ'ল ll
> অন্ধকারে এখানে l কেঁপে উঠচে রজনীগন্ধা ll
> বাসর ঘরের l দ্বারের কাছে l অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ll
> কোন্‌খানে ফুটল l ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ll
> জাগল কে ll নিবিয়ে দিল l সন্ধ্যায় জ্বালানো l দীপ ll
> ফেলে দিল l রাত্রে গাঁথা l সেঁউতি ফুলের মালা ll

লিপিকার এই ধরণের রচনাগুলি খাঁটি গদ্যচ্ছন্দই, কবির মতে,

তখনকার ভীরুতার জন্যে তিনি কাব্যের অন্তঃপুরে এদের (অথবা, গদ্যের রাজপথে কাব্যকে) নিয়ে আসতে পারেন নি।

সংস্কৃত কাব্য ও রূপকথার আদর্শে গদ্যচ্ছন্দ গঠিত মনে করা গেলেও এখন প্রশ্ন হবে এর খাঁটি রূপটি কী বা গদ্যের থেকে এর পার্থক্য কোথায়? মনে রাখতে হবে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের অবিদ্যমানতাই যে এই ছন্দকে গদ্যধর্মী করেছে তা নয়, কারণ, মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রচ্ছন্দও তাহ'লে গদ্যচ্ছন্দ হ'ত। পয়ারের আট-ছয় মাত্রার নিয়মিত রূপকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত অমিত্রচ্ছন্দ বস্তুতঃ পদ্যচ্ছন্দই। খাঁটি গদ্যচ্ছন্দে মোটামুটি চার থেকে এগারো, এমনকি, তেরো পর্যন্ত সম-বিষম সমস্ত মাত্রার পর্বই ভাবানুযায়ী বিন্যস্ত থাকে দেখা যায়। এই সমস্ত অসমান মাত্রার পর্ব ও পঙ্‌ক্তিকে সমঞ্জসীভূত করছে, একটি বিশেষ শক্তি যা কবিতার অন্তর্নিহিত রসের সঙ্গে একাত্ম।

কিন্তু যতিস্থাপনের বা পর্বের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামঞ্জস্যের যে সুরটি গদ্যচ্ছন্দের প্রাণ, তা কবির অনুভূতিতে প্রথমে পরীক্ষামূলকতার কালে ধরা দেয়নি। কারণ গদ্যচ্ছন্দে গোড়ার দিকে রচিত কয়েকটি কবিতার মধ্যে দেখা যায় যে যুগ্মমাত্রার এবং বিশেষভাবে ছয় আট মাত্রার পর যতিস্থাপনের ও ছেদস্থাপনের উপরেই কবির ঝোঁক বেশি। পরিশেষ কাব্যের 'আগন্তুক', 'জরতী', 'সাথী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা লক্ষ্য করলেই একথা বোঝা যাবে। আমরা দুটি উদাহরণ দিচ্ছি, এদের পঙ্‌ক্তির শেষে ছেদ থাকুক বা না থাকুক যতি আছেই; পঙ্‌ক্তির মধ্যে যতি থাকলে তা নির্দেশ ক'রে দিচ্ছি—

হে জরতী মহাশ্বেতা, ৮
দেখেছি তোমাকে ৬
জীবনের শারদ অম্বরে ১০
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র ǀ লঘু স্বচ্ছ মেঘে। ৮+৬
(নিম্নে) শস্যে ভরা খেত দিকে দিকে, ১০
নদী ভরা কূলে কূলে, ৮
পূর্ণতার স্তব্ধতায় ǀ বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর। ৮+১০
(জরতী)

তখন বয়স সাত। ৮
মুখচোরা ছেলে, ৬
একা একা আপনারি ǀ সঙ্গে হত কথা। ৮+৬
মেঝে বসে ৪
ঘরের গরাদেখানা ধরে ১০
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে ১০
বয়ে যেত বেলা। ৬
(সাথী)

এ যেন পয়ারের বা অমিত্রচ্ছন্দেরই নূতন আকারে পঙ্‌ক্তিবিন্যাস। কবি তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম যৌবনে 'মানসী' রচনার কালে 'নিষ্ফল কামনা' নামক একটি কবিতায় পয়ারকে প্রথম এইভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছিলেন, পরে বলাকায় এই শিল্পরীতিকে পূর্ণতম অভিব্যক্তি দিয়েছেন। 'নিষ্ফল কামনা'র প্রারম্ভ দেখা যাক—

রবি অস্ত যায়। ৬
অরণ্যেতে অন্ধকার, ǀ আকাশেতে আলো। ৮+৬
সন্ধ্যা নত-আঁখি ৬

ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।	১০
বহে কি না বহে	৬
বিদায়বিষাদশ্রান্ত। সন্ধ্যার বাতাস।	৮+৬
দুটি হাতে হাত দিয়ে। ক্ষুধার্ত নয়নে	৮+৬
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে ॥	১০

ছেদস্থাপন বিষয়ে কবির একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে অ-যুগ্ম মাত্রার পরেও ছেদ বিন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু পাঠকেরা জানেন, পয়ারজাতীয় ছন্দে যুগ্মমাত্রার পরে অবশ্য ছেদবিন্যাসের দিকেই রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা বিদ্যমান।

যাই হোক, প্রকৃত গদ্যচ্ছন্দে ছেদ ও যতির স্থাপনে কবিকে নিজের এতদিনের অভ্যস্ত রীতিকেও শীঘ্র উল্লঙ্ঘন করতে হয়েছে। এখন কবি ৪, ৬, ৮ এর সঙ্গে ৫, ৭, ৯, ১১, এমনকি ১৩ পর্যন্ত মাত্রাকে মুখোমুখি স্থাপন ক'রে যেন এক নূতন মন্ত্রে নকুল ও অহিকে একসঙ্গে খেলিয়েছেন। লক্ষ্য করতে হবে, অমিত্রচ্ছন্দের মত কবি ছেদকে সহসা কখনো কখনো পর্বের মধ্যে স্থাপন ক'রে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেন নি, সচরাচর যতিপাতের সঙ্গেই ছেদ টেনেছেন, অথবা এমন বলাই অধিকতর সংগত যে, ছেদের ক্ষেত্রে যতিকে ছেদের বশবর্তী রেখেছেন, যেমন হয়ে থাকে সাধারণ গদ্যে। ধরা যাক 'পুনশ্চ'র 'নাটক' কবিতার নিম্নলিখিত অংশ—

নাটক লিখেছি একটি।	৯
বিষয়টা কি বলি।	৭
অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,	৯
ইন্দ্রের অতিথি তিনি। নন্দন বনে।	৮+৫

উর্বশী গেলেন I মন্দারের মালা হাতে ৬+৮
তাঁকে বরণ করবেন বলে। ১০

অথবা, ঐ কবিতায় যেখানে নিজের ছন্দ সম্পর্কে বলছেন—

বাইরে থেকে এ I ভাসিয়ে দেয় না I স্রোতের বেগে ৬+৬+৫
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ ১০
গুরুলঘু নানা ভঙ্গিতে। ৯
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক, ১৩
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে, ১২
আর চল্‌তিকালের চাঞ্চল্য। ১০

দেখা যায়, আমরা সাধারণ গদ্যের উচ্চারণে সম-বিষম মাত্রাভেদ না ক'রে যেমন যতি দিয়ে থাকি, সেই ভঙ্গিকেই কবি কলাকৌশলের দ্বারা বিশেষত্ব দিয়েছেন। প্রত্যাশিত স্বল্পমাত্রার পর্বকে একটু বিলম্বিত ক'রেও কবি তাঁর রসোদ্দেশ্য সাধন করেছেন। কিন্তু মনে হয়, দুটি উপযতিযুক্ত ১৩ মাত্রার পর্বই সবচেয়ে বড় পর্ব হিসেবে গদ্যচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে গদ্য প্রয়োজনীয়তা-মুক্ত হয়ে রূপরসাত্মক যথার্থ কাব্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। কবির মনোভাব অনুসারে যতি নিয়মিত হয়েছে ব'লেই গদ্যচ্ছন্দের যতি সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম প্রণয়ন করা অসম্ভব। কবিমানসের সঙ্গে একচিত্ত হতে পারলে তবেই যেহেতু এর বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির যতিস্থাপন এবং উত্থান-পতন ধরা সম্ভব সেই হেতু গদ্যচ্ছন্দের পাঠ সাধারণের পক্ষে পদ্যের মত সহজ হয় না। অবশ্য কবি এ সম্পর্কে পাঠকের রুচির উপরেও যৎকিঞ্চিৎ অধিকার অর্পণ করেছেন। অনিয়মিত বিভিন্ন পর্বের চলনে আভ্যন্তরীণ নিয়মের সুর কেমন সুন্দর ধ্বনিত

হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত কলাকৌশলপূর্ণ একটি অংশ থেকে দেখা যাক—

এতকাল আমার লীলা এই দেহে, ১৩
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য, ১৩
নাড়িতে নাড়িতে ঝংকার, ৯
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে, ১২
২
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি, ৯
২
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ, ১০
ডুবে যাবে এর দিনগুলি ১০
অতল রাত্রির অন্ধকারে। ১০

(চিররূপের বাণী)

কোন্ মন্ত্রে কবি এই বিশৃঙ্খল পদক্ষেপকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, সাধারণ গদ্যকে কাব্যের গদ্যচ্ছন্দে উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন, যার জন্যে এই শিল্পী কবির সম্পর্কে এ মন্তব্য চলল না যে, 'All prose is verse and all verse prose', যার ফলে বলা হ'ল 'এ গদ্য, কিন্তু ঠিক গদ্য নয়'? কবির অনুভূতিই যদি গদ্যকে কাব্য ক'রে তুলেছে, একে নিয়মিত করেছে কোন্ শিল্পগুণ? কবি তাঁর গদ্যচ্ছন্দ সম্পর্কে আলোচনায় একে গতিলীলা বা মোটামুটি রীদ্‌ম্ ব'লে উল্লেখ করেছেন, যা শব্দার্থের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে সঞ্চরণশীল এবং কবিমানসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বস্তুতঃ সাধারণ বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে-রীদ্‌ম্ আছে, যা আমাদের কথা বলার সময় বিশেষ বিশেষ ভাবমুহূর্তে মাত্র উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে যার সহজ রূপটি সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল, গদ্যচ্ছন্দে তারই বিশেষ প্রকাশ।

গদ্যচ্ছন্দের ভাব ও বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে এই গতি কখনো সোজা পথ ধ'রে অগ্রসর হয়েছে, কখনো সম-বিষম ছোটবড় বিভিন্ন মাত্রার পর্বের বা পঙ্‌ক্তির আশ্রয়ে আন্দোলিত হয়েছে, আবার কখনো বা হলন্ত গুরু অক্ষর এবং আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি স্বরকে দুইমাত্রার পর্যায়ে উন্নীত ক'রে রসানুকূল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। একটা সাধারণ ভাগ ক'রে বলা যেতে পারে যে, কাহিনী বা আখ্যান-আশ্রয়ী অথবা তত্ত্ববিবৃতিমূলক কবিতায় অলংকারহীন সরল কথ্য গদ্যের ভঙ্গি অবলম্বিত হয়েছে, আর যেসব কবিতায় কবির গভীর বিস্ময়বোধ বা অন্তর্নিহিত কোনো জিজ্ঞাসা বা নিগূঢ় আকুতি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিতে অলংকারময় চাতুর্যপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। কবির ভাবাবেগই সর্বত্র মূল নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে বিরাজ করছে। ভাষায় সাধারণের অতিরিক্ত সৌন্দর্যসম্পাতে গদ্যকাব্য কতদূর রমণীয় হতে পারে তা মোটামুটিভাবে মাত্রা নির্দেশ ক'রে (কারণ, এ বিষয়ে রুচি-অনুসারে একটু ইতর-বিশেষ হতেও পারে) দেখাতে চাই। মনে রাখতে হবে, কবি গুরু-অক্ষরকে সর্বত্র (অর্থাৎ কেবল ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের অবশ্যকরণীয়তার স্থলেই নয়, অক্ষরমাত্রিক পয়ারজাতীয় ছন্দেও) একমাত্রার অধিক মূল্যের মর্যাদা দিতে চান। দেখা যায়, অলংকারবহুল গদ্যচ্ছন্দে তাঁর ঐ ধারণার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। ঐ হিসেবে শব্দমধ্যবর্তী হলন্ত অক্ষরগুলিতে এবং অনেক সময় আ, ঈ প্রভৃতি স্বরগুলিতে একমাত্রার বেশি টান দিতেই হয়। ঐস্থানগুলিতে কেবল স্বরের ক্ষেত্রে আমি মাত্রানিরূপণের জন্য ২ সংখ্যা ব্যবহার করেছি। কোনো শব্দের শেষে হলন্ত ব্যঞ্জন থাকলে তার আশ্রয়ী অক্ষরটি সর্বত্র স্বভাবতঃদীর্ঘ উচ্চারিত হয় ব'লে ঐ স্থানগুলিতেও ২ সংখ্যা নির্দেশের

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। এই ছন্দের কাঠামোতে পঙ্‌ক্তির শেষে সর্বত্র যতি আছেই, মাত্র মধ্যেকার যতি নির্দিষ্ট হচ্ছে। যেমন—

দেখেছি। কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস ;

২ ২
দেখেছি কম্পিত অধরে। নিমীলিত বাণীর
বেদনা ;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের। চকিত ঝংকার।

অথবা ধরা যাক, পত্রপুটের বিখ্যাত 'পৃথিবী' কবিতার নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

২ ২
অচল-অবরোধে আবদ্ধ। পৃথিবী, । মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
২
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে। ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
২ ২
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে। কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
২
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, । অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

পড়লে মনে হয় সংস্কৃত ভাষার কোনো বিখ্যাত কবি পৃথিবী সম্পর্কে বন্দনা-স্তোত্র রচনা করেছেন। এইরূপে অক্ষরমাত্রিক ছন্দেও কবি সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ ধ্বনিসৌকর্য ও লীলাভঙ্গিমাময় গতির সঞ্চার করতে পেরেছেন এবং কতকগুলি গভীর আত্মজিজ্ঞাসার কবিতায় উপনিষদের অনুরূপ গম্ভীরতাও এনেছেন।

মহাকবির যে শিল্প-প্রতিভা সংগীতে বিচিত্র সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে, কাব্যে সংস্কৃত ধ্বনিগাম্ভীর্যের সঙ্গে কোমলা বঙ্গবাণীর

পরিণয় ঘটিয়েছে, সংস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে বাংলা যাত্রারীতি মিশিয়ে নাটককে অভীষ্ট ভাবসংকেতের উপযোগী ক'রে তুলেছে, নৃত্যের সঙ্গে সংগীত ও কথার মিশ্রণে বাঙালিকে অভিনব আর্টের আস্বাদন দিয়েছে, সেই প্রতিভাই কাব্যজীবনের সায়াহ্নে গতানুগতিকতার বিরোধী এই নূতন রূপসৃষ্টিতে কবিকে নিয়োজিত করেছে। এর ব্যাপ্তির সীমা নির্ণয় বা মূল্য নিরূপণ করার দিন ঠিক আজও আসেনি।

'পুনশ্চ' একালের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে এক হিসাবে পৃথক। এর অনেকগুলি কবিতায় কবি সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করতে চেয়েছেন—যার বাইরে আছে ক্ষুদ্র কাহিনী, সর্বত্র বিজড়িত আছে কবিমানসের সহানুভূতি। রবীন্দ্রনাথের যে-কবিমানস অতুলনীয় ছোটগল্পগুলির সৃষ্টি করেছে, তা-ই গদ্যছন্দের সুবিস্তৃত বাহন অবলম্বন ক'রে সহজেই কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বাস্তবতার মধ্যে বিচরণ করেছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলি কাব্যাকারে ছোট গল্প হয়নি, কারণ, এগুলির মধ্যে ঘটনার বৈচিত্র্য এবং ঘটনার আঘাতকে বশীভূত ক'রে নায়ক-নায়িকার মনোবেদনা ও কবির কাব্যরস উচ্ছলিত হ'য়ে উঠেছে, যেমন ঘটেছে 'সাধারণ মেয়ে' বা 'বাঁশি' কবিতায়। প্রথমটিতে কবি একালের সমাজের অবহেলিত সেই নারীর বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন যে 'শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে তার ন্যায্য অধিকার পায় নি; আর দ্বিতীয়টিতে বাইরের জীবনে ক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত মানুষের অন্তরের চিরন্তন মিলনস্বপ্নের কথা জানিয়েছেন—

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।

শেষ চিঠি, ক্যামেলিয়া, ছেলেটা প্রভৃতি কবিতায় ঘটনার পরিসর অপেক্ষাকৃত বেশি হ'লেও এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষের দিকে ছোটগল্পের পরিণামী আঘাত অনুভব করা গেলেও, কাব্যরূপ বিচার ক'রে বলা যায়, কবি এগুলিকে কাব্যই করতে চেয়েছেন, গল্প নয়। এই দিক দিয়ে পুর্বেকার 'পলাতকা' রীতিমত কাব্য, কবির বিশিষ্ট নিসর্গাশ্রিত জীবন-উপলব্ধির বিস্ময়ে স্পন্দিত—যে উপলব্ধি পরোক্ষ-ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র।

কবির সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখার এই আগ্রহ মানুষকে অতিক্রম ক'রে ইতর প্রাণী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অব্যবহিত পুর্বে 'বনবাণী'তে কবির আত্মীয়তা প্রকৃতির ক্ষুদ্র জীব পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। একালে তারই প্রসার এবং তাদের জীবনরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করার আগ্রহ দেখা যায়। পরবর্তী 'আকাশপ্রদীপ'এর পাখির ভোজ ও বেজি, 'আরোগ্য'এর চড়ুই পাখি, এবং আলোচ্য 'পুনশ্চ'র শালিখ, মাকড়সা, পিঁপড়ে, রাস্তার কুকুর, এমন কি গুবরে পোকা পর্যন্ত বিস্তৃত কবির সহানুভূতি একত্র মিলিয়ে একালের প্রীতিপ্রবণ কবিমানসটিকে বুঝতে হবে। মাকড়সা ও পিঁপড়ে সৃষ্টির

চৈতন্যপ্রবাহের সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হ'লেও ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষাময় অন্তর কবির কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল, পুনশ্চতে কবির এই আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। জীবজগতের প্রতি যে-আত্মিক আকর্ষণের পরিচয় সোনার তরী, চৈতালি কাব্যে বহুপুর্বেই কবি অনুভব করেছিলেন তা পুর্বেকার তীব্র ব্যাকুলতা ও কল্পনামূলকতা অতিক্রম ক'রে বনবাণীর মধ্য দিয়ে এখানে এসে সহজ সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে নূতন-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে মনে হয়, যখন শুনি এই কীটপতঙ্গের জীবন-ধারাকে লক্ষ্য ক'রে কবি বলছেন—

ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠেছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা।

অথবা একক বিচরণশীল শালিখকে দেখে ভাবছেন—

জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।

কবির এই সময়কার উদার মানবীয় ভাবের মধ্যে যে বাস্তবতা বিদ্যমান তা তাৎকালিক অস্পৃশ্যতা-সমস্যা অবলম্বন ক'রে রবিদাস, রামানন্দ প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে প্রকাশলাভ করেছে। 'কালের যাত্রা' নাটিকায় কবি এবিষয়ে তাঁর মনোভাবের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ চিত্রিত করেছেন। পরিণত জীবনবোধ থেকে উৎসারিত এই সহজ বাস্তব মানবপ্রীতির দিকটি সায়াহ্নের বিদায়ী কবিচিত্তকে স্বাভাবিকভাবেই আবিষ্ট ক'রে রেখেছে।)

এ ছাড়া পুনশ্চতে আত্মজীবন-অনুভবের কয়েকটি কবিতাও রয়েছে, যা থেকে পাঠক কবির বিশিষ্ট জীবনানুরাগ ও অবিচলিত প্রকৃতিপ্রীতির

নিশ্চিত পরিচয় পাবেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি কোনো কোনো অংশে তত্ত্বমূলক ও বিবৃতিপ্রধান হয়েও স্থানে স্থানে অনুভূতির স্পর্শে রমণীয় হয়ে উঠেছে। অনুভূতির প্রকাশ ও অনুভূতির বিবৃতির মধ্যে কবিকর্মের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রভেদ সামান্য থাকে এবং এক আধারে বিদ্যমান থেকে সহজেই একটি অপরটিকে বশীভূত ক'রে বিরাজ করতে পারে। শেষ সপ্তক ও পত্রপুট আলোচনায় আমরা এই দিকটির বিশেষ পরিচয় পাব। পুনশ্চর নূতন কাল, খোয়াই, বাসা প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা এই শ্রেণীর, এবং এগুলির মধ্যে 'নূতন কাল'এ যদিও কবি খ্যাতি-অখ্যাতির প্রশ্ন তুলেছেন, পুরাতন দিনের এবং নূতন দিনের কবিমানসের মধ্যে একটা সেতু স্থাপন করতে চেয়েছেন, এবং তাঁর কাব্যের নূতন পালার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, যেমন—

দিনের শেষে নোতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে—

'খোয়াই'এ কবিমানসের চিরন্তন প্রকৃতিপ্রীতিই বিদায়ের কারুণ্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে—
তার পরে ?
তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,
পুবদিকের মাঠে চরবে গোরু।

—ইত্যাদি।

'বাসা' কবিতায়ও ময়ূরাক্ষীর কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও মানব-প্রীতির সঙ্গে কবির চিরন্তন রোম্যান্টিক বাসনাই স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিওনি কোনো দিন।—
ওর নামটা শুনিনে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘননীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।
আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

আত্ম-মানস-বিবৃতির সঙ্গে যুক্ত কবির এই অনুভূতিময় কবিতাগুলি সহজেই কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

অল্প পূর্বে আমরা নির্দেশ করেছি যে গীতিকাব্যে আত্মজীবনবিবৃতি এবং ক্ষণিক মুহূর্তের আত্ম-অনুভূতির মধ্যে ব্যবধানের সীমা টানা দুষ্কর। এ ধরণের কবিতার একটি বিশেষ মূল্য আছে, তা এই যে, এগুলির সহায়তায় অতি সহজেই এবং প্রায় নির্ভুলভাবে পাঠক কবিমানসের রহস্যলোকে প্রবেশ করতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাব্য-রসের অপ্রতুলতা ঘটলেও সৃষ্টিক্রিয়ানিপুণ কবির মনোরাজ্য দর্শনের বিস্ময় থেকে বঞ্চিত হয় না। 'শেষ সপ্তক' পাঠের পূর্বে আমাদের এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা 'পুনশ্চ'তে কবির

নিরাসক্ত জীবনপ্রীতি পেয়েছি, বাস্তব প্রকৃতি-অনুরাগ পেয়েছি এবং বিদায়কালে উদাসীন মহাকালের লীলার সঙ্গে কবির নিজ জীবনকে মিলিয়ে নেওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। এ সমস্তই শেষ সপ্তকে আত্ম-জীবনবোধের সঙ্গে আরো প্রবলভাবে চড়া সুরেই প্রকাশ পেয়েছে। সায়াহ্নেও রসতৃষায় অধীর, কামনাহীন বিশুদ্ধ আর্টের উপভোগে আগ্রহশীল নির্লিপ্ত কবিমানসকে এতটা সমগ্র ও ব্যাপকভাবে অতি সহজে জানার অবকাশ ইতিপুর্বে আর হয়নি। জীবনস্মৃতির বাহক অথচ পরিণত জীবন-উপলব্ধিতে স্থির আত্মানুসন্ধানী কবিসত্তার নিঃশেষ পরিচয় একমাত্র শেষ সপ্তকে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

সমকালের লেখা 'বীথিকা'তেও কবির জীবনচিত্র রয়েছে, কিন্তু তা প্রায়শই বহু পুর্বেকার রোম্যান্টিক কাব্য-স্মৃতিতে পূর্ণ। এর কয়েকটি কবিতায় সোনার তরীর অমানবী বিদেশিনীর পদধ্বনিও শোনা যায়, 'কৈশোরিকা' কবিতাটিতে স্পষ্টতই পুর্বতন নিরুদ্দেশ-যাত্রার সহচরী এবং শেষ জীবনের লীলাসঙ্গিনীর চিত্র এঁকে কবি একালেও আমাদের অপ্রত্যাশিত বিস্ময় এনে দিয়েছেন। কিন্তু পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, এই সময়কার শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলি পদ্যের চেয়ে গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশের জন্যে অধিকতর আগ্রহশীল। বীথিকার প্রথম মুদ্রিত কবিতাটিতে আমরা একালের কবিচিত্তের একটা মোটামুটি পরিচয় লক্ষ্য ক'রে শেষ সপ্তকের বিশ্লেষণমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবেশ করব। কবিতাটির নাম 'অতীতের ছায়া', আত্মজীবনানুভূতি এর রসবস্তু।

মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—
দিবালোক অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে ;

'সে' আখ্যায় অভিহিত বৃহত্তর মানবজীবনের বা সমগ্র সৃষ্টির শিল্পী এখানে কবির গোচরীভূত হয়েছে। পূর্বে যাকে কবি মহাকাল বলেছেন, বলাকা-পুরবীতে জীবনের অবিরাম গতির মুখে যাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, স্বকীয় বিদায়ের যাত্রা-মনোভাবের মধ্যে সেই নিরাসক্ত কালকেই বার বার লক্ষ্য করেছেন—

শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,

এবং অধুনা নিজজীবনে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করছেন—

তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।

তা ছাড়া কবি অতীতের বিশ্বোপলব্ধির সঙ্গে বর্তমানের আত্মসংবৃত অবস্থার পার্থক্য জানাচ্ছেন—

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।

শেষ সপ্তকের কয়েকটি কবিতাতেই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কালচক্রকে কবি সত্যদ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করছেন, যেমন করেছেন 'বলাকা'র কালে। বিশেষ এই যে এর সঙ্গে কবি বর্তমানে তাঁর জীবন-বীণাকে নিঃশেষে মিলিয়ে নিতে চান। কবি দেখেছেন তাঁর চারদিকে প্রয়োজনের এবং খ্যাতির উপকরণ জড় হয়েছে। লোকে তাঁর অন্তর্নিহিত মুক্ত নির্লিপ্ত কবি-প্রতিমাকে না দেখে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই চিনেছে। এবং ফলে লৌকিক জীবনে কবির বাইরের 'আমি' নানা জালে জড়িত হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন-সম্পর্কে যুক্ত ব্যক্তিত্বের এই দিকটি কবি পূর্বেও

বহুবার বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। যখনই অভ্যাসের জীবনে তাঁর চৈতন্য সংকুচিত হয়েছে তখনই আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করেছেন—যে-আত্মার পরিচয় শুধু কবিত্বে, শুধু অনুভূতিতে বা প্রজ্ঞামূলক উপলব্ধিতে।

শেষ সপ্তকের সাত সংখ্যক কবিতায় সৃষ্টি ও প্রলয়ের ইতিবৃত্তের কল্পনার মধ্যে কবি প্রার্থনা করছেন "হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা"। এই মনোভাবই উৎকৃষ্টতর কবিকল্পনার সঙ্গে একুশ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। অনন্তকালের মধ্যে ও অসীম মহাকাশের মধ্যে পার্থিব সৃষ্টি ও পার্থিব কীর্তিকে স্থাপন ক'রে কবি দেখলেন, ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার পরিচয় বারে বারে লুপ্ত হয়ে গেছে—

ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,
নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

সেই অসীমকালের মধ্যে অধুনা-আত্মবিচারক কবি নিজকে মুহূর্তের জন্যে প্রতিফলিত ক'রে বুঝলেন যে কাব্যকীর্তির দ্বারা নিঃশেষ অমরত্ব লাভ করা অসম্ভব এবং তার আশাও মূঢ়, অর্থহীন। কিন্তু আত্ম-অনুভূতির মধ্যে যে পাঁওয়ার সত্য রয়েছে তা মুহূর্তের হ'লেও নিজ জীবনের দিক থেকে তার মূল্য চিরন্তন, তা অমর, যেহেতু তা সীমার অতীত। কবি বলছেন—

অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় প'ড়ে বাতাসে যায় উড়ে।

আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে ?
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার ক'রে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

পরবর্তী পত্রপুট কাব্যে দেখা যাবে জীবনবিবৃতির মধ্যে কবি কখনো স্তব্ধ হয়ে নিরাসক্তভাবে ঋতুপর্যায়ের আবর্তন প্রত্যক্ষ করছেন এবং স্বীয় বৈরাগী চিত্তের মধ্যে কালের পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রেও রসোপলব্ধি এবং যাত্রাকে একত্র মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। সেখানেও প্রকৃতি-রস-বিহ্বলতার উপসংহারে কবি বলছেন—

সেই সুরে তাম্রবরণ তপ্ত আকাশে
বাতাস হুহু ক'রে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্যভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিঃশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না
এক দিনেরও জন্যে।

এ হ'ল চলার সঙ্গে যুক্ত কবির বাসনাহীন মর্ত-উপলব্ধি—ফাল্গুনীর কাল থেকে প্রসারিত, সার্বজনীনত্ব থেকে ব্যক্তিগত পরিচয়ে আবদ্ধ প্রত্যক্ষ সত্য। যাত্রা ও স্থিতির, বৈরাগ্য ও ভোগের যে অদ্ভুত সমন্বয় কবি তাঁর পরিণত কল্পনায় ঘটিয়েছেন শেষ জীবনে তাঁকে ব্যক্তিগত পাথেয়-রূপেও সেই মনোভাবকে অবলম্বন করতে দেখি। কবিকে এখন

মুগ্ধ করছে যাত্রার মধ্যেকার রসোপলব্ধি, অনিত্যের মধ্যে যা নিত্য—

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল

শেষ সপ্তকে কবি বিশেষ জোরের সঙ্গে তাঁর কবিস্বরূপটি সাধারণের গোচর করতে চান। নাম নয়, কীর্তি নয়, এমন কি অসংখ্য রচনার মধ্যে বিজড়িত তাঁর ভগ্ন ছিন্ন নানা রূপ নয়, কেবল তাঁর অনুরাগের দিকটিই যে একান্ত সত্য সেই কথা জানাতে চান। ছয় সংখ্যক কবিতায় খ্যাতি, অখ্যাতি, প্রয়োজন, অভ্যাস, সমস্ত কিছু বাইরের বস্তুকে তিনি কালের ধূলির নিকটে নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন দেখা যায়, শুধু করেন নি তাঁর অনুভূতির স্বপ্নময় সত্যমুহূর্তগুলিকে। তাঁর এই কবি-স্বরূপকে লৌকিক প্রয়োজন-কোলাহল থেকে মুক্ত অবস্থায় দেখার আগ্রহ এই কাব্যে বার বার প্রকাশিত হয়েছে। তাই যে সব মানুষ তাঁর বাইরের ব্যক্তিত্বকেই বড় ক'রে দেখেছে, কবি-স্বরূপকে দেখার বাসনা বোধ করেনি, তাদের কাছে কবি শেষ নিবেদনে জানিয়েছেন—

সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে
রেখে যেয়োনা তোমার নৈবেদ্য ;
ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,
যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,
যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,
যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের
মিলের মাত্রা রেখে।

অন্য একটি কবিতায় সাধকের মতই কবি দেহ ও লৌকিক মনের সঙ্গে

তাঁর কবি-আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করেছেন—যে কবি-আত্মা চিরন্তন, নির্লিপ্ত এবং বিশুদ্ধ আনন্দলোকে উত্তীর্ণ। কবিতাটি তত্ত্বমূলক হ'লেও উপসংহারে কবির আত্ম-অনুভবের উৎসাহ নিশ্চিত কাব্যরাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে—

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

নয় সংখ্যক কবিতাতেই কবির আত্ম-অনুসন্ধানের দিকটা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পূরবীর আহ্বান, ক্ষণিকা প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে ভাবের দিক থেকে এই কবিতাটি তুলনার যোগ্য। শুধু তাই নয়, এই কবিতাটি পূর্বোক্ত কবিতাগুলির বা কবির আত্মরহস্য-অনুসন্ধান বিষয়ক সমস্ত কবিতার পরিপুরক ব'লে গৃহীত হতে পারে। পূরবীতে কবি অপূর্ব কাব্যানুভূতির মধ্যে আক্ষেপ জানিয়েছিলেন—

জানি জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনি।

অথবা—

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।

রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।

ঐ আক্ষেপকেই প্রকারান্তরে প্রশ্নরূপে এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন—

সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হ'ল ?
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?

অথবা—

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?

বিশেষ এই যে, এই কবিতাটিতে কবি পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করলেন যে আত্মরহস্যের সম্যক পরিচয়লাভ অসম্ভব, কারণ, স্রষ্টার নিষেধ আছে—

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।
আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;

তা হ'লে কি একে বহুকথিত 'মায়াশক্তি' বলা যাবে ? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক না কেন, কবির জিজ্ঞাসা যে সাধকদের আত্ম-জিজ্ঞাসার সগোত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শেষ সপ্তকের এই কবিতাগুলিকে আত্মজীবনবিবৃতি ব'লে দূরে রাখলে চলবে না, কারণ, এগুলিতে কবি তাঁর আত্মাকে জানতে চান ও জানাতে চান। বোঝাতে চান যে তিনি শুধু কবি, তিনি কোনো ধর্মের অনুসরণ করেন না, কোনো শাস্ত্রেরও নয় এবং তিনি কোনো বিশেষ যুগের নন, এমন কি আধুনিক কালেরও নন। আর এগুলিতে তত্ত্ব যা আছে তা কবির অনুভূতির বা অনুভূতিমিশ্রিত চিন্তার, অর্থাৎ কাব্যতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব নয়। কবি তাঁর আত্মবিবৃতিতে এই সংস্কার-মুক্তির দিকটী পত্রপুটের পনেরো সংখ্যক কবিতায় (কবি আমি ওদের দলে,—আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন—তু°) পরিস্ফুট ক'রে ব্যক্ত করেছেন, কবির ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত আলোচনায় যে বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

শেষ সপ্তকে কবি বারংবার তাঁর রহস্যলোলুপ আস্বাদমুখী চিত্তের কথা বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কবিতার মধ্যেও প্রমাণ করেছেন। চোদ্দ সংখ্যক কবিতায় অনুভবের মুহূর্তটিকে চরম মূল্য দিয়ে কবি বলেছেন—

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
তা গৌণ।

একদিকে তাঁর ভারবহুল অসাড় লৌকিক মনকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন—

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত ;
চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল ;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে (২৬ সং)

আর একদিকে তাঁর সুদূরের পিপাসু আত্মার চিরন্তনতাকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন ক'রে নিয়ে যায়
সুদূরে ;
বর্তমানের মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়। (ঐ)

অথবা তাঁর চিরন্তনের কবিরূপ দেখে দেশকালের অতীত পথিক জীবন-সায়াহ্ন এবং আধুনিক কালকে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে চলেছেন—

আমার এতকালের কাজের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি, দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য। (২৩ সং)

কবি সৃষ্টির অনিত্যতা ও উপলব্ধির নিত্যতা স্মরণ ক'রে বলছেন—

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

দেখা যায়, সায়াহ্নকালে কবির এই একান্ত আত্মলীন অবস্থায় প্রয়োজনের জগৎ তাঁর কাছে অনিত্য বা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। গোধূলি-পর্যায়ে কবির এটি একটি বিশিষ্ট রূপ।

এই কাব্যগ্রন্থে কবির তত্ত্বস্পর্শহীন, স্বাধীন মনের উপলব্ধিগত মুহূর্তের কয়েকটি অবিনশ্বর পরিচয় রয়েছে জলভরা, শুকতারা, অনেক কালের একটিমাত্র দিন প্রভৃতি সম্পর্কিত কবিতায়। জলভরা কবিতায় কবি প্রকৃতিকে স্ব-ভাবে গ্রহণ ক'রে একালেও পূর্বের মত অহেতুক-

আনন্দের মুক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন দেখে তাঁর কবিমানসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয়রহিত হওয়া গেল। আরো আনন্দ পাওয়া গেল ফাল্গুনীর বাউলের সঙ্গে কবির এখানেও একাত্মতা লক্ষ্য ক'রে (৪১ সংখ্যক দ্রঃ)। ৪৩ সংখ্যক 'পঁচিশে বৈশাখ' নামক কবিতায় কবি তাঁর কাব্যজীবনের নিঃশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি একদিকে বিশুদ্ধ আনন্দে জীবন্মুক্তির প্রয়াসী, আর একদিকে জন্মজন্মান্তরের যাত্রী। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে।

শেষ সপ্তকের আত্মবিশ্লেষণ পত্রপুটে প্রকটতর হয়েছে এবং কবি তাঁর বিশেষ উপলব্ধির মুহূর্তগুলির একটা মানসিক চিত্র উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে কবি রসচেতনা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার যোগ্য। কবির নিসর্গ-অনুভূতি যে একটী সত্যের উপলব্ধি তা জানাতে গিয়ে কখনো বলছেন—

এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ,

রসবিহ্বলাবস্থায় কবিমানসে যে লৌকিকতা-মুক্ত আনন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ হয় কখনো তার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। এ হ'ল কবির অনির্বচনীয়কে বচনীয় করার চেষ্টা—

যেন চলে গেলেম পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে
তাকে দেখা যায় দূরবীনে।
যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হ'ল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।

ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।

তেরো সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়, কবি তাঁর আনন্দানুভূতির আধাররূপ অন্তরিন্দ্রিয়গুলিকেই পত্রপুট আখ্যায় অভিহিত করছেন এবং ব্যাখ্যায় বলছেন—

আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পনেরো সংখ্যক কবিতায় আত্মবিবৃতিতে তিনি তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত কবি-স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বলেছেন যে তিনি ধর্ম, শাস্ত্র আচার বা নীতির প্রভাবের উর্ধ্বে। এখানে স্পষ্টভাবে বাউল-শ্রেণীর সাধকদের সঙ্গে কবি নিজের মিল দেখিয়েছেন—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।

* * *

কবি আমি ওদের দলে,—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,

এই কবিতাটির কথা আমরা প্রয়োজনবশে বার বার উল্লেখ করেছি।

পত্রপুটের আর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে মানুষ-দেবতার প্রতি কবির শ্রদ্ধা অর্পণে। মানুষের প্রতি অনুরাগ, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নরদেবতার উপলব্ধি গীতাঞ্জলির কালে কবির অরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন অচলায়তনে কবির নবজাগরিত পরিস্ফুট মানবানুরাগের বাস্তব প্রকাশ মুদ্রিত রয়েছে।

বলাকায় গতি ও অভিব্যক্তির অনুভবের মধ্যে দুঃখব্রত মানুষের জয়যাত্রার কল্পনা কবিকে কিরূপ অনুপ্রাণিত করেছিল তা 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার আলোচনা কালে আমরা দেখেছি। বাউলদের জীবন-সাধনার প্রতি কবির অনুরাগও ঐকালেই পূর্ণতালাভ করেছে। তা ছাড়া এই অনন্যসাধারণ মানবীয়তা The Religion of Man এবং মানুষের ধর্ম গ্রন্থদুটিতে তত্ত্বাকারে এবং আত্মজীবনবিবৃতির সহায়তায় পূর্বেই উপস্থাপিত করা হয়েছে।

শেষ-পর্যায়ে মানব-মহিমার ঐ দিকটি কখনো গতিধর্মমূলক জীবনবোধের প্রেরণায় কখনো বা বাস্তব সামাজিক চেতনার প্রেরণায় নানাভাবে প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। পত্রপুটের বারো সংখ্যক কবিতায় কবি দুঃখের পথে ধাবমান কর্মী মানুষকে উচ্চে তুলে ধরেছেন এবং কলাশিল্পী তিনি তাদের সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবনের স্বাদ পাননি ব'লে আক্ষেপ করেছেন—

যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।

*　　　*　　　*

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
　　　যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
　　　ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

তিনি আরো বলেছেন, যারা দুর্গম ও ভীষণকে বাস্তব পথে জয় করেছে তারাই অমৃতের অধিকারী। যেহেতু নিরাপদ নিশ্চেষ্ট কবিজীবন তিনি শুধু স্বপ্নেই কাটিয়েছেন সেইহেতু তিনি সাধারণ মানুষের বাইরেই রয়ে গেছেন—

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়-জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়।

কবির এখানকার এই বেদনার উক্তির সঙ্গে পরবর্তী বিখ্যাত 'ঐকতান' কবিতার 'এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক' প্রভৃতি পঙ্ক্তি তুলনার যোগ্য এবং কবির এই অসম্পূর্ণতা-কল্পনার কারণরূপে বর্তমান তাঁর প্রবল মানবানুরাগের দিকটি বিবেচ্য। এই গ্রন্থে কবির মানবপ্রেমিকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ফুটে উঠেছে (ষোল সংখ্যক) নিপীড়িতা আফ্রিকা সম্বন্ধে কবিতায়। ইটালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার এই কবিতাটির রচনার প্রেরণা দিয়েছিল। কবিতাটির শেষে এই 'যুগান্তরের কবি' ঐ 'মানহারা মানবী'কে যে মর্যাদা দান করেছেন, তাতে পশ্চিমের রাষ্ট্রীয় সভ্যতার জঘন্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

পত্রপুটের বিখ্যাত পৃথিবী-প্রণামের কবিতাটি কবি-প্রতিভার সায়াহ্নের আশ্চর্য বাণীচাতুর্য ও উদার কল্পনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'পৃথিবী'র কবি যদিচ প্রথম যৌবনের 'বসুন্ধরা'রই কবি তথাপি পরিণত উপলব্ধির মহৎ প্রকাশে নূতন এবং সার্বজনীন সত্যদৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। গোধূলির ধূসরতা ও বিদায়ের সজলতার মধ্যেই যে কবি পৃথিবীকে শেষ প্রণতি জানাচ্ছেন, করিতাটির শেষের 'হে উদাসীন পৃথিবী, আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে তা পরিস্ফুট। কিন্তু 'বসুন্ধরা'র কল্পনাসর্বস্ব পৃথিবী-প্রীতি এবং বিচ্ছেদ-ভীরু ব্যাকুলতা এখানে নেই। তার পরিবর্তে আছে বলিষ্ঠ জীবনবাদ এবং Sublime এর প্রতি আকর্ষণ। বসুন্ধরাকে এখানে কবি কেবল একটি পৃথক সত্তারূপেই দেখছেন

না, কর্ত্রী শক্তিরূপে অনুভব করছেন এবং দুঃখজয়ী মানুষের মহিমার জনয়িত্রী ব'লে অভিনন্দিত করছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মানুষের মূল্যেই কবি পৃথিবীর মূল্য পরীক্ষা করেছেন। কবিতাটির মধ্যে ক্রমোৎকর্ষের পথে যাত্রী মানুষের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে এবং যেহেতু দুঃখকে বরণ, মৃত্যুকে অস্বীকার তথা প্রেম ও সৌন্দর্য উপলব্ধির মুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের সার্থক জীবনযাপনের সুযোগ এই ভয়ংকরী ও সুন্দরী, রুদ্রাণী ও কল্যাণী পৃথিবী থেকেই সম্ভব হয়েছে, সেইহেতু কবি সৃষ্টি-পালন-সংহারের সমস্ত দায়িত্ব পৃথিবীর উপরেই অর্পণ করেছেন এবং তাকেই প্রণাম জানিয়েছেন। সুতরাং এই কবিতাটিও তাঁর সুদৃঢ় মানবানুরাগ ও মানবমূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত বলা যেতে পারে।

এই কবিতাটির পৃথিবী-বন্দনায় ব্যবহৃত ঐশ্বর্যময় ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের দেবতা-বন্দনার রূপ অনুভব করা যায়। গদ্যচ্ছন্দে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির শক্তি কতদূর প্রসারিত হতে পারে কবি ধ্বনিসংঘাতসৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছেন। ছন্দের আলোচনায় এখান থেকে উদাহরণ গ্রহণ ক'রে এর শক্তির দিকটি দেখাতে চেষ্টা করেছি। ছন্দোভঙ্গির সঙ্গে সুনির্বাচিত শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্য এবং শব্দার্থের মিলন-রচনার অত্যদ্ভুত শক্তি কবিকে গোধূলির ম্লানিমা থেকে উদ্ধার ক'রে ক্ষণকালের জন্যে যেন পরিণত যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। একদিকে যেমন,

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা—
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,—
তোমার লীলক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে

অথবা—

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা,

প্রভৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই বন্দনা সম্পূর্ণ ও রমণীয় হয়ে উঠেছে, অন্য দিকে তেমনি 'নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা' প্রভৃতির মধ্যে পৃথিবীর স্নিগ্ধ-গম্ভীরতার, এবং 'আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য' প্রভৃতির মধ্যে ভয়ানকের বর্ণনা অপূর্ব হয়েছে। বস্তুতঃ এমন উদার কল্পনা এবং ভীষণ-মধুর রূপের এমন সুন্দর বর্ণনা রবীন্দ্রকাব্যেও বেশি নেই।

প্রকাশভঙ্গির অপরিসীম নৈপুণ্যে মণ্ডিত হ'লেও স্থানবিশেষে দুএকটি চলিত শব্দের প্রয়োগের জন্যে কবিতাটি কোনো কোনো দিক থেকে নিন্দিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সৃষ্টির আদিকালের পরুষ বিশৃঙ্খলতার বর্ণনার পঙ্‌ক্তি দুটি—

তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।

অথবা, ঝড়ের বর্ণনার স্থানটি—

সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।

কিন্তু ভাষার সমালোচনাকালে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা গদ্যচ্ছন্দের কবিতা পড়ছি। এক্ষেত্রে সাধারণ কথাবার্তার ভঙ্গিই কবি অনুসরণ করতে চেয়েছেন। সাধারণ গদ্যে যেমন আমরা অসংখ্য তদ্ভব ও দেশি শব্দের সঙ্গে প্রয়োজনবশে সংস্কৃতের ব্যবহারে দ্বিধা করি না, সেইরকম স্বাধীনতাই কবি এখানে

অবলম্বন করেছেন। পদ্যে যদিও ভাষা ব্যবহারের একটা সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব, গদ্যকাব্যে ভাবানুযায়ী বাগ্‌বিন্যাসে কবির স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করলেই নয়। দেখা যায়, কবি অন্যত্রও সহজেই যে ভাষা এসেছে তাই ব্যবহার করেছেন, জোর ক'রে কোনো পরিবর্তন করেন নি। যেমন, 'জীবপালিনী আমাদের পুষেছ' এর জায়গায় 'জীবনপালিনী আমাদের পালন করেছ' অথবা 'শতশত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ' একে পরিবর্তন ক'রে শতশত ভগ্ন ইতিহাসের' এমন কথা বলেন নি। তা ছাড়া মনে হয়, এখানে 'পুষেছ' শব্দের ব্যবহারে পৃথিবীর বিরাটত্ব ও আমাদের ক্ষুদ্রত্ব এবং 'ভাঙা' শব্দে তুচ্ছতার ব্যঞ্জনা দিতে চান। ছিন্নপত্রে বর্ষার পদ্মার জলস্রোতকে কবি লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার সঙ্গে একজায়গায় উপমা দিয়েছেন এবং তা চমৎকারও হয়েছে। গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে কবি সেই সহজভঙ্গিই যেখানে প্রয়োজন অবলম্বন করতে চেয়েছেন। ঐ কবিতায় একদিকে পৃথিবীর আদিমতার ও নৃশংসতার চিত্র, আর একদিকে মধুর-গম্ভীর রূপের ও কল্যাণময়তার চিত্র। যেমন বর্ণনায় তেমনি ভাষাতেও কবি একটা বৈপরীত্য রাখার চেষ্টা করেছেন। কবিতাটির রূপনির্মাণকৌশল তার আভ্যন্তরীণ বর্ণনা-বৈপরীত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নয়সংখ্যক কবিতাতেও কবি ঝড়ের বর্ণনায় মৌখিক ভাষার শক্তি পরীক্ষা করেছেন—

> বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে,
> চালাচ্ছে ঝকঝকে খাঁড়া ;
> বজ্রশব্দে গর্জে উঠছে দিগন্ত ;

অথবা—

এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার,
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
ছুঁড়ে মারে টুকরো ডাল শুকনো পাতা,
চোখে-মুখে ছিটোতে থাকে কাঁকরগুলো ;

এ সকলের সঙ্গে 'দোসরহারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রি'র বর্ণনাকে কবি একত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন। ভাষায় শক্তিসঞ্চারের চেষ্টা কবির একালের বিভিন্ন সাহসিক প্রচেষ্টার অন্যতম। কিন্তু এজন্যে তিনি বিদেশি ভাষার ও সাহিত্যের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি, লৌকিক বাংলার সুপ্তশক্তি জাগ্রৎ করার চেষ্টা করেছেন। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে এ বিষয়ে আতিশয্য লক্ষিত হ'লেও নিম্নে উদ্ধৃত চলিত ভাষায় লেখা মানুষের দুঃসাহসিক যাত্রার বর্ণনা বলাকার অনুরূপ স্থানের চেয়ে খুব কম শক্তিসম্পন্ন এমন মনে হয় না—

সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহুযুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত ,
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি—
'পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।'

('চিরযাত্রী'—শ্যামলী)

আবার, পুরাতনের সৌন্দর্যরসপিপাসু কবি যখন একালের যন্ত্রচালিত ত্বরাতাড়িত নানা দ্বন্দ্বে পূর্ণ জীবনকে লক্ষ্য ক'রে নিম্নলিখিত রূপের আশ্রয়ে তার বর্ণনা দেন—

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্বৃত্ত।
কিন্তু ঢেউ করছে গর্জন,
শকুন করছে চীৎকার,
মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
খেপাজলের ঘূর্ণিপাকে।

('মিলভাঙা'—শ্যামলী)

তখন একথা স্বীকার করতে হয় যে কবির ভাবসংকেত লৌকিক ভাষার কৌশলেই সিদ্ধিলাভ করেছে।

এই অভিনব ছন্দঃকৌশল ও ভাষাভঙ্গির সঙ্গে একালে কবির দৃষ্টিও যে বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষের আশ্রিত হয়নি এমন নয়, কিন্তু অতি পরিচিত বস্তুকে গ্রহণ ক'রেও রহস্যদ্রষ্টা কবি অজ্ঞাতেরই অনুসন্ধান করেছেন, যেমন ঘটেছে পত্রপুটের হাটের বর্ণনাময় পাঁচ সংখ্যক কবিতাটিতে—

নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাকসবজির ঝুড়ি চুপড়িতে,
আঁটি-বাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।

মুক্ত কবিমানসের নির্বিশেষ অনুরাগের পরিচয়ই এখানে ফুটে উঠেছে। এর সঙ্গে তালি-দেওয়া আলখাল্লা-পরা বাউল একসঙ্গে মিশে গিয়ে হাটের ছবি যথার্থই পূর্ণ করেছে। এই রূপ কবির মনে যে বাস্তবতার বা স্বভাবরসের সৃষ্টি করেছে তা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি বলছেন—

হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।

নির্বিচারে সমস্ত বস্তুর মধ্যেই যে রহস্য লুকানো আছে পরিশেষে কবি নিজের সেই মনের কথাটিই বাউল-সংগীতের উদ্ধৃতিতে ব্যক্ত করেছেন—

হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধ'রে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।

পত্রপুটের তত্ত্ববিলাস থেকে 'শ্যামলী'তে এসে স্বভাবকাব্যের উদারতা অনুভব করা যায়, যদিও শ্যামলীর সর্বত্রই 'নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ' দেখা যায় না। কারণ, একান্তভাবে আত্মরতিযুক্ত কবির 'আমি' ('আঁমারি চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ' ইত্যাদি) বা 'কালরাত্রে' কবিতায় আত্মমানসবিবৃতি ও তত্ত্বভাবুকতার পরিচয় যথেষ্ট (তু°—চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।··· ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া, পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা—ইত্যাদি)। তবুও স্বপ্ন, বাঁশিওআলা, অকালঘুম, তেঁতুলের ফুল প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় কবির চিরকালের বিস্ময়মিশ্রিত অজানার অনুভূতি, এবং আখ্যান-বাহিত কয়েকটি কবিতায় ক্ষণিকের ও

অপ্রত্যাশিতের আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। 'চিরযাত্রী' কবিতাটির মধ্যে গতিধর্মী মানুষের মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

১৩৪৪-এর রোগমুক্তির পরেই লেখা 'প্রান্তিক' কয়েকটি লক্ষণে একালের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এখন থেকে গদ্যছন্দের একটা পালা প্রায় শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে এবং প্রান্তিকে কবি অষ্টাদশাক্ষর অমিত্রচ্ছন্দেই ভাববিন্যাস করেছেন। প্রান্তিকের ভাষা ও ভঙ্গিতে যেমন বলাকা-পুরবী কালের এমন কি তারও পূর্বেকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি এর আত্মদর্শনেও ঐ কালের সত্যদিদৃক্ষা, অরূপানুভূতি এবং নবজীবনের পথে যাত্রার আগ্রহ সূচিত করে। মৃত্যুর স্পর্শ লাভ ক'রে প্রান্তিকে কবি আগেকার মতই স্বার্থবাসনাহীন মুক্ত জীবনের অভিলাষী হয়ে উঠেছেন। এইজন্যে প্রান্তিকের কবিকে সহজেই জীবন-মৃত্যুর রহস্যদ্রষ্টা পরিণত উপলব্ধিতে স্থির পূর্বেকার কবির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। বলা যেতে পারে, পূর্বেকার রচনায় কবি যে সার্বজনীন সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, অধুনা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সেই সত্যে নিজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এক সংখ্যক কবিতায় মৃত্যুর স্পর্শ, তন্দ্রা ও জাগরণ, আলোক ও আঁধারের মিশ্রণের অস্পষ্টতা এবং পরিশেষে নবজীবনে নিষ্ক্রমণের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুস্নানে যে জীবন শুচি, শুভ্র, অনন্ত হয়ে ওঠে তা জানাতে গিয়ে কবি বলছেন—

পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীরবেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হ'ল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।

* * * বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

দুই চার পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যার কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুর সহায়তায় স্থূল জৈব-জীবনের বাসনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কবি মনে করছেন, 'সংসারের বিচিত্র প্রলেপ, বিবিধের বহু হস্তক্ষেপ, অযত্নে অনবধানে' তাঁর জীবনের আদিমূল্য হারিয়ে গেছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সেই অকলঙ্ক জীবন তিনি ফিরে পাবেন—

আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদিনির্ঝরতলায়।

তিন সংখ্যক কবিতায় 'জানিলাম একাকীর ভয় নাই, ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে নৈবেদ্য বা গীতাঞ্জলির অরূপনিষ্ঠ কবিকেই মনে পড়ে। আবার—

পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোর বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

প্রভৃতি উক্তিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনলাভের জন্যে উৎসুক ফাল্গুনী-বলাকার বৈরাগী যাত্রী কবিই যেন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

পার্থিব জীবনে নামের মোহ বা অহংকারের গ্লানি থেকে মুক্তির আগ্রহ কবির এ কালের মননময় বহু কবিতায় যেমন, তেমন

প্রান্তিকেও প্রকাশ পেয়েছে—'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে' প্রভৃতি তার প্রমাণ। 'মৃত্যুদূত এসেছিল' প্রভৃতি দশ সংখ্যক কবিতায় কবি এই ব'লে বেদনা প্রকাশ করছেন যে, মৃত্যুর স্পর্শে তিনি জেগে উঠলেও আত্মিক জ্যোতির রহস্য তাঁর কাছে সম্যক উদ্‌ঘাটিত হয়নি এবং আশা করেছেন যে শেষ যাত্রায় তিনি চরিতার্থতা লাভ করবেন। ছয় এবং সাত সংখ্যক কবিতায় কবি বর্ণগন্ধময় অনির্বচনীয় পার্থিব রসমুহূর্তগুলিকে মুক্তির মূল্যে গৌরবান্বিত করেছেন, অথচ মৃত্যুর 'সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়' অগ্রসর হবার আকাঙ্ক্ষাও জানিয়েছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, কবির এই দ্বিমুখী ধারণার মধ্যে বিরোধ নেই, জীবনকে গ্রহণ ও জীবনকে অতিক্রম তাঁর উপলব্ধিতে একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

প্রবল জীবনানুরাগ বা মানবীয়তার বশবর্তী হয়েই কবি পীড়ন-মূলক রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন। পূর্বে 'প্রশ্ন' কবিতার আলোচনায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ জীবনবাদের স্বরূপ জানিয়েছি এবং ঐ প্রসঙ্গে প্রান্তিকের শেষমুদ্রিত 'নাগিনীরা চারিদিকে' প্রভৃতি ক্ষুদ্র অথচ বহুশ্রুত কবিতাটির কথা উল্লেখ করেছি। প্রান্তিকের সতেরো সংখ্যক কবিতাটিও ('যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে') এ বিষয়ে রবীন্দ্রমানসের পরিচায়ক একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। এই কবিতাগুলি পত্রপুট, নবজাতক, সেঁজুতি ও জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের যুদ্ধ সম্পর্কে কবিমানসের প্রতিক্রিয়ার কবিতা-গুলির সঙ্গে একত্র আলোচ্য এবং এদের সকলের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রার্থনা, মৃত্যু-অস্বীকার, মহাকালের ধারণা, আশাবাদ প্রভৃতি পূর্বেকার দার্শনিক উপলব্ধির সমসূত্রে বিচার্য।

* * * বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

দুই চার পাঁচ প্রভৃতি সংখ্যার কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুর সহায়তায় স্থূল জৈব-জীবনের বাসনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কবি মনে করছেন, 'সংসারের বিচিত্র প্রলেপ, বিবিধের বহু হস্তক্ষেপ, অযত্নে অনবধানে' তাঁর জীবনের আদিমূল্য হারিয়ে গেছে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সেই অকলঙ্ক জীবন তিনি ফিরে পাবেন—

আদিম সৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদিনির্ঝরতলায়।

তিন সংখ্যক কবিতার 'জানিলাম একাকীর ভয় নাই, ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে নৈবেদ্য বা গীতাঞ্জলির অরূপনিষ্ঠ কবিকেই মনে পড়ে। আবার—

পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোর বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

প্রভৃতি উক্তিতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনলাভের জন্যে উৎসুক ফাল্গুনী-বলাকার বৈরাগী যাত্রী কবিই যেন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

পার্থিব জীবনে নামের মোহ বা অহংকারের গ্লানি থেকে মুক্তির আগ্রহ কবির এ কালের মননময় বহু কবিতায় যেমন, তেমন

প্রান্তিকেও প্রকাশ পেয়েছে—'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে' প্রভৃতি তার প্রমাণ। 'মৃত্যুদূত এসেছিল' প্রভৃতি দশ সংখ্যক কবিতায় কবি এই ব'লে বেদনা প্রকাশ করছেন যে, মৃত্যুর স্পর্শে তিনি জেগে উঠলেও আত্মিক জ্যোতির রহস্য তাঁর কাছে সম্যক উদ্‌ঘাটিত হয়নি এবং আশা করেছেন যে শেষ যাত্রায় তিনি চরিতার্থতা লাভ করবেন। ছয় এবং সাত সংখ্যক কবিতায় কবি বর্ণগন্ধময় অনির্বচনীয় পার্থিব রসমুহূর্তগুলিকে মুক্তির মূল্যে গৌরবান্বিত করেছেন, অথচ মৃত্যুর 'সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়' অগ্রসর হবার আকাঙ্ক্ষাও জানিয়েছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, কবির এই দ্বিমুখী ধারণার মধ্যে বিরোধ নেই, জীবনকে গ্রহণ ও জীবনকে অতিক্রম তাঁর উপলব্ধিতে একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

প্রবল জীবনানুরাগ বা মানবীয়তার বশবর্তী হয়েই কবি পীড়নমূলক রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন। পূর্বে 'প্রশ্ন' কবিতার আলোচনায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ জীবনবাদের স্বরূপ জানিয়েছি এবং ঐ প্রসঙ্গে প্রান্তিকের শেষমুদ্রিত 'নাগিনীরা চারিদিকে' প্রভৃতি ক্ষুদ্র অথচ বহুশ্রুত কবিতাটির কথা উল্লেখ করেছি। প্রান্তিকের সতেরো সংখ্যক কবিতাটিও ('যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে') এ বিষয়ে রবীন্দ্রমানসের পরিচায়ক একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। এই কবিতাগুলি পত্রপুট, নবজাতক, সেঁজুতি ও জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের যুদ্ধ সম্পর্কে কবিমানসের প্রতিক্রিয়ার কবিতাগুলির সঙ্গে একত্র আলোচ্য এবং এদের সকলের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রার্থনা, মৃত্যু-অস্বীকার, মহাকালের ধারণা, আশাবাদ প্রভৃতি পূর্বেকার দার্শনিক উপলব্ধির সমসূত্রে বিচার্য।

প্রান্তিকের পূর্বে এবং রুগ্নাবস্থার পূর্বে লেখা 'সেঁজুতি'র কয়েকটি কবিতায় নিরাসক্ত কবি-সাধকের বৈরাগী মনের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। জীবনের পথপ্রান্তে এসে কবি পার্থিবের মধ্যবর্তী অপার্থিব রসসম্পদকে তুচ্ছ করছেন না সত্য, কিন্তু লোভীর মত জীবনকে আঁকড়ে থাকতেও চান না। যায় যাক, যে কদিন থাকে থাকুক—এরূপ পূর্বেকার পরিচিত মনোভাব নিয়েই কবি বিশ্বকে উপভোগ করছেন এবং এর মধ্য দিয়ে মুক্তির আনন্দ পাচ্ছেন। 'যাবার মুখে' কবিতায় জীবনের ঐ অপার্থিব রসাস্বাদের বর্ণনা দিয়ে উপসংহারে কবি বলছেন—

যায় যদি তবে যাক,
এল যদি শেষ ডাক,—
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।
যাক নিয়ে, যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লুটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক—
যাক নিয়ে তাহা, যাক এ জীবন, যাক॥

'পলায়নী' কবিতায় কবি নিখিলের অন্তরশায়ী মহাকালের নৃত্য স্মরণ ক'রে আসক্তিবিহীন চিত্তে তাকে অন্তরে গ্রহণ করার চিরপ্রিয় অভিলাষের কথাই প্রকাশ করেছেন। 'নতুন কাল' কবিতায় কবি ক্রমবর্ধমান জীবনকোলাহলের দিক লক্ষ্য ক'রেও বিশ্বের আনন্দরসের চিরন্তনতাই উপলব্ধি করেছেন। নবজাতকের 'সাড়ে নটা' কবিতায়ও

বিদেশিনীর সংগীত ও মেঘদূতের বিরহগাথাকে বিশেষ কোনো কাল ও জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন চিরপ্রবাহিত আনন্দস্রোতরূপে লক্ষ্য করেছেন—

রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি,
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সংগীতের ধারা।

'চলতি ছবি'তে অদৃশ্য কেন্দ্রে সমাসীন সেই বিশ্বজীবননাট্যের সূত্রধারের কার্য কবি অনুভব করেছেন—চলমানতা যাঁর বাইরের রূপ মাত্র। সুতরাং আগেকার কালের মত এখানেও জীবনদ্বন্দ্ব সম্পর্কে কবির বক্তব্য—

সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে,
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে।
('নিঃশেষ')

বিখ্যাত 'স্মরণ' কবিতাটিতে কবি তাঁর সমস্ত সংস্কার এবং প্রয়োজনের ক্ষুধা থেকে মুক্ত অবিমিশ্র কবিস্বরূপের কথা বিদায়ের কালে পুনরায় আবেগময় কণ্ঠে জানালেন। জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে এই কবির কী সম্পর্ক এবং তাঁকে কী ভাবে বোঝা উচিত তা তাঁর নিম্নলিখিতরূপ উক্তিগুলি থেকে জানা যেতে পারে—

বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার।

মূলকতার পরিচয় বহন করছে। কয়েক বৎসরের বিভিন্ন সময়ে লেখা এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবি ছন্দের ক্ষেত্রে মিল বজায় রেখেও পর্বনির্মাণে অধিকতর স্বাধীনতা অবলম্বন করতে চেয়েছেন, অথবা ধ্বনিমাত্রিক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অক্ষরমাত্রিকের পঙ্‌ক্তি মেলাতে চেয়েছেন। 'ইস্‌টেশনে'র মত কবিতায় কয়েক পঙ্‌ক্তির শ্বাসাঘাত ছন্দের পর ভাবানুযায়ী চারপঙ্‌ক্তি ক'রে ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার নৈপুণ্যের প্রকাশক হয়েছে, এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'বুদ্ধভক্তি' কবিতার আট ছয় মাত্রার ধ্বনিমাত্রিক পর্বের যথেচ্ছ ব্যবহারও অবশ্যই সার্থক হয়ে উঠেছে। আট ছয় মাত্রার বিভিন্ন চালের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস নিম্নোক্ত স্থানেও অবশ্য ভাবানুযায়ী সুষমা লাভ করেছে বলা যেতে পারে—

ঋতুতে ঋতুতে
আকাশের উৎসবদূতে
এনে দিত পল্লববল্লীতে তার
কথনো পা টিপে চলা হালকা হাওয়ার,
কথনো বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল,
জোগাইত নাচনের তাল।

কিন্তু বারো মাত্রার বা আট চার এর পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস কি ধ্বনিমাত্রিক কি অক্ষরমাত্রিকে কবির সাহসিকতার পরিচয় দেয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে গদ্যছন্দ—যেখানে ভাব-যতিকে বিশেষভাবে মেনে চলতে হয় এবং পর্ববিন্যাসে বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা অবলম্বন করতেই হয়—তারই রূপ পদ্যছন্দেও কবি প্রবর্তন করতে চান। "এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি" বা "আমারে যে বলে ওরা রোম্যান্‌টিক" প্রভৃতি কবিতা এই নূতন উৎসাহের বিশেষ প্রমাণ বহন করছে। শুধু তাই

নয়, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দেও দশ মাত্রার পর্ব ব্যবহার এবং তার সঙ্গে আট, ছয় এর সামঞ্জস্য নবজাতকের কবি পরীক্ষা করেছেন, যেমন—

> নিদ্রার পারে রয়েছে সে
> পরিচয়হারা দেশে।
> অজানার পরে অজানায়
> অদৃশ্য ঠিকানায়
> অতিদূর তীর্থের যাত্রী,
> ভাষাহীন রাত্রি,
> দূরের কোথা যে শেষ
> ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।

নবজাতকের আত্ম-অনুসন্ধানী বা আত্মবিচারক কবি ভাষা ও ভঙ্গিকে সাংকেতিকতাময় নূতন আবরণে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। এর জন্যে কবিকে চিরাচরিত উপমানের বস্তুও কোনো কোনো স্থানে পরিবর্তিত ক'রে নিতে হয়েছে, যেমন—

> দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজ্যের সমগ্রতা,
> গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
> পারেনি বিদ্রূপ করিবারে—

অথবা—

> আশাহীন পূর্ব আসক্তির
> কাঙাল শিকড়জাল

অথবা—

> নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
> সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর

অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।

কিন্তু শুধু ভঙ্গিতেই নয়, বিষয়োচিত শব্দপ্রয়োগেও কবির অভিনবত্ব এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য—

ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

রবীন্দ্রনাথ যে মর্তে শুধু শান্ত শিবের মূর্তিই প্রত্যক্ষ করেন নি, সৃষ্টির দুঃখময়তা ও কুশ্রীতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন তা পূর্বে 'বলাকা' কাব্যে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন ('দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে; অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে'—ইত্যাদি, 'ঝড়ের খেয়া' দ্রঃ)। পরবর্তিকালে আমাদের ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার গ্লানি কবিকে যে এ বিষয়ে অধিকতর সচেতন ক'রে তুলেছে তার প্রমাণ বহু কবিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলিকে কবি স্বীয় আদর্শলোকের মধ্যেই স্থান দিয়েছেন। যেমন ঘটেছে 'জয়ধ্বনি' কবিতায়। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি এই বাস্তব জীবনের গ্লানি প্রত্যক্ষ করছেন—

যাহা রুগ্ন, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।

কিন্তু কবির বক্তব্য হ'ল—

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

'রোম্যান্‌টিক' কবিতায় কবি আরো স্পষ্ট ক'রে বললেন যে বাস্তব রূঢ়তার স্পর্শ তাঁর চিত্তে এসেছে, কর্মের পথে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু কবি তাকে গ্রহণ করেছেন একটি উদার সর্বগ্রাসী মায়াময় কবিস্বভাবের মধ্যে। সেখানে অভিজ্ঞতাহীন শুধুমাত্র কথার শৌখিন বাস্তব তিনি হতে পারেন নি—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ,
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

অর্থাৎ কবি সেরূপ ক্ষেত্রে কর্মের আহ্বান এবং দুঃখকে বরণ করার উৎসাহ অনুভব করেন, দূর থেকে পরিচয়হীন বিবৃতি মাত্র দিয়ে

ক্ষান্ত হন না। 'জন্মদিনে' কাব্যের 'ঐকতান' কবিতাতেও 'সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি'কে কবি নিন্দা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য কাব্যের অন্ততঃ একটি কবিতায় কবি তাঁর কেবল কল্পনা-বিলাসী চিত্ত এবং তদনুসারী লেখনীর সমর্থন করেন নি এবং বাস্তব লেখনীর জন্যে আক্ষেপ করেছেন—

সুকুমারী লেখনীর লজ্জাভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা করেনি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে ;
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

বলা বাহুল্য, কবির অতিরিক্ত মানবীয়তাই ক্বচিৎ কবিকে এহেন আক্ষেপে প্রবর্তিত করেছে, যেমন করেছে 'ঐকতান' কবিতায়। এবং মনে রাখতে হবে সকল ক্ষেত্রেই কবির সর্বত্র প্রকাশিত মনোভাব হ'ল—

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

একালের মধ্যে বিশেষভাবে 'সানাই' কাব্যে আমরা রোম্যান্টিক অথচ পরিণত রবীন্দ্রনাথের পুরাতন পরিচিত কবিমানসের সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হয়েছি। এ কাব্যে কোথাও পুরানো দিনের স্মৃতি, কোথাও সুদূরের অন্বেষণ, কোথাও বিহ্বল মন নিয়ে প্রকৃতির ক্ষণিক মাধুর্যরস আস্বাদন, কোথাও তাঁর বহুবর্ণিত লীলাসঙ্গিনীর পরিচয়

বিভিন্নকালের কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে। 'সানাই' বহুল পরিমাণে কবির মননশীলতা থেকে মুক্ত, এবং এখন থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত উজ্জ্বল সহজ কাব্যরসের পালা একথা বলা যায়। সানাইয়ের প্রথম মুদ্রিত কবিতাটি সুদূরের পিপাসা দিয়ে আরম্ভ—'সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি'। বাউল-সাধকদের কল্পনাভঙ্গি আশ্রয় ক'রে কবি পূর্বেকার সুরে বলছেন—

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

তাঁর সানাইয়ের মূলসুরের কথা বলতে গিয়ে কবি প্রকৃতিগত রসলোকের বা বিরহের অরূপলোকের কথাই উল্লেখ করলেন যা পূর্বে ধীরে ধীরে উৎসর্গ-খেয়াতে পরিপুষ্ট হয়ে গীতাঞ্জলি-গীতালির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এই সুর বাস্তব মর্তকে অবলম্বন ক'রেও অতিমর্তের জন্যেই ব্যাকুল হয়—

চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।

এই 'সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী' রূপের মধ্যেই অরূপের অনুসন্ধানে তৎপর হয় ও বিস্ময়ে স্পন্দিত হয়—

তারায় তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।

বিশ্বের বহুবিচিত্রতার ও অসংগতির মধ্যে যে একটি অনির্বচনীয় ঐক্যের সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কবির এই বহুশ্রুত উপলব্ধির কথা 'সানাই' কবিতার মধ্যে নূতন ক'রে কবি আমাদের জানালেন—

অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।

* * *

অমর্তলোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।

এই রোম্যান্টিক সুরের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে কবি সৃষ্টির রহস্যলোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন এবং সায়াহ্নেও তাঁর সেই অপরিবর্তন কবিমানসের কথা আমাদের গোচর করেছেন—

কতবার মনে ভাবি, কী যে সে কে জানে।
মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে,
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল

—ইত্যাদি।

এই রসোপলব্ধির মুহূর্তের বিস্ময়-বিহ্বল কবিমানসের স্বরূপ বিবৃত করতে গিয়ে কবি লৌকিক বাস্তবের সীমা থেকে মুক্তির কথাই জানিয়েছেন—

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে

এ কাব্যে রোম্যান্‌টিক মন নিয়ে কখনো কল্পিত প্রিয়ার সন্ধানে কবি প্রাচীনকালে ফিরে গেছেন, কখনো খেয়া-গীতাঞ্জলির কালের মত কঠোর আঘাতে প্রবুদ্ধ হবার বাসনা করছেন, কখনো বা অপরিচয়ের বিস্ময়ে ও নিজ অসম্পূর্ণতার বেদনায় অধীর হচ্ছেন। বিশ্বের বস্তু ও মানুষের স্বরূপ অনুভব করার আগ্রহ এবং অপরিচয়ের বিস্ময়মিশ্রিত বেদনা রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষের কাল থেকেই দেখা যায়।

এই অজানার বেদনা ও বিচ্ছেদবিরহ নিয়েই রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব। চৈতালির প্রকৃতি ও মানবপ্রীতির মধ্যে মানুষকে না জানার বেদনা বাস্তব আধারেই পরিস্ফুট হয়েছে।

পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।

এই ভাবটি চৈতালির কয়েকটি কবিতার মধ্যে নানা রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর পর ধীরে ধীরে কবির নিজ অজানা স্বরূপের সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে এবং একাল পর্যন্ত তা প্রসারিত হ'লেও মানুষ সম্পর্কে রহস্য অন্বেষণেরও শেষ হয়নি। পুনশ্চর 'সাধারণ মেয়ে', 'একজন লোক', শেষ সপ্তকের উনিশ সংখ্যক ('ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী, যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে') কবিতা, সানাইয়ের 'জ্যোতির্বাষ্প' ('হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই, এ কথায় পূর্ণ সত্য নেই') প্রভৃতি এই শ্রেণীর। পূর্বে উল্লিখিত সেঁজুতির 'পত্রোত্তর' কবিতার 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে বিরাট

নিরুত্তর' প্রভৃতির মধ্যে এই প্রশ্নকেই কবি ব্যাপকভাবে গ্রহণ ক'রে নিজস্ব একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নবজাতকের 'ভাগ্যরাজ্য' কবিতায় কবি যে পুরাতন হতে পারেন না তার কারণরূপে এই চিরন্তন অসম্পূর্ণতা ও অসন্তোষের কথা তুলেছেন—

সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্মমাঝে রয়েছে আমার
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি।

এই সকল এবং শেষ সপ্তকের "যারা বললে 'জানি', তারা জানল না" এবং শেষ লেখার 'কে তুমি। মেলেনি উত্তর।' প্রভৃতি এক সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের অতাত্ত্বিক যথার্থ কবিমানসকে বুঝতে হবে।

সানাইয়ের মুক্ত কবিস্বভাবের মধ্যে বহুপূর্বেকার বিস্মৃত ভাব-ব্যাকুলতায় প্রত্যাবর্তনের পরিচয় সর্বত্রই রয়েছে। 'মানসী' কবিতায় কবি তাঁর পূর্বজীবনের পদ্মাতীরের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যপ্রেরণা বা অজ্ঞাত সুদূরের আকর্ষণ—'অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা'র কথা উল্লেখ ক'রে বলছেন যে সেই শ্রান্তিহীন অনুসন্ধান অধুনা বাণীরূপের মধ্যে প্রকাশক্ষমতা হারিয়ে ফেললেও চেতনার মধ্যে এখনো লুপ্ত হয়ে যায়নি—

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।

'মায়া' কবিতায় যুগান্তরের প্রিয়ার অনুসন্ধানে কবির পুরাতন বিরহী মনোভাবই প্রকটিত হয়েছে এবং মানসী নামে অপর এক কবিতায় কবি তাঁর অচেনা প্রেয়সীর কথাই বলতে চেয়েছেন।

কবিকল্পিত রহস্যময়ী মানসসুন্দরী বা কবির কৈশোর-যৌবনের মুক্তির সঙ্গিনী দীর্ঘ অরূপানুভূতির পর্যায়ের মধ্যে গোপনচারিণী হয়ে পুরবীর লীলাসঙ্গিনীরূপে দেখা দিয়েছিলেন। এই কল্পিত নারীমূর্তি এখনো কবিকে কী পরিমাণ প্রেরণা দিচ্ছেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি 'শেষ অভিসার' কবিতায় তাঁর বাল্য ও শেষ কাব্যজীবনের সঙ্গেই এর সংযোগ বর্ণনা করছেন—

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি'

অসীম বিস্ময়-মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে সৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা,
আসিয়াছ তুমি ; ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা
কী ইঙ্গিত খেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

এই পূর্বেকার স্বপ্নলোকবাসিনী কামনার মূর্তিকে দেখবার আগ্রহ অধুনা কী প্রবল তা বোঝা যায় বাস্তব নারীর মধ্যেও ঐ সত্তাকে প্রত্যক্ষ করার অভিলাষে। 'নারী' কবিতায় নারীস্তুতির মধ্যে এই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়—

উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণলোকে—
সেই ছবি আনিতেছে ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।

এমনকি 'অধীরা', 'অনসূয়া' প্রভৃতি কবিতাতেও নারীরূপের মধ্যে কবি কল্পিত আদিম সৌন্দর্যময়ীর পরিচয়ই ব্যক্ত করেছেন—

মুক্তবেণীতে, স্রস্ত আঁচলে,
উচ্ছৃঙ্খল সাজে
দেখা যায় ওর মাঝে
অনাদিকালের বেদনার উদ্‌বোধন—
সৃষ্টিযুগের প্রথম রাতের রোদন—

সানাইয়ের এইশ্রেণীর একটি কবিতায় ('বিপ্লব') কবির বলাকাধর্মী মনোভাবের মিশ্রণে অপূর্ব কাব্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। কবিতাটিতে কবি তাঁর ঐ কল্পনার সহচরী, অমর্ত-আনন্দের দূতীকেই অত্যন্ত ভিন্নরূপে দেখেছেন। এখানে আর তিনি সৌন্দর্যময়ী রহঃসখী নন, ভীষণের সংকেতদাত্রী। আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কবি-কল্পলোকে যে বন্ধনমুক্তির ও দুঃসহকে বরণ করার উৎসাহ জাগিয়েছিল এটি তারই প্রকাশক অন্যতম কবিতা। রূপে কল্পনায় ও ব্যঞ্জনাগুণে এটি তাঁর প্রথম শ্রেণীর রচনা। কবি তাঁর কল্পনারীমূর্তিকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন,—নটরাজের তাণ্ডবের ছন্দে তোমার অপরূপ সৌন্দর্যের উপকরণ বিস্রস্ত হ'ল, আভরণশূন্য ভীষণরিক্ত রূপ এখন সৌন্দর্য-পিপাসুকে অবজ্ঞা করছে, তোমার মোহমত্ততার পালা এখন উদ্‌যাপিত হ'ল। সুতরাং, কবি জানেন, এখন তাঁর চিরকালের বিরহস্বপ্নের জালবোনাও ক্ষান্ত হ'ল—

প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

তিনি স্পষ্টভাবে বুঝলেন, এ ঔদাসীন্য বা ছলনা নয়, এ যথার্থ ভীষণতা, এ নির্মম সংকেত—

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,

সুতরাং কবির কাব্যস্বপ্নের কর্ত্রীর, সৌন্দর্যের দূতীর যখন এই অভিলাষ, তখন কবি অবশ্যই তার নির্দেশ অনুসরণ করবেন, কাল্পনিক বিরহের মোহরাজ্য ত্যাগ ক'রে পরুষজীবন ও জীবনানুরাগের বাণীই বহন করবেন—

তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।

পূর্বেকার মত এখানেও কবিচিত্তের দ্বিধাগ্রস্তভাবের পরিচয় রয়েছে,—একদিকে অমর্ত্য রসবাসনা, আর একদিকে বাস্তব জীবন-চেতনা। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে স্বতই স্বপ্নাতুর কবির কাল্পনিক বেদনাও যুক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কবি ছলনাময়ীর ছলনার স্বরূপ বুঝতে পেরে সাহসিকতার সঙ্গে অনায়াসেই দ্বিতীয়টি গ্রহণ করবেন, তাই বলছেন—

আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।

সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,

কবিতাটির শেষে অজ্ঞাত-স্বরূপ রহস্যময়ীর সংকেত অনুধাবনের কথা কবি অপূর্ব সাংকেতিকতার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন—

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে—
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে।

সায়াহ্নের কবির ভাষার কী অপরূপ শক্তি! এই অনবদ্য রূপ-নির্মাণে এবং অভিপ্রেত ব্যঞ্জনার কার্যেই রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত শক্তিশালী কবি। বিশিষ্ট কল্পনার উপযোগী বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গির জন্যেই রবীন্দ্রনাথ অনন্যকরণীয় রবীন্দ্রনাথ।

বহুপূর্বে কল্পনাশীলতার মধ্যে কবির কর্মমুখর বাস্তবতায় উত্তরণের একটি বিশেষ চিত্র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় আমরা পেয়েছিলাম। তারপর একটি নিগূঢ় উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত কবির এই জীবন-গ্রহণের সাংকেতিক রূপ দেখেছি বলাকায়। এখন দেখি, গোধূলিতে অবতীর্ণ হয়েও কবি স্বপ্নবিলাস থেকে মুক্তির বলিষ্ঠ মনোভাব জানাতে বিরত হন নি। এমন কি তাঁর কাব্যজীবনদীপ নির্বাপিত হবার অব্যবহিত পূর্বেও—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম ;
জানিলাম, এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

প্রভৃতির মধ্যে একই সুর প্রবাহিত ক'রে আমাদের বুঝিয়েছেন যে তাঁর জীবনদর্শন একটি গভীর সত্যোপলব্ধির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

এ কালের কয়েক জায়গায় প্রকাশিত রোম্যান্টিক বিরহের মধ্যে

স্বভাবতই মেঘদূতের যক্ষের কথা কয়েকবার কবির মনে হয়েছে। কবি যদিও তাঁর যৌবনের কল্পিত চিরবিরহের কথাই এখানে বলেছেন তথাপি বিশেষ এই যে, বিরহের মধ্যে এখন কবি মুক্তির আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। পুনশ্চর 'বিচ্ছেদ' কবিতায় বিরহীকে গতির আনন্দে উৎসুক ব'লে কবি কল্পনা করেছেন। যক্ষকে কোনো অপূর্ণ সত্তার সঙ্গে তুলনা ক'রে ঐ অপূর্ণের পূর্ণতার পথে নিত্য চলমান অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে মিলনে তার আনন্দের উদ্ভব হয় ব'লে কবি ধারণা করেছেন এবং এই গতির আনন্দকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন—

> অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
>
> তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
>
> আনন্দের নব নব পর্যায়।

আবার পূর্ণকেও কবি অচল ব'লে মনে করতে পারেন নি। যক্ষপত্নীকে পূর্ণ সৌন্দর্যসত্তা কল্পনা ক'রে তার প্রতীক্ষমাণ অস্থির অবস্থাকে মানসিক গতিধর্মে মূল্যবান ক'রে দেখেছেন। যক্ষ-সম্বন্ধে লেখা শেষ সপ্তকের আটত্রিশ সংখ্যক কবিতায় কবি বিরহের জয়ধ্বনি দিয়েছেন প্রেমকে ব্যাপক করার শক্তির দিক থেকে—

> এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
>
> বর হয়ে,
>
> কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।
>
> খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
>
> পাপড়িগুলি,
>
> সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
>
> বিশ্বের মাঝখানে।

এখানে কবির যে-মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে শ্যামলীর 'বাঁশিওআলা' কবিতার বিরহজনিত সৃষ্টির উপলব্ধি তুলনীয়।

সানাইয়ের 'যক্ষ' কবিতায় 'বিরাট দুঃখের পথে আনন্দের ভূমিকা'-রূপ এই বিশ্বসৃষ্টির কল্পনা ক'রে কবি স্বর্গলোকবাসিনী বিরহিণী পূর্ণার আনন্দবঞ্চিত দুঃখাবস্থা কল্পনা করেছেন--

নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্তভূমে

তুলনায় স্বর্গ অপেক্ষা মর্তকে কবি গৌরবান্বিত করেছেন এবং কল্পনা করেছেন, প্রভুর শাপ বর হয়ে যক্ষের বিরহরূপে ঐ পূর্ণার দ্বারে করাঘাত করছে—মর্তের মাটিতে তাকে নামিয়ে এনে মর্তের প্রাণ-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত ক'রে যদি তার ঐ অসহনীয় বিরহকে আনন্দরসে সম্পৃক্ত করা যায়। এই কবিতাটির পশ্চাতে বলাকার গতি ও আনন্দের তত্ত্ব, বহু পূর্বেকার বিরহ-কল্পনা এবং মর্ত ও স্বর্গের পার্থক্য সম্পর্কিত বিশিষ্ট কল্পনা নিহিত রয়েছে।

'জন্মদিনে' কাব্যের নয় সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর অতি সহজ কাব্যচেতনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সাংকেতিক বর্ণনা দিয়েছেন—

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।
শুধু ছলছল কলকল;
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল;

ঐ কবিতাটিতে কবির স্বরূপগত বক্তব্য যাই হোক, শেষ চারটি কাব্যের সহজ ও স্পষ্ট অনুভূতিতে এবং ততোধিক সহজ প্রকাশ-ভঙ্গিমায় সায়াহ্নের কবি যেন যথার্থই অনায়াস কাব্যবাণীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। 'রোগশয্যায়' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত চারটি কাব্য এদের প্রকাশভঙ্গির সারল্যে ও সংযমে পাঠকের মনকে প্রথমেই বশীভূত ক'রে ফেলে, আর সেই সঙ্গে বিদায়গ্রহণোৎসুক কবিমানসের স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং সংকোচহীন আত্মবিচারণায় অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এই ক'টি কাব্যে পূর্বেকার কল্পনার বিশালতা, অজ্ঞাত রহস্যের তীব্র অনুসন্ধানস্পৃহা, অসম্পূর্ণতার প্রবল আক্ষেপ বা নবতর জীবনকে গ্রহণ করার দার্শনিক অভিলাষ কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়নি এমন নয়, যাত্রার ক্ষুধাও হয়ত কয়েকটি কবিতায় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ সকল এমন নিরলংকার সহজ রূপে মণ্ডিত হয়েছে যে কবির সঙ্গে পাঠকের মিলন হতে মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। আর, একাধারে কবির ঐকান্তিক মানবানুরাগ, তুচ্ছতম বস্তু বা দীনতম মানুষের প্রতি অকুণ্ঠিত সহানুভূতি এবং বারংবার পৃথিবী ত্যাগ করার কথা পাঠককে বিদায়ী কবির প্রতি মমত্বে পূর্ণ করে তোলে। বস্তুতঃ একেবারে শেষের এই লেখাগুলিতে আমরা একজন সত্যনিষ্ঠ ও সমবেদনাপূর্ণ স্বভাবকবিকে পেয়েছি।

রোগশয্যায় লেখা চার সংখ্যক কবিতাটিতে কবিমানসের বিদায়-বোধ এবং আকর্ষণের দ্বন্দ্বের দিকটি কারুণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশিষ্ট জীবন-উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নপ্রিয় মর্তপ্রেমিক কবি কালের দাবী স্বীকার ক'রেও প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

> যেথা তব রথ
> শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধুলায়

সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ।
অল্প কিছু আলো থাক্,
অল্প কিছু ছায়া,
আর কিছু মায়া।

আবার কোনো ক্ষেত্রে যাত্রার আগ্রহ যখন প্রবল হয়েছে, তখন সাধকের মতই নাম ও কীর্তির বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হতে চেয়েছেন এবং নবজন্ম ও নবচৈতন্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। তিনি যথার্থ কবি ব'লেই তাঁর স্বভাবের একদিকে এই দ্বৈত চিরকালই প্রকাশ পেয়েছে। পঁয়ত্রিশ সংখ্যক কবিতায় আত্মসচেতন কবি বলছেন—

তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক
অতীতের বাষ্পজাল হতে,
সদ্যনবজাগরণ দিক্ শঙ্খধ্বনি
এ জন্মের নবজন্মদ্বারে।

* * *

আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে,
তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে
ফিরে ফিরে না যেন তাকাই ;

কখনো কবির বাস্তব অভিজ্ঞতায় জীবন ও মৃত্যুর রহস্যসম্পর্কটি যেন তাঁর কাছে পরিস্ফুট দিবালোকে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে অরূপোপলব্ধির কালে কবি কল্পনায় যে-মৃত্যুকে জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত দেখেছিলেন এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের পূর্ণতার ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলেন এখন সেই রহস্য তাঁর কাছে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এই মনোভাবের পরিচয় রয়েছে সাঁইত্রিশ সংখ্যক ক্ষুদ্র কবিতাটিতে—

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা ;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ ;

দুই সংখ্যক কবিতায় জীবন-মৃত্যুর, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের, পাওয়া ও ফাঁকির রহস্যসম্পর্কটি বলাকার কালের মত এখনকার কবির মনেও জিজ্ঞাসার উদয় করেছে—

চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

রুগ্নাবস্থায় লেখা কয়েকটি কবিতার কল্পনায় ও ভাষাভঙ্গিতে তাপদগ্ধ অথচ দুঃখজয়ী কবিমানসের সাংকেতিক পরিচয় বিন্যস্ত হয়েছে। কবির রোগক্লিষ্ট মন সহজেই তাঁর পূর্ব-উপলব্ধ সার্বজনীন বিশ্বগত দুঃখের কল্পনায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর ভঙ্গিটি রুগ্নমানসের স্বকীয়, যেমন—

পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে
কোথা শেলশূল যত হতেছে ঝংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।

এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।

একালের অসংকোচ সারল্যের মধ্যে এই ধরণের মাত্র কয়েকটি কবিতায় প্রয়োজনবশে কবিকে প্রচ্ছন্ন রূপকের এবং শব্দগত লাক্ষণিকতার ও ব্যঞ্জনাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। রাত্রি সম্পর্কে লেখা নয় সংখ্যক কবিতায় রাত্রির মধ্যে কবি যে-অসম্পূর্ণতা ও বিকৃতির কল্পনা করেছেন তা তাঁর 'অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস' তারই প্রতিফলিত মূর্তি। এ 'রাত্রি' কল্পনা-যুগের অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী শ্যামাসুন্দরী নয়, এবং এর মধ্যে সৃষ্টির আনন্দও সঞ্চিত হয়নি,—সৃষ্টির অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা, অপূর্ণতার যাবতীয় দুঃখ ও হাহাকার পুঞ্জীভূত হয়েছে—

পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।

বলাকা রচনার কালে গতিধর্মী কবি স্থিতির বাধাকে বীভৎস ও ভয়ংকর ব'লে কল্পনা করেছেন। এখানে রাত্রির বর্ণানাতেও অনুরূপ মনোধর্মের প্রকাশ দেখা যায়—

আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে

একালের কয়েকটি কবিতায় কবির আলোকের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, ফলতঃ আলোক-বন্দনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্বভাবতই জ্যোতিঃ

বা আলোকের প্রার্থী হ'লেও, রুগ্নাবস্থায় বিশেষ দৈহিক ও মানসিক কারণে আলোকের অধিকতর অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। অন্ধকারের প্রতি বর্তমানের তীব্র বিরাগও এই কারণে ঘটেছে এমন ধারণা অসংগত নয়। নবজাতকের 'রাত্রি' কবিতার সঙ্গেও উপরিউক্ত কবিতাটি মিলিয়ে দেখার যোগ্য।

বিশ্বগত দুঃখ ও বিপ্লবের মধ্যে যে কালের কল্যাণকর শাস্তিবিধান প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তদানীন্তন যুদ্ধের পটভূমিতে এবং অসুস্থতার আঘাতে কবি তা নূতন ক'রে উপলব্ধি করলেন—

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।

এবং এর মধ্যেই যে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত রয়েছে সেই বহুকালপূর্বের উপলব্ধিকে নূতন ভাষায় অনায়াসে প্রকাশ ক'রে বললেন—

গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।
হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা ;

একালে আধুনিক সাহিত্যের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক কবিমানসের সাংঘাত দেখা দিয়েছে। 'রোগ-শয্যায়' কাব্যের কয়েকটি মননধর্মী কবিতায় কবি তাঁর কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করেছেন, যেমন করেছেন একালে লেখা ঐ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধে বা আলোচনায়। একুশ সংখ্যক কবিতায় কবি গোলাপ ফুলকে দেখে প্রশ্ন করছেন যে সৃষ্টিতে যদিচ নিরঞ্জন সত্যই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেখানে সুন্দর বা কুৎসিত এর বৈষম্যের মাপকাঠি নেই এমন বলা হয়,—তা জ্ঞানের দিক থেকে বিবেচিত

আপেক্ষিক সত্য মাত্র। বোধের দিক থেকে প্রমাণিত পূর্ণ সত্য নয়। কবি প্রশ্ন করছেন, যে-শক্তি বিশ্বের সমস্ত কিছুর প্রকাশের মূলে—

সে কি অন্ধ, সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে—

শেষে সমস্ত সংশয়ের নিরসন করেছেন জ্ঞানের তর্ককে অধিকদূর অগ্রসর না হতে দিয়ে—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—

দেখা যায়, সানাইয়েও কবি কয়েকবারই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁর কল্পনাশীল কবিমানসকেই সম্মুখে স্থাপন করেছেন ('অনসূয়া' ও 'অত্যুক্তি' দ্রঃ)। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট স্থষ্টির সুন্দর-অসুন্দর দুঃখ ও সুখ কবির কল্পলোকে একটি বিশেষ ঐক্যানুভূতিগত সৌন্দর্যের রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। তাই, স্থষ্টির কেবল রুগ্নতা ও কুশ্রীতার রূপকেই তৎকালে যাঁরা অঙ্কিত করতে চেয়েছেন, কবিকুলগুরু তাঁদের মৃদু ভৎ‍র্সনা ক'রে যথার্থ কাব্যের পথ নির্দেশ করেছেন, যেমন—

আজিকার অরণ্যসভারে
অপবাদ দাও বারে বারে ;
বল যবে দৃঢ়কণ্ঠে অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ
প্রকৃতির অভিপ্রায়, 'নব ভবিষ্যৎ
করিবে বিরলরসে শুষ্কতার গান'—
বনলক্ষ্মী করিবে না অভিমান। (একত্রিশ)

অথবা, কণ্ঠ আর একটু উচ্চ ক'রে—

সে যদি অমান্ত করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদ্‌রূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে,
তবে তার কোন্ আবশ্যক।

*　　　*　　　*

রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা ব'লে জানি।　　　(চব্বিশ)

এই কারণেই সাধারণ মানুষের কবি হয়েও এবং মানুষের দুঃখের দিকটিকে স্বীকার ক'রেও দুঃখ উত্তরণের আদর্শমূল্যেই তিনি মানুষকে মহিমান্বিত করেছেন। উনত্রিশ সংখ্যক কবিতায় তাঁর এই মূল্যবোধ পরিস্ফুট হয়েছে—

দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
মানবেরে দেখি যবে নিরুপায়,
ভাবিয়া না পাই মনে,
সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।

*　　　*　　　*

মানবচিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে যে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত

যে-কবির কাব্যে রূঢ়তম পারিপার্শ্বিকের মধ্যবর্তী দীনতম মানুষের জীবন চিত্রিত হয়েছে,—শালিখ, চড়ুই পাখি, বেজি, এমন কি রাস্তার

কুকুরটাও যাঁর কাব্যগত সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি, তিনি কোন্ রসবিচারের মানদণ্ডে যথার্থ কাব্যের চিরন্তন সৌন্দর্যমূল্য সম্পর্কে নিঃসংশয় তা অবশ্য চিন্তনীয়।

রুগ্নাবস্থার পর 'আরোগ্যে' যেন কবি তাঁর পুরাতন অথচ চিরনবীন কাব্যজীবন নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি বহির্জীবন সম্পর্কে সমস্ত সংশয়, সত্য-অসত্য সম্পর্কে অবশিষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ ক'রে কবিহৃদয়ের অনুরাগ অথচ কবিসুলভ নির্লিপ্ত মন নিয়ে পৃথিবী, তাঁর পারিপার্শ্বিক ও বিশেষভাবে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আরোগ্য কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু হ'ল এর পশ্চাদ্বর্তী স্বচ্ছ ও মুক্ত কবি-মানসের অকুণ্ঠিত প্রকাশ, শিশুসুলভ আদিম ও সহজ চেতনার সঙ্গে জড়িত আস্বাদনবিশেষের আনন্দ। 'জন্মদিনে' কাব্যে যদিও এই অনাবিল আনন্দস্পর্শ ও সারল্য থেকে কবি আমাদের বঞ্চিত করেন নি, তথাপি ঐ কাব্যটি মোটামুটি জীবনস্মৃতি বিষয়ক এবং ওতে তীব্র মানবীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কবির যুদ্ধ-বিরোধী মননশীলতাও প্রকাশ পেয়েছে।

আরোগ্যের প্রথম তিনটি কবিতা কবির আলোকে মুক্তির অবারিত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্পন্দিত এবং সত্য ও জ্যোতির সেই কল্পনায় মিশ্রিত যা একান্তভাবে রবীন্দ্রানুগত। এখানকার অনায়াসলব্ধ ভাষার প্রসাদগুণ কবিমানসের অকৃত্রিম সহজ অনুভূতির সূচক—

মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।

আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।

বিমুগ্ধ মানসের সহজ অনুভূতির এর চেয়ে উত্তম প্রকাশ আর কী হতে পারে? লক্ষ্য করতে হবে এই শেষ তিনটি কাব্যে কবি গদ্যকবিতায় ছয়, আট, দশমাত্রার পর্বকেই তাঁর অনুভূতির উপযুক্ত বাহক বলে গণ্য করেছেন অর্থাৎ মিলহীন পদ্যচ্ছন্দেই কাব্যরচনা করেছেন।

বিশুদ্ধ প্রকৃতিরসানন্দের পরিচয় আরোগ্যের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে। তিন সংখ্যক কবিতায় পুরাতন প্রীতিরসে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত পদ্মাতীরের স্বভাব-বর্ণনা এবং উপসংহারে কবির প্রকাশের দৈন্য-খ্যাপন একালেও তাঁর অন্যনিরপেক্ষ প্রকৃতি-মাধুর্য আস্বাদনের গভীরতা প্রমাণ করে—

ভাষা নাই, ভাষা নাই ;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

'ঘণ্টা বাজে দূরে' এই শ্রেণীর অবিমিশ্র প্রকৃতি-প্রীতির অন্যতম কবিতা। পড়লে সন্দেহ জাগে ছিন্নপত্র-চিত্রার যুগে কবি আবার ফিরে গেলেন কিনা। কবিতাটির শেষে কবি বলছেন যে এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষণিকের প্রতি অনুরাগ তাঁর বিচ্ছেদবেদনার সঙ্গে জড়িত। আবার এরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাঁর মানবানুরাগ, শেষ প্রীতির প্রার্থনায় করুণ—

যারা কাছে এসেছিল. যারা চলে গিয়েছিল দূরে,
তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্ সুরে।
অন্যমনে কারে চিনি নাই,
বিদায়ের পদধ্বনি প্রাণে আজ বাজিছে বৃথাই,
হয়তো হয়নি জানা ক্ষমা ক'রে কে গিয়েছে চলে
কথাটি না ব'লে।
যদি ভুল ক'রে থাকি তাহার বিচার
ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রবনা আমি আর।

এই অনাবিল সহজ মানবপ্রীতির বশেই 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি লেখা হয়েছে। কবি তাঁর বহু কবিতার মধ্যেই কালের গতির সঙ্গে রাষ্ট্রের উত্থান-পতন পর্যবেক্ষণ করেছেন। দেখেছেন, বিশ্বজোড়া প্রতাপের খেলা যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি ক্ষমতালোভী নিষ্ঠুর ও যান্ত্রিকতাগ্রস্ত মানুষ ব্যর্থ। কিন্তু যারা মাটির কাছাকাছি আছে, যাদের সুখে দুঃখে প্রবাহিত জীবনধারা পৃথিবীকে মধুর ক'রে রেখেছে সেই ত্যাগী, প্রেমিক ও সহিষ্ণু মানুষই সত্য ও চিরন্তন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতায় ব্যথিতচিত্ত কবি স্বাভাবিকভাবেই দুঃখজীবী সাধারণ মানুষের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন— যে-মানুষ অন্যায় ও নিষ্ঠুর ভাঙনের খেলায় উন্মত্তভাবে যোগ দেয় না, যারা নির্বিবাদে দুঃখ সহ্য করে, অকাতরে প্রাণ দেয়, অথচ বিশ্বের কল্যাণরূপ রচনা করে। ক্ষমতা ও লোভের প্রতীক রাষ্ট্রীয়তার পটভূমিতে সাধারণ মানুষকে কবি নিম্নলিখিতরূপ অংশে উজ্জ্বলভাবে দেখেছেন—

রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,

রক্তমাখা অস্ত্র-হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে।

পূর্বে রক্তকরবী, মুক্তধারা প্রভৃতিতে কবি যে-সহানুভূতি ও সত্যদৃষ্টির বলে রাষ্ট্রীয় ও যান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন, তা কবির শেষজীবন পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে একালের উৎকৃষ্ট মানবীয়তার প্রকাশক কবিতাগুলির জন্ম দিয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে কবির যে মনোভাব দেখছি জন্মদিনে কাব্যটিতে তা-ই বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্রসংগ্রামের' অথবা 'শ্মশান-বিহার-বিলাসিনী ছিন্নমস্তা' প্রভৃতি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির উপর রচিত সাময়িক যুদ্ধ-বিরাগী কবিতায় কবি মানবীয়তার মানদণ্ডেই স্বার্থলিপ্সু মুষ্টিমেয় সভ্যশ্বাপদদের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাইশ সংখ্যক কবিতায় মানুষকে ঘৃণা করার পাপের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের পতন ঘোষণা করেছেন।

'জন্মদিনে' কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির জীবনকে বিবৃত করেছে। এর কোনোটিতে দুঃখদুর্যোগের অন্তে নূতন সৃষ্টির মধ্যে নবজীবনের আশার কথা, কোনোটিতে বা শুধু কাব্যজীবনের পরিচয়। কবি তাঁর নিগূঢ় আত্মজীবনকে বা কাব্যজীবনকেই যথার্থ জীবন ব'লে মনে করেন। আটাশ সংখ্যক কবিতায় তাঁর নদীস্রোতোবাহী বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সমন্বয় দেখেছেন এবং নিজেকে বন্ধনহীন পথিক, সুতরাং জাতিহারা ও ব্রাত্য ব'লে উল্লেখ করেছেন। দশ সংখ্যক বিখ্যাত 'ঐকতান' কবিতাটিতে তাঁর কবিকীর্তির অসংকোচ

নিরপেক্ষ বিচার করতে চেয়েছেন। এই কবিতাটির পশ্চাতেও কবির একালের বৈশিষ্ট্য—সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ রয়েছে, ফলতঃ যেখানে নিজের অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন সে স্থান স্বভাবতই স্বল্প অত্যুক্তিতে রঞ্জিত হয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি বার বার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁর 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি' একথা বলা, এবং যিনি কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস সমস্ত নিয়ে বাঙালির সর্বস্তরের জীবনযাত্রায় প্রবেশের পরিচয় দিয়েছেন, লৌকিক চলিত ভাষার সমস্ত ভঙ্গিই যাঁর আয়ত্তে, অন্ততঃ আধুনিককালের যে-কোনো কবির ও শিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাঁর পরিচয় গভীরতর, তাঁর পক্ষে 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে-শক্তি ছিল না একেবারে' ইত্যাদি উক্তি কবিস্বভাবসুলভ দৈন্যখ্যাপন মাত্র। যদি রবীন্দ্রনাথ না জানেন, কে জানে?

কিন্তু কবির এই অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশের মধ্যে সত্য আছে, কোন্‌খানে তা-ই আমাদের বুঝতে হবে। এই কবির প্রতিভার বিচারে আমরা তাঁর বিশিষ্ট স্বভাবের দিকটি বার বার বিশ্লেষণ করেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ শক্তি অসামান্য হ'লেও তিনি যা-কিছু গ্রহণ করেছেন সমস্তই তাঁর বিশিষ্ট কল্পলোক আত্মসাৎ করেছে, যথাস্থিতভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে কোনো বস্তুই ঐ কল্পলোকে স্থান পায়নি। আত্মজীবনবিবৃতিতেও কবি নিজকে স্বপ্নচারী, রোম্যান্‌টিক প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেছেন। এই কারণেই সাধারণ মানুষ—কৃষক ও শ্রমিকের বাস্তব সুখদুঃখ ঠিক তাদের আস্বাদনের প্রকার ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবিচিত্তে স্থানলাভ করতে পারে নি। অর্থাৎ মহাকবি যদ্যপি তিনি হয়েছেন ঠিক কৃষাণের কবি

হতে পারেন নি। এর কারণস্বরূপ কবি 'জীবনে জীবন যোগ করা'র অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কবির এ আক্ষেপ কাল্পনিক, কারণ কোনো কবির বাহ্য অভিলাষ যাই থাকুক তাঁকে তাঁর প্রতিভার নিয়ম মেনে চলতেই হবে। বস্তুতঃ 'কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান' কবির চিত্তে প্রবেশ করেছে, এবং দুর্গম তুষারগিরি ও আকাশের নীলিমা অশ্রুত সংগীতে তাঁকে আহ্বান করেছে বটে, কিন্তু একমাত্র জীবনের সঙ্গে জীবন মিশ্রিত না করলে যে-মানুষের অন্তর-রহস্য অজ্ঞাত থেকে যায়, সে-মানুষ তার বিশিষ্ট বাস্তব অবস্থা নিয়ে বাইরে পড়ে আছে, কবির এমন উক্তি অসংগত নয়। সুতরাং দেখা যায়, এই মহাকবি 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' যে-কবির আগমন প্রার্থনা করেছেন তা সাধারণ মানুষ—ঐ কৃষক-শ্রমিকের মধ্য থেকেই, এবং যাঁর এখনো জন্ম হয়নি। এইজন্যেই যে সকল কবি যথার্থ কৃষক ও শ্রমিক না হয়েই তাদের জীবন নিয়ে কাব্যরচনায় তৎপর, 'সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি' প্রভৃতি বাক্যে তাঁরা কবির স্নেহ-তিরস্কার লাভ করেছেন। আমরা আগের পর্যায়ের উপসংহারে এই কবিতাটির উল্লেখ ক'রে শেষকাল পর্যন্ত কবির অনন্যসাধারণ মানবীয়তার অনুবৃত্তি ও বিস্তৃতির কথা বলেছি। এই কবিতাটিতে অদ্যাপি অনাগত নূতন যুগের নূতন কবির আগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী ঘোষিত হয়েছে কিনা ভাবতে হবে।

এই আত্মজীবনবিবৃতি ও স্বীয় অসম্পূর্ণতার দৈন্য জ্ঞাপনের সঙ্গে অশীতিপর কবির চিরবিদায়ের করুণ উপলব্ধিও একত্র বিবেচ্য। কবিকে তাঁর তুচ্ছ নাম ও কীর্তি ত্যাগ করতে হচ্ছে ব'লে নয়, আন্তরিক প্রীতির সমস্ত বন্ধন যে পিছনে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে তার জন্যে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বেদনা অনুভব করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার

বিষয় এই যে ত্যাগের বেদনার সঙ্গে চলার প্রেরণাও কবি সমানভাবে গ্রহণ করেছেন। কবির চিরকালের সুদূরস্পৃহাই তাঁর চিত্তে এহেন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। 'রোগশয্যায়'-এর একটি কবিতায় নাম-খ্যাতির স্মৃতিময় পূর্বজীবনকে অবহেলা ক'রে কবি সুদূরের জন্যে বেদনার কথাই জানিয়েছেন—

যা-কিছু হারাল মোর
সবচেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে-দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
—ইত্যাদি।

আরোগ্যের একটি কবিতায় দেখা যায়, সুদূরের জন্যে চঞ্চল তীর্থযাত্রার পথিক পথ-সমাপ্তির আগ্রহেই উৎসুক—

স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ-জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘযাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।

জন্মদিনে কাব্যে কবি কখনো নিজকে পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে অভিনেতা-রূপে দেখেছেন এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিত্রা-চৈতালি-নৈবেদ্য

পর্যায়ের বিস্ময় পুনশ্চ অনুভব করেছেন। কিন্তু বারো সংখ্যক কবিতায় তাঁর সর্বত্যাগী বৈরাগী মনের পরিচয় নিবেদন ক'রে যাত্রার পথকেই অকাতরে বরণ ক'রে নিয়েছেন দেখা যায়—

সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম,
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

* * *

দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
প'ড়ে থাক পিছে
বহু আবর্জনা বহু মিছে।
বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—

* * *

প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি

—ইত্যাদি।

এই মহাকবি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে কোন্ উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন তা জানতে চাওয়া পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন

স্বাভাবিক আধুনিক যুগের নানান্ সাহিত্যাদর্শের সংঘাতে তিনি কোন্ পন্থা সত্য ব'লে মনে করেছেন তা জানার ঔৎসুক্য। বলা বাহুল্য, লোকান্তরিত হওয়ার স্বল্প কয়েকদিন পুর্বপর্যন্তও তিনি যথাশক্তি তাঁর কবিমানসকে সাধারণের গোচরে এনেছেন এবং তাঁর পরিণত প্রতিভার দার্শনিকসুলভ উপলব্ধিই শেষ পর্যন্ত বিবৃত ক'রে এসেছেন, যার সংক্ষেপ করলে এইভাবে বলা যায় যে—সৃষ্টি সত্য, জীবন সত্য, মানুষ অধিকতর সত্য, কারণ, দুঃখের মূল্যেই তার আত্মসাক্ষাৎকাররূপ চরম প্রাপ্তি ঘটে। এই উপলব্ধি 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে আরম্ভ ক'রে পরিস্ফুটভাবে শতাধিক স্থানে উত্তরোত্তর দৃঢ়তার সঙ্গে কবি ব্যক্ত করেছেন, এবং মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস আগে লেখা—'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম, এ জগৎ স্বপ্ন নয়' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে ঐ বিশেষ জীবন-দর্শন যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর একেবারে শেষ রচনা দুটিতেও তেমনি—

> যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
> ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।

এবং—

> তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
> বিচিত্র ছলনাজালে
> হে ছলনাময়ী।
> মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
> সরল জীবনে।
> এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;

সৃষ্টির অন্তরে যে একটি বিশেষ শক্তির লীলা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, দুঃখ ও সুখ, আঘাত ও আনন্দ সমানভাবে যার দান, তাকে সম্যক্‌রূপে

স্বীকার ও বরণ ক'রেই মুক্তির আনন্দলাভ করা যায়—অরূপানুভূতির পর্যায়ে উপলব্ধ এই সত্যটি বিচিত্রভাবে কবি শেষপর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। এই দার্শনিক উপলব্ধির সূত্রেই কবির সুগভীর মর্তপ্রীতি, মানবপ্রীতি ও মানবজীবনের মূল্যবোধ গ্রথিত।

ক্রান্তদর্শী কবি যুগোচিত জীবনমন্ত্রে বাঙালির তথা সমস্ত মানুষের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁদের উদ্বোধিত করেছেন অভয়বাণীতে। গীতার "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" প্রভৃতি তীব্র উৎসাহসূচক জড়ত্ব-মোচনের ও অকুতোভয়তার বাণীর সঙ্গে এবং নানাভাবে উচ্চারিত ভারতীয় মহাপুরুষদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রবাণীর মৌলিক পার্থক্য নেই, যদিও যুগোপযোগী জীবনদর্শনের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ কবিসত্তা তার কবিস্বভাব বজায় রেখেও ধীরে ধীরে দার্শনিক সত্তায় লীন হয়ে গেছে। রবীন্দ্রকাব্যপাঠে এর কোন্‌টি বাদ দিয়ে কোন্‌টি পাঠক গ্রহণ করবেন, অথবা দুটিই একত্র গৃহীত হওয়া সম্ভব কিনা তার বিচার করবে পাঠকের মানস-প্রকৃতি, কোনো নির্ধারিত তুলাদণ্ড নয়, এই কথাই আমরা পরিশেষে ব্যক্ত করছি।

নাম-নির্দেশিকা

(কেবল বিশেষ বিশেষ কবিতা ও গান ' ' র মধ্যে দেওয়া হ'ল)